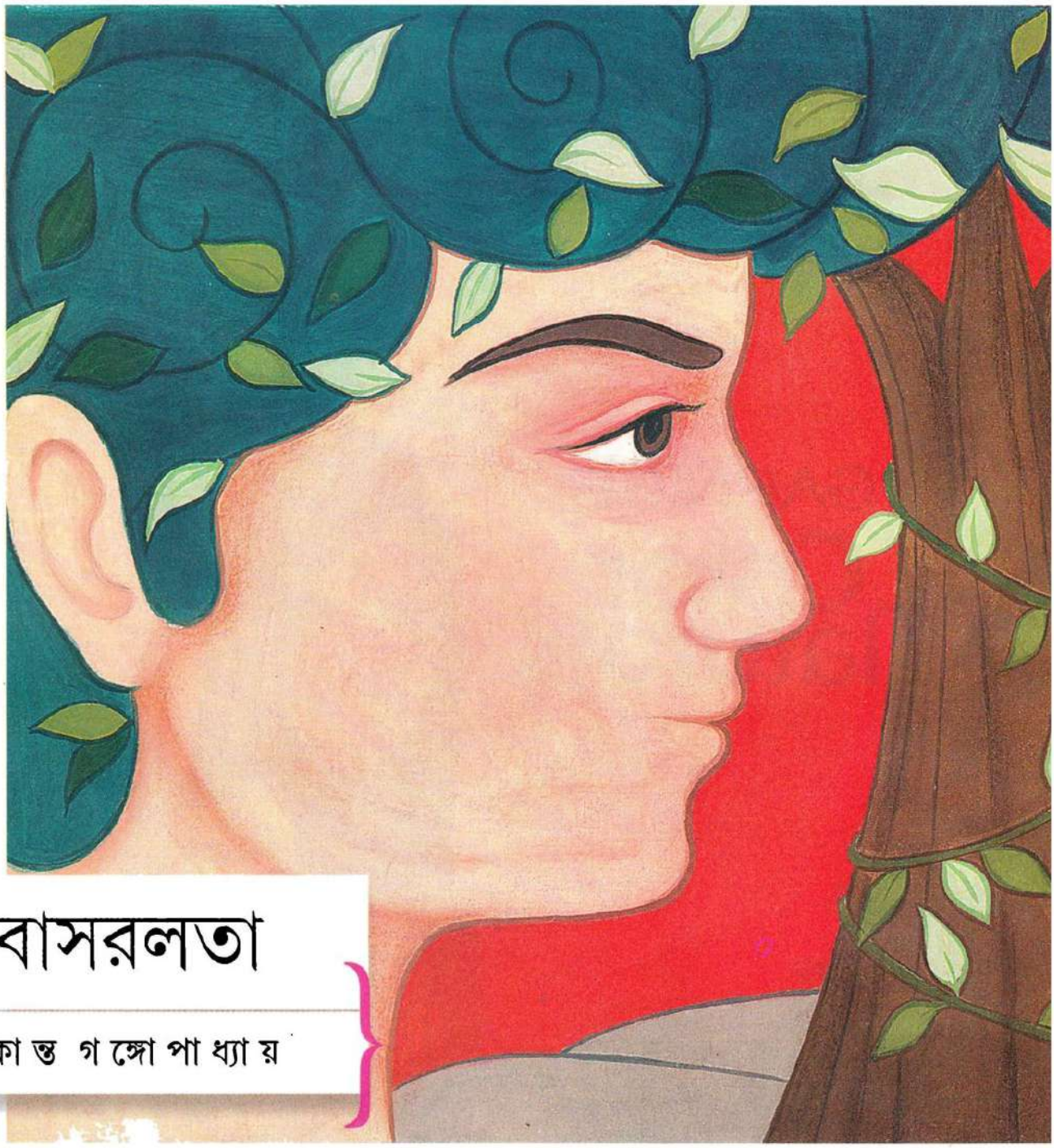

বাসরলতা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরে থইথই করছে দিনের প্রথম আলো। কিছুক্ষণ হল ঘুম ভেঙেছে বিহানের। মুড পুরো অফ। দারুণ একটা স্বপ্ন দেখছিল, পুরোটা ভুলে গিয়েছে। ভালর অনুভূতিটুকু অদৃশ্য চাদরের মতো রয়ে গেছে চেতনায়। এলোমেলো স্বপ্ন বড় একটা দেখে না বিহান। তার স্বপ্ন পারম্পর্য রেখে চলা সিনেমার মতো। একটু আধটু পরাবাস্তবতার ছোঁয়াও থাকে, যা স্বপ্নটাকে নান্দনিকতার মাত্রা দেয়। বিহানের বয়স যত বেড়েছে পরিচিত মণ্ডলে নিজের স্বপ্নের গল্প বলা ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বাস করতে চায় না কেউ। বলে বানানো। স্বপ্ন কখনও এত গোছানো হতে পারে না। দোষ দেওয়া যায় না ওদের। চেনাজানাদের কাউকেই কোনও দিন বিহানের মতো সঙ্গতিপূর্ণ স্বপ্নের কথা বলতে শোনা যায়নি। দেখেনি বলেই বলেনি! স্বপ্ন নিয়ে মাথাও ঘামায় না তারা। বিহানও নিজের স্বপ্নকে মোটেই তেমন গুরুত্ব দেয় না। আখেরে লাভ হয় না তো কিছুই। আদায় উশুল নেই একফোঁটা। তেমনি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করা বা এলোমেলো করে দেওয়ার কোনও পন্থা বিহানের হাতে নেই। ঘুমোতে যাওয়া মানেই অচেতনে সিনেমা হলে ঢুকে পড়া। ভাল স্বপ্ন যেমন দেখে, দুঃস্বপ্নের ভোগান্তিও পোহাতে হয়। বিহান জানে সৃষ্টিতে তার মতো রেয়ার মানুষ আরও কিছু আছে, যারা স্বপ্নের কাছে একইরকম ভাবে নিরুপায়। প্রাপ্তি এইটুকুই, স্বপ্ন যেহেতু প্রায় বাস্তবের মতো, তাই ভাল স্বপ্নের ঘোরটায় থাকা যায় বেশ কিছুক্ষণ। কিশোর বয়সে বিহান নিজের স্বপ্নের ব্যাপারটায় খুব এক্সাইটেড থাকত। দিদির উৎসাহ ছিল আরও বেশি। বিহানের ঘুম ভাঙলেই পাঁচ বছরের বড় দিদি এসে চুপিচুপি জানতে চাইত, আজ কী দেখলি বল?

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

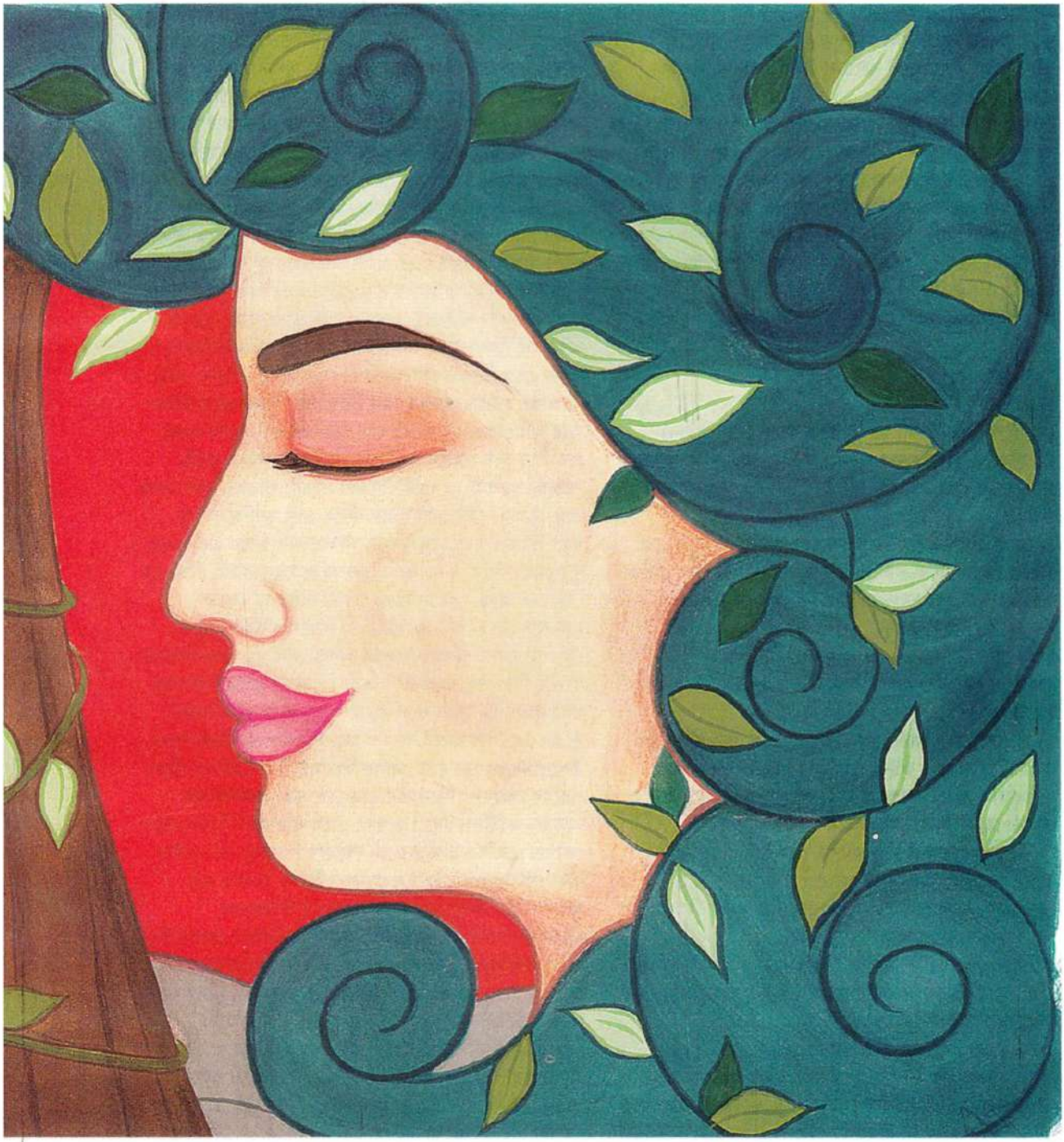

ভাল, মন্দ সব স্বপ্নই বলত বিহান। যথাক্রমে আনন্দ ও মনখারাপ হত দিদির এবং বিহানের। স্বপ্নের গোছানো ভাব দেখে দিদিরও সন্দেহ জাগত। মাঝে মাঝে বলত, "দ্যাখ ভাই, তুই বানিয়ে বলছিস না তো? সত্যিই এরকম দেখলি!" ভাবটা এমন যেন, স্বপ্ন পাঠায় ভগবান ধরনের কেউ। তাতে নিজের কল্পনা মেশানোটা পাপ। দিদির কেন এত আগ্রহ ছিল স্বপ্নের গল্প শোনার, জানা হয়নি। দেখতে দেখতে ভাই-বোন দু'জনেই ছেলেমানুষির বয়সটা পেরিয়ে গিয়েছে। বিয়ে-থা হয়ে দিদি এখন ঘোরতর সংসারী। চন্দননগরের শ্বশুরবাড়ি থেকে হাওড়ার বাপের বাড়িতে ক'টা দিনই বা আসতে পারে! লাস্ট কবে রাত কাটিয়েছে মনে পড়ে না। আজকের মতোই বিহান যখন ছোটবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্বপ্ন মনে করতে পারত না, ঠেলা মারত দিদি। বলত, ভাল করে ভেবে দ্যাখ, ঠিক মনে পড়বে। —আঠাশ বছরে এসে এখনও যখন স্বপ্ন ভুলে যায় বিহান, ভিতর থেকে দিদির সেই আকুলতাটা ঠেলা মারে। ভুলে যাওয়া স্বপ্ন উদ্ধার করা ভারী কঠিন। অথচ মাঝপথে ভেঙে যাওয়া কোনও স্বপ্ন একবার যদি মনে থেকে যায়, সারাদিন নানান কাজে সেটা ভুলে গেলেও, রাতে ঘুমোনোর সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের পরবর্তী অংশটা দেখতে শুরু করে বিহান। আজকের স্বপ্নটা কি সমুদ্রের ছিল? মনের গভীরে শোঁ-শোঁ আওয়াজ আর নোনা আস্বাদ টের পাওয়া যাচ্ছে যেন! কেন যে মনে পড়ছে না স্বপ্নটা... চা নিয়ে ঘরে ঢুকল বউদি। বলল, "কী ব্যাপার, অনেকক্ষণ তো উঠেছ মনে হচ্ছে। চোখ চেয়ে শুয়ে আছ যে বড়!"

উঠে বসে বিহান। বউদিকে সমীহ করে চলে। মশারি তুলে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ এগিয়ে দিল বউদি। এত

Scanned with CamScanner

সকালে খবরের কাগজ পেয়ে বেশ অবাক হল বিহান। জিজ্ঞেস করে, "বাবা কি বেরোল কোথাও?"
বউদি বলল, "বাড়িতেই আছেন। উনিই বললেন কাগজটা তোমাকে দিতে।"
"কেন? আজ হঠাৎ বদান্যতার কারণ? দশটার আগে তো কাগজ ছাড়তেই চায় না।" বলে চায়ে চুমুক দিয়ে কাগজের প্রথম পাতাটা উলটে হেডলাইনে চোখ বোলাতে লাগল বিহান। প্রথম পাতাটায় একটাই বিজ্ঞাপন। মশারি পাট করতে করতে বউদি বলল, "তুমি তো একটু পরেই জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যাবে। বুদ্ধিজীবী পুত্রের কাছে যদি খবরের আপডেট না থাকে, জনসমক্ষে ঠিকঠাক কমেন্ট দিতে পারবে না।"
নিজের প্রতি পরিহাসের হাসি হেসে বিহান বলল, "তুমিও ব্যঙ্গ করছ!"
"আর কে করে?"
"বন্ধুরা।"
মোবাইল বেজে উঠল। মাথার কাছে রেখে শোয় বিহান। সাতসকালে কার দরকার পড়ল তাকে! যস্বপ্নটা মনে না পড়া পর্যন্ত শান্তি হচ্ছে না তার। "কী হল, ফোনটা ধরো।" তাড়া দিল বউদি।
চা খেতে-খেতে বালিশের পাশ থেকে ফোনসেট তুলে নেয় বিহান, স্ক্রিনে দেখে, কলি কলিং। তার মানেই অকারণ কোনও ঝামেলা। কেটে দেওয়ার সাহসও বিহানের নেই। অগত্যা ধরতেই হয়, "হ্যাঁ, বলো!"
"গুড মর্নিং।"
প্রত্যুত্তরে মর্নিং বলে বিহান জানতে চায়, "কী খবর? সকাল হতেই ফোন!"
'নাথিং স্পেশাল। আজ ব্রেকফাস্টটা তোমার সঙ্গে করব ঠিক করেছি। চলে এসো কুইক। তার সঙ্গে কিছু কথাও আছে।'
"ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে আমার। কথাগুলো কি পরে শুনলে চলবে? আজ সকাল থেকে অনেক কাজ আমার।"
"জানি রোববার খুবই ব্যস্ত থাকো, সেজন্যেই ব্রেকফাস্টের টাইমে ডেকেছি। আর এত সকালে তোমাদের বাড়িতে রোববারের জলখাবার হয় না, তাও আমার জানা। মিথ্যে দিয়ে দিন শুরু কোরো না প্লিজ।"
শুরু হয়ে গেল জ্যাঠাইমাগিরি। বিহান বলে, "তাহলে সত্যিটা বলি। আমি এখনও বিছানা থেকেই নামিনি। আধঘণ্টা মতো লাগবে তোমাদের বাড়িতে যেতে।"
"ও কে, নো প্রবলেম। আই অ্যাম ওয়েটিং। ছাড়ছি।"
ফোনসেট আগের জায়গায় ছুড়ে দিয়ে বড়সড় করে আড়মোড়া ভাঙে বিহান। বউদি দাঁড়িয়ে ফোনের কথাগুলো শুনেছে। বলে উঠল, "দেখেছ, আমি বুদ্ধিজীবি বললেই সেটা ঠাট্টা মনে হচ্ছে। এদিকে দিনের প্রথম ফোনটা এল প্রাক্তন প্রেমিকার থেকে। একেবারে ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন সমেত। দেখো হয়তো টি-শার্ট কিংবা পাঞ্জাবি গিফ্‌ট দেবে। টিভির আগের টক শো'তে তোমার পাঞ্জাবিটা মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি। এবার ওর থেকে হামেশাই ডাক পাবে।"
সিরিয়াস নোটে লেগপুল করে যাচ্ছে বউদি। খাট থেকে নেমে আসে বিহান। টেবিলের উপর রাখা সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই তুলে নেয়। টয়লেটে যাবে। বিছানা ঝাড়তে-ঝাড়তে বউদি বলে, "কলি কি বাপের বাড়িতেই থেকে যাবে? ছেড়েই দিল শ্বশুরবাড়ি!"
"কী করে বলব!" বলে ঘরের চৌকাঠ ডিঙোয় বিহান।
আধঘণ্টার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হল। বিহান শ্লথ পায়ে চলেছে কথাকলিদের বাড়ির দিকে। আর কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকলে জলখাবার খাইয়েই ছাড়ত মা। রোববার বাড়ির জলখাবারটা মিস করতে চায় না বিহান। লুচি কিংবা পরোটা, আলুর সাদা তরকারি অথবা আলুভাজা, ঘুগনিও হয় মাঝে মাঝে। বাবা বাজার থেকে নিয়ে আসে বোঁদে নয়তো জিলিপি, একেবারে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া। কলিদের বাড়িতে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, যা মোটেই পছন্দ হয় না বিহানের। রোববারটা মনে হচ্ছে সব অর্থে বরবাদ হল। শুধু খাওয়ানোর জন্য কলি ডাকেনি, বলছে কিছু কথা আছে, মানে আলোচনা। অতি সামান্য বিষয় নিয়েও গুরুতর আলোচনা চালাতে পারে কলি। দশটা নাগাদ অমিতেশদার বাড়িতে যাওয়ার কথা বিহানের। তাদের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সামনের সংখ্যার প্রুফগুলো নিতে হবে। প্রতিশব্দ পত্রিকাটা প্রায় দশ বছর হতে চলল। শুরুতে অনেকেই ছিল পাশে। অমিতেশদা প্রথম থেকেই সম্পাদক। বন্ধুরা একে একে চাকরি অথবা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ল, কেউ বা আগ্রহ হারিয়ে এমনিই সরে গিয়েছিল। পড়ে রয়েছে বিহান আর অমিতেশদা। দু'জনের হাত ধরে আজও একমাস অন্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'প্রতিশব্দ', অত্যন্ত কৃশকায় একটি পত্রিকা। আগামী সংখ্যাটা বইমেলা সংখ্যা। পাতাও বেশি। কাজ তাই অনেক। কলি দেরি করিয়ে দিলে বেশ মুশকিলে পড়ে যাবে বিহান। পথ চেয়ে থাকবে অমিতেশদা। মাঝে এক সপ্তাহ দু'জনের দেখা হবে না। অমিতেশদার ব্যাঙ্কের চাকরি, বিহানের সেলসের কাজ। বেজায় ব্যস্ত। ইদানীং বিহানের ব্যস্ততা খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। বউদি যে কারণে বুদ্ধিজীবী বলে লেগপুল করছে। বিহানের দুটো কবিতা গান হয়ে এখন বাজারে বেজায় হিট। শুধু শহর নয়, গ্রামের লোকজনও পছন্দ করেছে গান দুটো। গান মূলত চলে সুরের জন্য। কথার কন্ট্রিবিউশন সুরের চেয়ে সব সময়ই কম। গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বরও কথার উপরে থাকে। গান দুটো আবার সিনেমার জন্য তৈরি হয়েছিল। শহরের দর্শকদের সিনেমাটা ভাল লেগেছে। কনটেন্ট ছিল আরবান ক্রাইসিস নিয়ে। তাছাড়া গ্রামে আজকাল সিনেমা চলে কোথায়! বেশির ভাগ হল তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গান দুটোর কথা এবং সুরের মধ্যে ছিল লোকসংগীতের আদল। তাই গ্রামেও হিট। বিপুল পপুলারিটির কারণে গীতিকারও আলোচনায় চলে এসেছে। বিহানকে নিয়ে টুকটাক লেখালিখি হয়েছে কাগজের পেজ থ্রি-তে, মিউজিক লঞ্চের গ্রুপ ফোটো বেরিয়েছে, গ্রুপে বিহানও ছিল। তাতেই বেশ সংকোচের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বিহান। কবি হিসেবে বিহান একেবারেই পিছনের সারির, 'জাগরী' পত্রিকায় দশবার কবিতা পাঠিয়েছে, একটাও ছাপা হয়নি। জাগরীতে কবিতা না বেরনো পর্যন্ত সাহিত্যমহলের লোক কবিকে পাত্তা দেয় না। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, যে কথাগুলো দিয়ে সুর বাঁধা হয়েছে, সেটা কবিতার সিরিয়াসনেস দিয়ে লেখেনি বিহান, সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে লিখেছিল। যদিও সেই সুর নেননি সুরকার। নিজের মতো করে সুর করেছেন। বিহান আজ পর্যন্ত গুনগুন করতে-করতে পাঁচ-ছ'টা গান লিখেছে। কবিতা লিখেছে দু'শোর বেশি। প্রথম শ্রেণির না হলেও কমার্শিয়াল কাগজে বেশ কিছু কবিতা ছাপা হয়েছে আর লিট্‌ল ম্যাগাজিনে সে নিয়মিত লেখেই। সেই কারণেই গীতিকারের বদলে আলোচনায় তার কবি পরিচয়টাই চলে আসছে সামনে। সিনেমাটির পরিচালক, সুরকার, গায়ক-গায়িকা মিডিয়াতে বলছেন কবি বিহান মুখোপাধ্যায়ের কথায় সুর দেওয়া হয়েছে। ফাঁকতালে পাওয়া এই স্বীকৃতিতে বিড়ম্বনায় পড়ে গিয়েছিল বিহান। মনে হতে শুরু করেছিল, এলাকার কম পরিচিত মানুষটি বলে বসবে, তুমি কবিতা লেখো জানতাম না তো! কোন-কোন পত্রিকায় বেরিয়েছে?

Scanned with CamScanner

—এসব কিছুই হয়নি। নিজের পাড়াতেই এরকম প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি বিহানকে। সাহিত্য পরিমণ্ডলে কেউ যখন তাকে হিট গানের রচয়িতা বলে আলাপ করিয়েছে, খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকরা বিহানের দিকে আগ্রহ ভরে তাকিয়েছে ঠিকই, তার কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কিছুই জানতে চায়নি। সমস্যাটা শুরু হয়েছে টিভির টক শোতে বসার পর। কলেজ ইলেকশনে নমিনেশন ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটা জায়গায় রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছে। বিহান যেহেতু ইয়ং সেলেব্রিটি, তাই চ্যানেলের মনে হয়েছে বিহানকে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে ডাকা যায়। ডাকে সাড়া দিয়েছিল বিহান। খুব বেশি বলার সুযোগ পায়নি। টুকরো-টুকরো বক্তব্য যোগ করলে বড়জোর পাঁচ মিনিট মতো হবে। কিন্তু তার অভিঘাত যে কী বিশাল আকারের হতে পারে, কোনও ধারণাই ছিল না বিহানের। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে মোবাইলের সুইচ অন করতেই ধেয়ে এসেছিল বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ফোন কল, মেসেজ। অভিনন্দনের বন্যা হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন সকালে বাজারে গিয়ে চায়ের দোকান থেকে পান-সিগারেটের গুমটি, সব্জিওলা, মাছওলা, ডিমওলা কেউ না কেউ তাকে দেখে বলে উঠেছে, 'কাল দেখলাম টিভিতে'!

একটু এগিয়ে কেউ বলেছে, 'আপনি দারুণ বলেছেন। উচিত কথাই বলেছেন।' ...বিহানের প্রায় থতমত অবস্থা। টিভির অতিথি হয়েছে বলেই এই সরল মানুষগুলো তাকে বিশিষ্ট লোক ভাবতে শুরু করেছে। বিষম সংকোচের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিল বিহান। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কবি কিংবা গীতিকার হিসেবে তেমন জোরাল পরিচিতি না হওয়া অবধি সে টিভির টক শোতে বসবে না। এই ঘটনার সঙ্গেই দু'জনের ব্যাপারে বিহানের কৌতূহল জেগেছিল, অমিতেশদা আর কথাকলি। এরা কি অনুষ্ঠানটা দেখেছে? বাজার থেকে ফিরে আসার পর খানিকক্ষণের মধ্যেই ফোন করেছিল অমিতেশদা। প্রথমেই অনুযোগ জানাল টক শো-এর খবরটা না জানানোর জন্য। বিহান বলেনি লজ্জায় জানাতে পারিনি। বলেছে, এমন হট করে ডেকে পাঠাল, কাউকেই জানিয়ে উঠতে পারিনি। অমিতেশদা বলেছিল, "জানালে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে অনুষ্ঠানটা দেখতে পারতাম। তোর বউদি দেখেছে। বলছে তোকে নাকি ফিল্মস্টারের মতো লাগছিল! ভালই হল, গান লিখে বিখ্যাত হয়ে যা। বিখ্যাত কবিতা প্রতিশব্দ্য থাকলে পত্রিকার বিক্রি বাড়বে।"

সন্ধে অবধি ধৈর্য ধরেছিল বিহান, কলির ফোন এল না। নিজেই ফোন করে বলেছিল, "কাল একটা চ্যানেলের টক শোতে গিয়েছিলাম। শর্ট নোটিসে ডেকে পাঠিয়েছিল। বাই এনি চান্স তুমি কি শো'টা দেখেছ?"

"দেখেছি। প্রচণ্ড ফাম্বল করছিলে। গুছিয়ে কথাই বলতে পারছিলে না। ভীষণ ক্যাবলা-ক্যাবলা লাগছিল। এরপর যখন যাবে, একটু প্রিপেয়ার্ড হয়ে যেও।" এই ছিল কলির কমেন্ট। এটা যদি বউদিকে শোনানো যেত, তাহলে আর বলত না টিভিতে দেখাচ্ছে বলেই কলি বিহানকে ডেকে পাঠাচ্ছে সাতসকালে। একজন টক শোটা না দেখুক, মনেপ্রাণে চেয়েছিল বিহান। তিনি হচ্ছেন কিশোরীলাল বাজাজ। বিহানের কোম্পানির মালিক। ওঁর স্নেহ, প্রশ্রয়ে চাকরিতে বিহান মোটামুটি শান্তিতেই আছে। টকশো-এর মাধ্যমে উনি যদি জেনে যেতেন তাঁর কর্মচারীটি বাংলার একজন ইনটেলেকচুয়াল, কথাবার্তা চালাতে গিয়ে আড়ষ্ট বোধ করতেন। বাজাজজি শো'টা দেখেননি। দেখলে এত দিনে প্রসঙ্গটা একবার তুলতেন...।

REGLAN

শারদ শুভেচ্ছা

APPLIANCES • NONSTICK COOK WARE • ENAMEL WARE • THERMO WARE

Scanned with CamScanner

পাড়ার মাঠের কাছে চলে এসেছে বিহান। ওপারে কলিদের ঝকঝকে দোতলা বাড়ি। রোববার বলে সকালবেলাতেই বাচ্চাদের মাঠে দেখা যাচ্ছে। এই যে মাঠটা লোহার পাইপ আর কিছু দূর অন্তর সিমেন্টের পিলার দিয়ে ঘেরা হয়েছে, পুরোটাই কলির বাবার দেওয়া টাকায়। রুদ্রকাকু হাইকোর্টের নামী উকিল। আট বছর আগে এ পাড়ায় যখন বাড়ি করে বসবাস শুরু করলেন, বিহানরা গিয়েছিল মাঠ ঘেরার টাকা চাইতে। তাদের পাড়ায় থাকতে আসার দক্ষিণা। সেদিনই কলির সঙ্গে বিহানের প্রথম আলাপ।

বিহান যেমনটা ভেবেছিল, সেটাই ঘটছে। কলি ডাইনিং টেবলে

"ক্ষমতায় থাকাকালীন বামেরাও কিছু কম করেনি।" বলল বিহান। কলি বলে ওঠে, "আমি তোমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি।"

সাজাচ্ছে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, দুধ আর কর্নফ্লেক্স (দেখলেই কেমন যেন গা গোলায় বিহানের), স্ক্র্যাম্বলড এগ, ব্রেড-বাটার, জ্যাম, কলা, অরেঞ্জ জুস। গাউনের উপর গায়ে চাদর জড়িয়েছে কলি। এতটা ঠান্ডা এখনও পড়েনি। ওর কি জ্বর-টর এল? কলির চাদরটা কিন্তু জব্বর অনুঘটকের কাজ করেছে, আজ সকালের ভুলে যাওয়া স্বপ্নটা মনে পড়ে গেছে বিহানের। সমুদ্রের স্বপ্ন ছিল না, ঝরনার। চাদর গায়ে একটা মেয়ে খুব উঁচু থেকে নেমে আসা এক ঝরনার পাদদেশের পাথরে দাঁড়িয়ে। স্বপ্নে মেয়েটার ব্যাকসাইড দেখেছিল বিহান। বেশ উৎকণ্ঠায় ছিল, স্বপ্নের মেয়েটি তার প্রেমিকা অথবা স্ত্রী। বিহান ভয় পাচ্ছিল তার সঙ্গিনী যেন ঝরনার আরও কাছে না চলে যায়! এই ছিল স্বপ্নটা। কলি পিছন ফিরে মাইক্রোওভেনে সম্ভবত দুধ গরম করছে। স্বপ্নের মেয়েটার সঙ্গে মিলছে কিনা খেয়াল করে বিহান। না, কোনও মিল নেই। স্বপ্নের মেয়েটা কলির চেয়ে রোগা।

দু'হাতে দু'টো দুধের বোল নিয়ে টেবিলে এল কলি। চেয়ারে বসে একটা বোল আর কর্নফ্লেক্সের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বিহানকে বলল, "নাও, শুরু করো।"

কলির মা যত দিন বেঁচে ছিলেন, মেয়ের অনেক সমস্যা নিজেই সামলেছেন। একান্তই যদি বিহানের ডাক পড়ত, আলোচনার টেবলে থাকতেন কাকিমা। এখন বিহানকেই কলির সমস্ত সমস্যা শুনতে হয়, পরামর্শ দিতে হয় ওর মন বুঝে। কলির বিয়ের ছ'মাস বাদেই কাকিমা চলে গেলেন ব্রেন স্ট্রোকে। তাতে কলিদের পরিবারে যেমন ক্ষতি হয়েছে, বিহানেরও ভোগান্তি বেড়েছে খুব। কাকিমা চলে যাওয়ার পর কলির এক দূর সম্পর্কের পিসি এসে আছেন এ বাড়িতে। গৃহস্থালি উনিই সামলান। বিধবা মানুষ। এতই চুপচাপ থাকেন, বাড়িতে আছেন কিনা বোঝা যায় না। এখন অবধি তাঁকে দেখা যায়নি।

"চন্দ্রিমাকে মনে আছে তোমার?" পাঁউরুটিতে মাখন মাখাতে-মাখাতে জানতে চাইল কলি।

মনে করতে পারছে না বিহান। চুপ করে আছে। কলি বলে ওঠে, "আরে বাবা বঙ্গবালা গো। সেবার দোলে একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে গেলাম না!"

এবার মনে পড়ল বিহানের। এক্ষুনি সেটা স্বীকার করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। চন্দ্রিমার সূত্রে কতটা ঝামেলায় পড়তে হবে, আন্দাজ করে নিতে পারলে ভাল হত। কলি অধৈর্যের গলায় বলে উঠল, "এই সেদিনের কথা ভুলে গেলে! চন্দ্রিমা আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। পশ্চিম মেদিনীপুরে ধুমুরিয়াতে বাড়ি। কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা চালিয়েছে। আমি, চন্দ্রিমা, মিতুল ঠিক করলাম বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনে যাব। বাবা কার্তিকদার উপর ভরসা করে তিন মেয়েকে ছাড়তে পারল না। তোমাকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।"

অত্যন্ত অপছন্দের খাবারটা চামচ দিয়ে খেতে-খেতে বিহান বলল, "ঘটনাটা সেদিনের নয়, চার বছর আগে।"

"ওই হল। মনে পড়েছে তো চন্দ্রিমাকে? বেচারি কাল ফোন করেছিল। ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছে। শুধু ও পড়েনি, গোটা পরিবার।" বলে মাখন মাখানো পাঁউরুটির প্লেট এগিয়ে দিল কলি। বলে যাচ্ছে, "আমার সঙ্গেও ওর দেখা নেই প্রায় বছর তিনেক হল। শ্রীতমার বিয়েতে এসেছিল, জমিয়ে আড্ডা মেরেছিলাম। আমাদের সঙ্গে মাস্টার্স তো করেনি। গ্রামের স্কুলে চাকরি পেয়েছিল, ওর বাবার ডাক্তারিতে হেল্প করত। গ্রামের কোয়াক ডাক্তার চন্দ্রিমার বাবা। ভদ্রলোক বাম রাজনীতি করেন। পরপর দুটো টার্মে পঞ্চায়েত প্রধানও হয়েছিলেন। এখন আর পার্টির কাজে ততটা অ্যাকটিভ নন। দলের দুর্নীতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পেরে অনেকটাই সরে এসেছেন।"

"বিপদটা কী বলো?" বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে চেয়ে বলল বিহান।

থমকে গিয়ে ফের শুরু করল কলি, "কাগজে দেখছ তো নতুন দল সরকারে আসার পর গ্রামে বাম সমর্থকদের উপর কীরকম অত্যাচার করছে।"

"ক্ষমতায় থাকাকালীন বামেরাও কিছু কম করেনি।" বলল বিহান।

কলি বলে ওঠে, "আমি তোমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। চন্দ্রিমার অসহায় অবস্থার কথা জানাতে চাইছি।"

বিহান নিরুত্তর থেকে খাওয়াতেই ব্যস্ত থাকল। কলি বলে যাচ্ছে, "সরকারের দলের লোকেরা অ্যান্টি পার্টি লোকেদের শাস্তি জরিমানা ধার্য করছে। চন্দ্রিমার বাবা শ্রীকান্ত মিশ্রর

Scanned with CamScanner

জরিমানা ঠিক হয়েছে দশ লাখ টাকা আর দশ বিঘের একটা পুকুর। না দিলে মারধর করে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে দেবে গোটা পরিবারকে।"

খাওয়া থেমে গেছে বিহানের। সবিস্ময়ে বলে ওঠে, "দশ লাখ! সাধারণ একজন গ্রামের মানুষ এত টাকা পাবেন কোথায়?"

"এত টাকা সত্যিই চন্দ্রিমার বাবার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, মানুষটা সাধারণ নয়। বাম আমলে দু'বার পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছিলেন। চন্দ্রিমার দাদা শিলিগুড়ি কলেজের প্রোফেসর, রুলিং পার্টি মনে করে বাম আমলে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ছেলের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছেন শ্রীকান্ত মিশ্র। ঘটনা আদতে তা নয়। চন্দ্রিমার দাদা বছর চারেক হল চাকরিটা পেয়েছে, তত দিনে শ্রীকান্ত মিশ্র পার্টির কাজ থেকে নিজেকে অনেকটাই সরিয়ে নিয়েছেন। চন্দ্রিমার দাদা নিজের যোগ্যতায় নেট কোয়ালিফাই করে চাকরিটা পেয়েছে। গ্রামের সাধারণ সমর্থক এত সব বোঝে না। যে সব নেতারা ওদের উসকায়, তারা কিন্তু সবই জানে, বোঝে।"

থামল কলি। ধীরেসুস্থে পাঁউরুটির স্লাইসটা মুখে চালান করে চুমুক মারল ফ্রুট জুসে। বলতে শুরু করল, "মাস ছয়েক আগে চন্দ্রিমার খুড়তুতো বোনের বিয়েতে আড়াই হাজার লোক খাইয়েছেন শ্রীকান্ত মিশ্র।"

"ওরে বাবা, ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে এত লোক খাইয়েছেন মানে তো ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভালই" বলল বিহান।

কলি বলে, "ঠিক এই কথাটাই তুলছে রুলিং পার্টির লোক। এত লোক খাওয়ানোর আসল কারণটা তারা খতিয়ে দেখছে না অথবা দেখতে চাইছে না। প্রথমত চন্দ্রিমার কাকার ফ্যামিলি ওর বাবার প্রায় আশ্রিতই বলা যায়। গ্রামের মন্দিরে নিত্যপুজো করেন। মন্দিরের সেবায়েত চন্দ্রিমাদের পরিবার। ভাইয়ের মেয়ে তাই শ্রীকান্ত মিশ্রর কাছে নিজের মেয়েরই সমান। আশপাশের চার-পাঁচটা গ্রাম জুড়ে তিনি ডাক্তারি করেন। কত ক্লায়েন্ট ভেবে দেখো। সব পরিবারকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে আড়াই হাজার তো হবেই।"

চন্দ্রিমার সঙ্গে ওর ফোনালাপটা যে দীর্ঘ হয়েছে, সেটা মালুম পাচ্ছে বিহান। চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল কলি। চা অথবা কফি আনতে গেল বোধহয়। এতক্ষণ অবধি যা শুনল বিহান, খবরের কাগজের নিত্যনৈমিত্তিক খবরের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাই ঘটনাগুলো তাকে সেভাবে স্পর্শ করছে না। কলা আর স্ক্র্যাম্বলড এগ-এ মন দিয়েছে বিহান। কলি দু'কাপ ধোঁয়া ওঠা কফি নিয়ে ফেরত এল। একটা কাগজ বিহানের সামনে রেখে চেয়ারে বসে বলতে থাকল, "আড়াই হাজার লোক খাওয়ানোর পিছনে নিজের ডাক্তারির মার্কেটিং যেমন আছে, প্রতিপত্তি দেখানোর ঝোঁকটাও অস্বীকার করা যায় না। যতই হোক, দু'বার পঞ্চায়েত প্রধান এবং যুবক বয়স থেকে গ্রামের নেতার মর্যাদা পেয়ে এসেছেন, সম্মানটার প্রতি একটা আসক্তি তো আছেই। অত লোক খাওয়াতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন। সরকারের দল সেটা বুঝছে না। ধরে নিয়েছে বামদল ক্ষমতায় থাকার সময় তিনি প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। টাকা, পুকুর না দিলে মেরে হাড়গোড় ভেঙে দেবে শ্রীকান্ত মিশ্রর। ইতিমধ্যেই ওঁর দুই পার্শ্বচরের উপর চড়াও হয়ে পা, মাথা ভেঙেছে সরকারের পার্টি। জরিমানা ধার্য হয়েছিল, দিতে পারেনি তারা। না দিতে পারার মতোই ডিমান্ড করছে ক্ষমতায় আসা পার্টির ছেলেরা। দুই পার্শ্বচরকে থানাতে রিপোর্ট করতে দেয়নি। হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে এনে বাড়িতে ফেলে রেখেছে। জমি লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল, দু'জনেই লেখেনি। ওইটুকুই তো সম্বল। সুস্থ হওয়ার পর আবার মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ওরা।"

কথা বলার মাঝে মাঝে কফির মগে চুমুক দিয়েছে কলি। এবার একেবারেই চুপ করে গেল। ছলছল করছে চোখ, জল এখনও আসেনি। খবরের কাগজের অক্ষর থেকে গ্রামটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে বিহানের কাছে। সত্যিই এত মর্মান্তিক অবস্থা ওখানে। খানিক ধরা গলায় ফের বলতে লাগল কলি, "দুই পার্শ্বচরকে প্রথমে শাস্তি দেওয়া মানে শ্রীকান্ত মিশ্রকে উদাহরণসহ থ্রেট করা। এবার ওঁর পালা।"

"উনি কেন গ্রাম থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন না? শিলিগুড়িতে ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন।"

"উনি পালালে পরিবারের উপর অত্যাচার হবে। শ্রীকান্ত মিশ্রর জায়গায় মার খাবে ওঁর ভাই। বাড়িতে আরও দু'জন পুরুষ মানুষ আছে, চন্দ্রিমার খুড়তুতো ভাই, ঠাকুরদা। তাদের কপালে কী জুটবে, কে জানে! মেয়েরাও লাঞ্ছিত হতে পারে। জমিজমাও কেড়ে নেবে পার্টির ক্যাডাররা। ওরা তখন যাবে কোথায়? অতজনের ভরণপোষণের ক্ষমতা চন্দ্রিমার দাদার নেই। তাছাড়াও ওরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে এত দিনের বন্ধন কেটে সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে বাজে লোকগুলোর হুমকির ভয়ে পালাবেই বা কেন? এর কোনও বিহিত করা যায় না?"

উত্তেজিত ভাবে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল কলি।

বিহান বলে, "বিহিত হয়তো করা যায়। কিন্তু কীভাবে, তা তো বলতে পারব না।"

চোখ নামিয়ে বসে আছে কলি। ওর খাওয়া মনে হচ্ছে শেষ। ডান পাশের জানলা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে ওর পিঠে, চুলে। বিষণ্ণ অবস্থাতেও কী অসাধারণ সুন্দর লাগছে ওকে। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরত আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত সিঁথিতে আলতো সিঁদুর দিত। এখন আর দেয় না। ওর দাম্পত্য সম্পর্কটা এখন কোন পর্যায়, জিজ্ঞেস করতেই ভয় পায় বিহান। বিরাট ক্যাচাল পাকিয়ে বাপেরবাড়ি চলে এসেছে। নিজের সমস্যার দিকে এখন ওর মন নেই। চন্দ্রিমাদের পরিবার নিয়ে উদ্বেগ, আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এটাই কলির ইউনিকনেস। আর পাঁচজনের মতো স্বার্থপর নয় সে।

বিহানেরও খাওয়া শেষ। টিস্যু পেপার তুলে মুখ মুছতে মুছতে বলে, "চন্দ্রিমা তোমাকে শুধু ঘটনাগুলো বলল, না কি বিহিতও চাইছিল?"

"ধরো, বিহিত চায়নি। তা বলে ওদের ঘটনাগুলো শুনে আমি চুপ করে বসে থাকব?"

এবার শান্ত স্বরে কলি বলতে থাকে, "চন্দ্রিমা চাইছে আমার বাবা কিছু করুক। নামী উকিল। উপর মহলে প্রচুর চেনাজানা। বাবাকে ওদের অবস্থার কথা বললাম। শুনে বাবাও খুব চিন্তিত হল। কিন্তু পার্টি লেভেলে ইনফ্লুয়েন্স খাটানোর ক্ষমতা বাবার নেই। পলিটিক্স থেকে চিরকালই দূরে থেকেছে। ঘটনাটা শহরের দিকে ঘটলে বাবা আইনের রাস্তা ধরে কিছুদূর অবধি চেষ্টা করতে পারত। ধুমুরিয়ার মতো প্রত্যন্ত গ্রামে শাসক দলের আইন চলে। পুলিশ সেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ। রুলিং পার্টির অর্ডার অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করে ওরা।"

"তা হলে উপায়? কীভাবে এই বিপদ থেকে বাঁচবে ওরা?" প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল বিহান।

কলি বলে ওঠে, "তুমি বাঁচাবে ওদের।"

চমকাতেই ভুলে গেল বিহান। বলে উঠল, "আমি!"

"হ্যাঁ, তুমি। কথাটা আমি হুইমজিক্যালি বলছি না। অনেক ক্যালকুলেশন করে বলছি।'

প্রতিবাদ করে ওঠে বিহান, "আমি হিসেবের মধ্যে আসিই না। কোথাকার কে আমি? আমার সাধ্য কোথায় অজানা অচেনা

গ্রামের বিশাল ক্যাডার বাহিনীকে আটকানোর?"

"ওয়েট। আমার হিসেবটা আগে শোনো। তারপরেই তোমার কাছে সব কিছু জলের মতো সোজা লাগবে।"

অনেকটা অবধি বেশ প্র্যাকটিকাল কথাবার্তা চালিয়েছে কলি, এবার শুরু হয়েছে আজগুবি আইডিয়া প্রদান। এরকম অভিজ্ঞতা আগেও বহুবার হয়েছে বিহানের। কলি নিজের আইডিয়া তাকে শুনিয়েই ছাড়বে। নীরব থাকা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই বিহানের কাছে। খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে প্ল্যান বোঝাতে শুরু করল কলি, "দ্যাখো, তুমি তো এখন সেলেব্রিটি, সমাজে সেলেব্রিটিদের কদর সব সময়ই থাকে।"

চুপ করে থাকা আর সম্ভব হয় না। বিহান বলে ওঠে, "দুটো গান লিখেই সেলেব্রিটি হয়ে গেলাম! ব্যাপারটা এত সহজ?"

"আরে, বিরাট মাপের না হলেও, লোকে তোমায় চিনতে শুরু করেছে। তোমার মতামত শুনতে আগ্রহী হচ্ছে পাবলিক। তাই না টিভির টক শোতে ডাক পাচ্ছ। তার চেয়েও বড় কথা, তোমার পরিচিত মণ্ডলে বেশ ক'জন বড়-বড় লোক এসে পড়েছে। চন্দ্রিমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে যাঁদের সাহায্য তুমি নিতেই পারো।"

"তাঁরা কারা-কারা?"

"এই যেমন ধরো, মিউজিক ডিরেক্টর রাজদীপ সেন। তোমার লেখা কথায় যিনি সুর দিয়েছেন। গায়ক সায়ন, গায়িকা রূপাঞ্জনা, তোমার লেখা গান দুটো গেয়েছে। যে সিনেমায় গানগুলো ছিল, তার পরিচালক সুদীপ ঘোষ তোমার পরিচিত। এদের প্রত্যেককেই শাসক দলের প্রচার অভিযানে দেখা যায়। মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে অথবা পিছনের সিটে জায়গা হয় এদের। শিল্পীদের নিয়ে চলা পছন্দ করেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তোমার চেনা কোনও একজন আর্টিস্টের মাধ্যমে চন্দ্রিমাদের দুরাবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কানে তুলে দিতে পারো। উনি নিশ্চয়ই কোনও স্টেপ নেবেন। দলের ছেলেদের এই ধরনের দৌরাত্ম্য কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। প্রশাসনের শীর্ষে বসে আছেন, প্রত্যন্ত গ্রামে কী ঘটছে না ঘটছে তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।"

হাওড়ার পঞ্চাননতলার অতি সাধারণ ঘরের ছেলে দু'কলম লিখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবধি পৌঁছতে পারে, এটা ভেবেই কেমন যেন নার্ভাস ফিল করে বিহান। বলে ওঠে, "যে পরিচিতজনদের কথা তুমি বলছ, তারা আমার কথা শুনতে যাবে কেন? তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই, অনেক দিন যোগাযোগও নেই।"

"তোমার কথা তারা গুরুত্ব দিয়েই শুনবে। যেহেতু তুমি নিজের জন্য কোনও সুবিধে চাইছ না। পরের জন্য চাইছ। এঁরা শিল্পী মানুষ, যথেষ্ট সেনসিটিভ। চন্দ্রিমাদের ক্রাইসিস ভাল মতোই ফিল করবে।"

"ব্যাপারটা অত সোজা সরল করে দেখো না। বেশিরভাগ আর্টিস্ট রাজনীতিতে এসেছে ধান্দায়। রাজনীতিকরাও তাদের ব্যবহার করার জন্য দলে নিয়েছে। পুরো চাওয়া পাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে সম্পর্কটা। কোনও আর্টিস্টের হয়তো চাই ছ'টা জিনিস, পাবে চারটে। চাওয়ার লিস্টে আমার অনুরোধটা ঢোকাতে যাবে কেন? সে নিজেই পুরোটা পায়নি।" বলে থামল বিহান। একটু ভেবে নিয়ে বলে উঠল, "ওই সব সেনসিটিভিটি ওদের শিল্পকর্ম করার সময় উদয় হয়। প্র্যাকটিকাল ফিল্ডে ভীষণভাবে কেরিয়ারিস্ট। দরকার ছাড়া চিনবেই না আমাকে। আর ওদের প্রয়োজন হবে বলেও মনে হয় না। গান দুটো ফ্লুকে হিট হয়ে গেছে। এতেই সেলেব্রিটি স্টেটাস পেয়ে গেলাম, এই ভ্রমে আমিও ভুগছি না।"

"তুমি তো মানুষকে এত অবিশ্বাস করতে না বিহান। বলছ

World Best Purification Systems Eco Crystal Water Purifiers brings to you a wide range of water purifiers to choose from

EURO WATER | **RO CHAMPION** with Stainless Steel Tank | **POT FILTER** | **FRESH N CLEAN CP**

ECO CRYSTAL PVT LTD. BANGALORE, Kolkata Regional Office - 9830693458, 8336815492,
E-mail : kolkataoffice@eccrystal.com | Website : www.ecocrystal.in

Scanned with CamScanner

বেশিরভাগ আর্টিস্ট ধান্দার জন্য রাজনীতিতে যোগ দেয়। কম ভাগটা তো পড়ে থাকে। তারা হয়তো মানুষের ভাল করার কথা ভেবেই পলিটিক্সে জয়েন করেছে। ওই কম ভাগের মধ্যে তোমার পরিচিতদের কেউ একজন থাকতেই পারে। এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন তুমি? নাকি তোমারই বোধ-অনুভূতিগুলো ক্রমশ ভোঁতা হতে শুরু করেছে? চন্দ্রিমাদের গ্রামের কথাটা একবার ভাবো, যেখানে প্রশাসন বলে কিছু নেই, রুলিং পার্টির নির্দেশ ছাড়া গ্রামে পুলিশ যায় না। বড় হাসপাতাল কুড়ি কিলোমিটার দূরে। কলেজ পনেরো। চন্দ্রিমা ক্লাস ফাইভ থেকে দশ কিলোমিটার সাইকেল ঠেঙিয়ে স্কুলে গিয়েছে। ওর বাবা অনেক চেষ্টা চরিত্র করে গ্রামে কারেন্ট এনেছিলেন। সেই মানুষটাই এখন বাড়ির আলো নিভিয়ে ভয়ে গুটিয়ে থাকেন, ওই বুঝি ওরা এল। গোটা পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। ওরা তো আসবেই। বাড়ির কর্তাকে হিড়হিড় করে টেনে নামাবে উঠোনে। প্রথমে লাথি, চড় দিয়ে শুরু হবে মার। নাকে খত দেওয়াবে। তারপর লাঠি, বাঁশ দিয়ে ভাঙবে পা, মাথা...।"

"চুপ।" একটা হাত বাড়িয়ে কলিকে থামায় বিহান। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। কান দুটো গরম হয়ে গেছে ভীষণ।

একটু নীরব থেকে ফের কলি বলতে থাকে, "চন্দ্রিমা কতবার ওদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বলেছে, আমাদের গ্রাম দারুণ লাগবে তোর। একবার অন্তত চ। এবার ফোনে আর গ্রামে যাওয়ার কথা বলতে পারল না। বলল, কলি আমাদের বাঁচা। আমি বললাম, তুই চলে আয় আমাদের বাড়িতে। বলল, ওখানে গিয়ে কি বাঁচতে পারব? বাড়ির জন্য চিন্তাতেই মরে যাব।"

"ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়" বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বিহান।

খানিক স্বস্তির গলায় কলি বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনও না কোনও সুরাহার পথ তুমি বের করতে পারবেই।"

"পাম্প মেরো না। ঝামেলাটা বিশাল। আমার ক্ষমতাই নেই এসব সামলানোর। তবু একবার ট্রাই নেব।"

"পাম্প তোমায় মারিনি বিহান। তোমার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা দিয়ে তুমি অনেক কঠিন পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারো। ঠিক কী আছে তোমার ভিতর ধরতে পারিনি আজও।"

এসব ধোঁয়াটে কথাবার্তায় কান দিয়ে লাভ নেই। বিহান বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ায়। তার ভিতরে সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে, কলিকে পেল না কেন?

কলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমিতেশদার কাছে যাচ্ছে বিহান। দশটা বেজে গিয়েছে। পত্রিকা ছাড়াও চন্দ্রিমাদের সমস্যা নিয়ে অমিতেশদার সঙ্গে আলোচনা করবে বিহান। কোনও একটা পথ বের করতেই হবে। রাস্তায় এখন ঝলমলে রোদ, মানুষজনের হইচই, বাস-সাইকেলের হর্ন। তবু মাথার ভিতর হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসছে। ধুমুরিয়া গ্রামের চন্দ্রিমাদের ভিটেটা যেন দেখতে পাচ্ছে বিহান। ঝুপসি অন্ধকার মতো আটচালা। নিস্তব্ধ উঠোনে জোনাকির আলো। বাড়ির লোকেরা মশা মারার মতো জোনাকিগুলোকে মেরে ফেলছে। পাছে পোকাগুলোর আলো দেখে গুন্ডাবাহিনী শ্রীকান্ত মিশ্রর বাড়িটা লোকেট করে ফেলে! গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে নিরুপায় স্বপ্নের মতো লাগছে। স্বপ্নে যেমন দৌড়োলেও পৌঁছনো যায় না কোথাও, কাউকে মারতে গেলেও ফসকে যায় নিশানা। এই ঘটনাতেও সেরকমই অবস্থা হবে বিহানের। কলি জাগ্রত বিহানকে কী অবলীলায় ঠেলে দিল দুঃস্বপ্নে!

২

হ্যারিকেনের তেল ফুরিয়ে আসার মতো দিন নিভে যাচ্ছে। দালানের চেয়ারে বসে তুলসীমঞ্চের দিকে চেয়ে আছেন ব্রজলাল মিশ্র। বড় বউমা এখনও সন্ধে দেখাল না। কাল অবধি পিদিম জ্বেলেছে। তিনবার শাঁখ বাজিয়েছে আস্তে করে। কাঁসর-ঘন্টা বাজানো হয় না দিন দশেক হল। পার্টির ছেলেরা বড় ছেলে শ্রীকান্তকে হুমকি দিয়ে যাওয়ার পর থেকে। আজ বোধহয় শাঁখও বাজবে না। কিন্তু পিদিমটা তো জ্বালিয়ে যেতে পারে বড় বউমা। পিদিমের আলোর দিকে তাকিয়ে ফেলে আসা জীবনের অনেক কথা মনে আসে ব্রজলাল মিশ্রের। স্ত্রী শৈলজা যখন তুলসীমঞ্চে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পিদিম জ্বালাত, মনে হত সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুর আকাশ থেকে নেমে এসে এ বাড়ির তুলসীতলায় সন্ধে দেখাচ্ছে। কথাটা বললেই শৈলজা রেগে যেত খুব। বলত, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে তুলনা টেনো না তো। মানুষ জন্ম পেয়েছি, জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক পাপতাপ হয়েই যায়।

তবে শৈলজার রূপ বাঙালি লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো গোলগাল ছিল না। কাটাকাটা চোখমুখ, ধবধবে ফরসা, মাথায় সাধারণ মেয়েদের চেয়ে উঁচু। শৈলজার বাবা-মা, এমনকী তার মা-বাবা কাউকেই ওই ছাঁচের দেখতে নয়। তাই শৈলজার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে একটা রহস্য ব্রজলাল মিশ্রর মনে রয়েই গেছে। শৈলজার গায়ের রং পেয়েছে বড় ছেলে শ্রীকান্ত। ছোট ছেলে শ্রীবাস অতটা ধলা নয়। বড় মেয়ে চন্দ্রিমার রূপ অনেকটাই ঠাকুমার মতো। নাতনিকে একদিন সন্ধে দিতে দেখে চমকে উঠেছিলেন ব্রজলাল, শৈলজাই নেমে এল না তো?

সজ্ঞানে শৈলজা দুটো অন্যায় কাজ করেছে। দুটোই বড় ছেলের জন্য। শ্রীকান্তকে লাই দিয়েছে খুব। প্রথম সন্তান মারা গিয়েছিল বলেই হয়তো। মেয়ে হয়েছিল। দু'বছরের মাথায় টাইফয়েডে মারা যায়। লেখাপড়ায় শ্রীকান্তর মাথা ভাল বলে, জমি বিক্রি করে কলেজে পড়িয়েছে। তখন কতটুকুই বা জমি ব্রজলালের! রুজিরোজগার বলতে যজমানি, উৎসব অনুষ্ঠানে লোকের বাড়িতে রান্না করা। অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে কিছু ধানীজমি কিনেছিলেন ব্রজলাল। অর্ধেকটা গেল শ্রীকান্তর উচ্চশিক্ষার জন্য। কলেজ থেকে কী শিখে এল সে? আমাদের দেশনেতারা সব ফালতু। জার্মানি, রাশিয়া, চিনের নেতারা নাকি বিরাট জ্ঞানীগুণী। গ্রামের লোকেরা বোকা সরল, কলেজে পড়া ছেলে যা বোঝাবে, তাই বুঝবে। শ্রীকান্তের পিছনে জড়ো হয়ে গেল প্রচুর লোক। ছেলেটা ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করল। উপবীত খুলে ফেলল গা থেকে। শৈলজা মৃদু প্রতিবাদটুকু করল না। পুজোআচ্চার দায় চাপাল ছোট ছেলের উপর। শ্রীবাস কলেজে যেতে পারেনি। পড়ালেখায় ভাল ছিল না। গ্রামের মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্ব ততদিনে পেয়ে গিয়েছেন ব্রজলাল। শৈলজা শ্রীবাসকে মন্দিরের কাজে লাগাল। সে কিন্তু দাদাকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিল, শৈলজা যেতে দেয়নি। তখন সংসার চলত মন্দিরের দান থেকে। মন্দিরের চালের ভাত খেয়ে শ্রীকান্ত মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলত, ভগবান বলে কিছু নেই। মানুষই আসল। বক্তৃতাটা বেশ ভালই দিত। কাতারে-কাতারে লোক জমত ওর সভায়। বাড়িতেও লোকের আনাগোনা লেগেই থাকত। কিন্তু ভগবানের অন্ন খেয়ে ভগবান নেই বলার ফাঁকিটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না ব্রজলাল। শৈলজাকে বলতেন, "এই যে, তোমার আদরের ছেলে বলে ভগবান মিথ্যে। ভগবান নেই। তুমি কি তেমনটাই মনে করো?"

শৈলজা বলত, "ভগবান আছেন। মানুষের মধ্যেই আছেন। কারও মধ্যে বেশি, কারও কম।"

কথাটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকত ব্রজলালের, অনেক মনীষীই বলে গেছেন মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন। শৈলজার মতো কমবেশির কথা কেউ বলেননি। নিজের ভিতর ভগবানের কোনও অস্তিত্ব আজ অবধি টের পাননি ব্রজলাল। বোধহয় একেবারেই নেই। শৈলজার মধ্যেও যে খুব বেশি ছিল, তা নয়। বিষয়বুদ্ধি ছিল প্রখর। দ্বিতীয় অন্যায় কাজটা করেছিল শ্রীকান্তর বিয়ের ক্ষেত্রে। সুপুরুষ ছেলের বউ বাছল শ্যামলা, সাধারণ দেখতে মেয়ে। বিনিময়ে পণ নিল প্রচুর। সেই সোনাদানায় সংসারের ভিত পোক্ত হয়ে গেল। মায়ের ফিকির ভাল মতোই টের পেয়েছিল শ্রীকান্ত। বুদ্ধি তার কিছু কম নয়। মায়ের ইচ্ছায় সায় দিয়ে পায়ের তলার মাটিটা শক্ত করে নিল। বড় ছেলের ভিতরেও খুব বেশি ভগবান নেই। ভগবান ভগবান ভাবটা ছিল খুব, তাই তো ওকে ঘিরে থাকত এত মানুষ। আর একজনের হাবেভাবেও ভগবান ব্যাপারটা প্রকাশ পেত ভীষণ রকম। ভগবানে বিশ্বাস তাঁরও নেই। তিনি বড় ছেলের শিক্ষাগুরু, দলের বড় নেতা। তখন বড় ছেলের দল ক্ষমতায় আসেনি, বড় নেতা আত্মগোপন করার জন্য এ বাড়িটা বেছে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের ছেলেরা, পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল তাঁকে। সারাদিন ঘরটাতে বসে বই পড়তেন। চা, সিগারেটের নেশা ছিল ভীষণ। কিন্তু চেয়ে বিরক্ত করতেন না। পেলে সরল হাসি ফুটে উঠত মুখে। অত জ্ঞানী মানুষ অথচ অমায়িক ব্যবহার! আত্মগোপন পর্ব শেষ হওয়ার পর বেশ কয়েকবার এসেছেন এখানে। সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ জন পার্টির ছেলে। শৈলজাকে বলতেন, "বউদি, আমাদের যে আজ দু'মুঠো খেতে দিতে হবে।"

আত্মগোপন পর্ব শেষ হওয়ার পর কয়েকবার এসেছেন এখানে। শৈলজাকে বলতেন, "বউদি, আমাদের যে আজ দু'মুঠো খেতে দিতে হবে।"

ওই আবদারে কী যে খুশি হত শৈলজা! বড় ঘোমটা টেনে রান্নার তোড়জোড় শুরু করে দিত। মন্ত্রী হওয়ার পরও এ বাড়িতে এসেছেন দু'বার। আগের সেই আপনজনের মতো ব্যবহার। শৈলজাকে বলেছিলেন, "আপনি রত্নগর্ভা বউদি। দল ক্ষমতায় আসার পর পার্টির ছেলেরা সবসময় আমাকে এই চাই ওই চাই করে জ্বালিয়ে মারছে। আপনার ছেলে আজ পর্যন্ত নিজের জন্য দলের কাছে কিচ্ছু চায়নি। ওকে আমি শহরে নিয়ে যেতে চেয়েছি। দলে উপরের দিকে জায়গা হবে ওর। নিজের গ্রাম ছেড়ে যাবে না। এখানকার কাজগুলো করতে চায়।"

বড় নেতা সুনির্মল নন্দের ভিতরে অনেকটাই ভগবান আছে বলে মনে হয়েছিল ব্রজলালের। কিন্তু কোথায় কী! এই যে নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা শ্রীকান্তর উপর জরিমানা, শাস্তির বিধান দিয়েছে, হুমকি শোনার পর থেকে শ্রীকান্ত বারবার ফোন করে যাচ্ছে ওঁকে। প্রথমদিকে ফোন ধরেননি। এখন তো ফোন বাজছেই না। সুনির্মল নন্দ কিন্তু প্রকাশ্যেই আছেন। টিভিতে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। বিধানসভায় নিজের সিটে জিতেওছেন। ওঁর ভিতরের ভগবানের কোনও খোঁজ নেই। কোথায় আত্মগোপন করলেন সেই ভগবান? নাকি উনি ছিলেনই না সুনির্মল নন্দর অন্তরে? তবে মানুষটা একটা কাজের কাজ করেছেন এ বাড়ি এবং গ্রামের জন্য। নিজে বড় ডাক্তার, শ্রীকান্তকে ডাক্তারিটা শিখিয়েছিলেন যত্ন করে।

শ্রীকান্ত মেদিনীপুরের কলেজে শুধু বি.এ পাসটুকু করতে গিয়েছিল। পড়ল লাল পার্টির খপ্পরে। নেতা হয়ে উঠল কলেজের। তখনই আলাপ হয় সুনির্মল নন্দর সঙ্গে। শ্রীকান্তর মধ্যে উনি কী দেখেছিলেন, কে জানে! বলেছিলেন, তুমি আমার বাড়িতে থেকে ডাক্তারিটা শেখো। নিজের গ্রামে গিয়ে মানুষের সেবা করতে পারবে।

সেবা দিয়েই গ্রামের মানুষকে বশ করে ফেলল শ্রীকান্ত। শুধু ধুমুরিয়া নয়, আশপাশের পাঁচ-ছ'টা গ্রাম। রাতবিরেতে যে যখন ডেকেছে দৌড়ে গিয়েছে। মাথাটা ভাল বলে ডাক্তারিতেও সুনাম হল খুব তাড়াতাড়ি। শহরের মতো এখানে ফিজ় নেওয়ার চল নেই। ডাক্তারকে দিতে হবে ওষুধের দামটুকু। তাও অনেক সময় নিত না শ্রীকান্ত, যদি দেখত রুগির বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। এরকম একটা মানুষকে লোকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে না কেন? ওষুধের সঙ্গে শ্রীকান্ত নিজের দলের কথাও রুগির বাড়ির লোকের মাথায় ঢোকাত। পাঁচ গ্রামের লোক ওর কথায় উঠত বসত। এরকমটা হবে আন্দাজ করেই বোধহয় সুনির্মল নন্দ তাঁর চেলাকে ডাক্তারিটা শিখিয়েছিলেন। আজও গ্রামের মানুষের চিকিৎসাটাকে সেবা হিসেবেই দেখে শ্রীকান্ত। গরিব মানুষের থেকে ওষুধের দাম নেয় না। তাতেও শ্রীকান্তর অনেক জমিজমা হয়ে গেল। রুগি যে অনেক। সবাই তো আর গরিব নয়। বেশ কিছু জমি হয়েছে শ্রীকান্তর ইচ্ছে ছাড়াই, অভাবে পড়ে গ্রামের মানুষ প্রথমেই ছুটে আসত ওর কাছে। বলত, জমিটা আপনি নিলে উচিত দাম পাব। এই করে জমি হয়ে গেল বিস্তর। নতুন কংগ্রেসিরা এখন বলছে ওই সব জমির টাকা এসেছে শ্রীকান্ত গ্রামের প্রধান থাকাকালীন। ব্রজলাল তো চোখের সামনেই দেখেছেন জায়গা জমি কীভাবে হল। তার চেয়েও বড় কথা শ্রীকান্ত সমস্ত জমিই রেজিস্ট্রি করিয়েছে শ্রীবাস আর তার নামে। তা নিয়ে বড় বউমার কাছে অনেক কথাও শুনেছে। তবু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়েনি। যুক্তি দিয়েছে, দ্যাখো, ভাই পরিবারের মন্দির সামলাতে গিয়ে নিজের জন্য কিছুই করতে পারেনি। আমার কর্তব্য ওর জন্য কিছু জমিজমা করে দেওয়া। জমিগুলো যে দু'ভাইয়ের নামে, কাছেপিঠের লোকজন জানে। তবু মনে করে জমির মালিক শ্রীকান্ত। এরকম একজন সৎ, বিবেচক পরোপকারী মানুষকে সবাই যে কেন অবিশ্বাস করতে শুরু করল, কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না ব্রজলাল! তাহলে কি শ্রীকান্তর কাজেকম্মে কোথাও ফাঁকি ছিল? ফাঁক যে ছিল, লোকজন ওর চারপাশ থেকে সরে যাওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবচেয়ে কাছের দু'জন, প্রফুল্ল আর গৌর নতুন কংগ্রেসিদের মার খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে পড়ে আছে বিছানায়।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে দৃষ্টি আড়াল করল চন্দ্রিমা। এক হাতে ঠাকুরঘরের পিদিম, অন্য হাতে শাঁখ। এতক্ষণে সন্ধে দেখাতে যাচ্ছে। গ্রামের সকল বাড়িতেই দেখানো হয়ে গেছে সন্ধে। শাঁখ, কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ এসেছে ব্রজলালের কানে। ভাবনার মাঝে মাঝে দু'হাত কপালে ঠেকিয়েছেন। অভ্যেস। চন্দ্রিমা দালানের সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছিল, ব্রজলাল ডেকে উঠলেন, "বোনটি, একবার শুনে যা।"

"কী হল, পিছু ডাকছ কেন? দেখছ বাতি দিতে যাচ্ছি!" বিরক্তি

Scanned with CamScanner

প্রকাশ করল চন্দ্রিমা।
ব্রজলাল তড়িঘড়ি বললেন, "আচ্ছা যা। তারপর আমার কাছে একবার আসিস।"
চন্দ্রিমা তুলসী মঞ্চের কাছে গিয়ে পিদিম জ্বালাচ্ছে, শৈলজার মতোই লাগছে তাকে। পণ নিয়ে কালো বউ ঘরে নিয়ে আসার কারণে অপরাধবোধে ভুগত শৈলজা। কাউকে বুঝতে দিত না। বোঝা গেল নাতনিটা জন্মানোর পর। ফরসা নাতনি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল। সারাক্ষণ কোলের পুঁটুলি করে ঘুরত। বুকে আগলে বড় করল। শ্রীকান্ত যখন ঠিক করল মেয়েকে কলকাতার কলেজে পড়াবে, শৈলজা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। অনেক করে বোঝাল শ্রীকান্ত। বলেছিল, জগৎটা দেখতে দাও নাতনিকে। দেশের মেয়েরা কত এগিয়ে যাচ্ছে। ও কেন গাঁয়ের কোণে পড়ে থেকে অবোধ তৈরি হবে। কলকাতা থেকে পড়ে এসে মানুষ করবে গ্রামের মেয়েদের।
শ্রীকান্তর পরিকল্পনা সফল হয়েছে। কলকাতা থেকে পাস দিয়ে এসে গ্রামের স্কুলে পড়াচ্ছে চন্দ্রিমা। বাবার কম্পাউন্ডারিও করছে। কাজেকম্মে খুবই সাহসী এবং পটু। ওর দাদা সে তুলনায় বেশ ক্যাবলা। শ্রীকান্ত জানত ছেলে গ্রামের কোনও কাজে আসবে না। হোস্টেলে রেখে মেদিনীপুর কলেজে পড়িয়েছে। সেখান থেকে কলকাতার বড় কলেজে এম.এ, আরও কী কী সব যেন। তারপর এখন নিজেই পড়াচ্ছে জলপাইগুড়ি কলেজে। বাবা মার খেতে পারে, কানে গেছে তার। কোথায় বাবার পাশে এসে দাঁড়াবে, তা নয়। বদলে নিজের কাছে পালিয়ে আসতে বলছে শ্রীকান্তকে। ওর বাবা যে পালানোর মানুষ নয়, সেটুকু বুঝল না।
সন্ধে দেখানো হয়ে গিয়েছে চন্দ্রিমার। "বলো, কী বলছিলে?" দালানে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল চন্দ্রিমা। হাতের প্রদীপ মাটিতে রেখে ঠাকুরদার মাথার চাদরটা আর একটু টেনে দিল। ব্রজলাল বললেন, "হ্যাঁ রে বোন, কাঁসর কি আস্তে করেও বাজানো যাবে না?"
ঠাকুরদার ছেলেমানুষিতে হেসে ফেলে চন্দ্রিমা। বাবাকে মারার হুমকি আসার আগে পর্যন্ত ঠাকুরদাই কাঁসর বাজাত সন্ধে দেখানোর সময়, এইখানে বসেই। এক সময় দাদা, কাকার ছেলে-মেয়ে বাদল, স্বাতী, চন্দ্রিমা নিজে, কাঁসর বাজানোর জন্য কম্পিটিশন লেগে যেত ভাইবোনদের মধ্যে। পাড়ার বাচ্চারাও ইদানীং এ বাড়িতে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আসতে দেয় না তাদের গার্জেনরা। পাছে রুলিং পার্টির রোষে পড়ে। চন্দ্রিমা সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে ঠাকুরদাকে বলে, "ঠিক আছে, কাঁসর ঘন্টায় কাপড় জড়িয়ে দেব। কাল থেকে বাজিওখন"।
"তার মানে ভয় এখনও আছে বলছিস। তোর বাবা নিজেকে বাঁচানোর কোনও বন্দোবস্তই করতে পারেনি?"
"করলে তুমি জানতে পারতে না!"
"আমার সঙ্গে দিনে ক'টা কথা বলে। তোরাও তো বলিস না। বাড়িতে পড়ে আছি পোষা পশুপাখির মতো। আমার পরামর্শের কোনও প্রয়োজনই নেই তোদের।"
ঠাকুরদার কাঁধ জড়িয়ে ধরে চন্দ্রিমা বলে, "শুনি তোমার পরামর্শ, বলো।"
"তোর বাবাকে ক'টা দিনের জন্য পৈতে পরতে বল। গায়ে পৈতে থাকলে ওরা খুব একটা মারধর করতে পারবে না। বামুনের গায়ে হাত তোলার আগে চারবার ভাববে।'
"আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণকে আর পাত্তা দেয় না কেউ। পুজো আর রান্না করার সময় কাজের লোকের মতো ডাকে। শহরের দিকে তো রান্নার জন্যও ডাকে না।"
"পাত্তা না দেওয়াটা তোর বাবার পার্টি শিখিয়েছে। সুনির্মল নন্দও বামুনের ছেলে, পৈতে রাখেন না গায়ে, জাতপাত মানেন না। সকলেই নাকি সমান। তাই যদি হয়, নিজের শিষ্যের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না কেন? এখানকার খবর ওঁর কানে যায়নি, হতে পারে না। কানে গিয়েছে, কিছু করার ক্ষমতা নেই বলেই ফোন তুলছেন না। পৈতে ছাড়া বামুনের তেজ বেশিদিন থাকবে কী করে!"
ক'গাছা সাদা সুতোর উপর ঠাকুরদার এই ভরসার কথা শুনে হাসি পায় চন্দ্রিমার। হতাশার হাসি। সেটা প্রকাশ না করে বলে, "আজ উনি গ্রামের অত্যাচার নিয়ে টিভিতে বলেছেন।"
"ধুমুরিয়ার কথা বলেছেন কিছু?" উৎসাহের সঙ্গে জানতে চাইলেন ব্রজলাল।
পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে নাতনি বলল, "বলেননি। বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়ার গ্রামগুলোর কথা বললেন।"
"কেন বললেন না আমাদের গ্রামের কথা? আমাদের পাশের বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তো জিতেছেন। প্রফুল্ল, গৌর মার খেয়ে পড়ে আছে বিছানায়। থানায় ডায়রি পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। এরা তো ওঁর পার্টিরই লোক!"
চন্দ্রিমা কোনও উত্তর দেয় না। টিভিতে সুনির্মল নন্দর তোলা অভিযোগ শোনার পর থেকে ঠাকুরদার কথাগুলো তার মাথাতেও ঘুরছে। দালান থেকে প্রদীপ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। প্রদীপটা কখন যেন নিভে গিয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতে যাবে, ব্রজলাল বলে উঠলেন, "হ্যাঁ রে, তোর কলেজের বন্ধুকে যে ফোন করেছিলি, ওর বাবা কি কিছু করতে পারবে মনে হচ্ছে?"
"না। রাজনীতির লোকদের সঙ্গে ওর বাবার ওঠাবসা নেই। ওকে বলা ভুল হল আমার। কথাকলির মনটা ভীষণ নরম। আমার জন্য নিশ্চয়ই চিন্তা করছে খুব।" বলে এগিয়ে গেল চন্দ্রিমা। চৌকাঠ ডিঙিয়ে চলে গেল ভিতরের ঘরে। আবার টিভির সামনে গিয়ে বসবে। যদি কোনও আশ্বাসের খবর পাওয়া যায়। বাড়ির আলো বন্ধ রাখলেও, টিভি কিন্তু চালানো হয় ফিসফিসে আওয়াজে।
ওষুধ ঘরের দিকে ঘাড় ফেরালেন ব্রজলাল, শ্রীকান্ত ঝিম মেরে বসে রয়েছে চেয়ারে। খবরের কাগজ বা বই কিছুই পড়ছে না। আগে রুগি না থাকলে সামনে দুটোর কোনও একটা থাকতই। দুশ্চিন্তা ভরা মাথায় পড়ায় মন দিতে পারছে না ছেলেটা। শ্রীবাস এখনও বাড়ি ফিরল না কেন? নাতি দুলাল অবশ্য রাত করেই বাড়ি ফেরে। দূরে রুগি দেখতে যাওয়ার জন্য শ্রীকান্ত একটা মোটরবাইক কিনেছিল, দুলালই বুদ্ধি দিয়ে কিনিয়েছিল। বলেছিল জ্যাঠাকে গাড়িটা চালানো শিখিয়ে দেবে। শেখানোর চেষ্টা করেছিল, শ্রীকান্তই রপ্ত করতে পারল না। সাইকেল চালিয়েই রুগি দেখতে যায়, খুব দূরের রুগি হলে দুলাল বাইকে চাপিয়ে নিয়ে যায় জ্যাঠাকে। বাকি সময় বাইক নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায় এ গ্রাম সে গ্রামে। সংসারের বাজার-দোকানগুলো করে। টাউন থেকে ওষুধ এনে দেয় শ্রীকান্তকে।
পাকাপাকিভাবে কোনও রোজগারের ব্যবস্থা আজ অবধি করে উঠতে পারল না। লেখাপড়াতেও বেশি দূর এগোতে পারেনি। শ্রীকান্ত বোধহয় ওকে বার তিনেক ব্যবসা করার টাকা দিয়েছে, সব ক'টাতেই ডুবেছে দুলাল। আসলে বাপ-ছেলে দু'জনেই শ্রীকান্তর ছায়ায় থাকাটা পছন্দ করে। দু'জনের এখন প্রধান কাজ গ্রামের আনাচেকানাচে কান পাতা, শ্রীকান্তকে কবে ওরা মারতে আসবে, বাড়িতে এসে মারবে, নাকি পার্টি অফিসে ডেকে পাঠাবে, খবরগুলো জোগাড় করা। সরকারের দলের একদম নীচের দিকের লোকজন উপর তলা থেকে যা শুনছে, চুপিচুপি বলে দিচ্ছে শ্রীবাস অথবা দুলালকে। খবরের মধ্যে

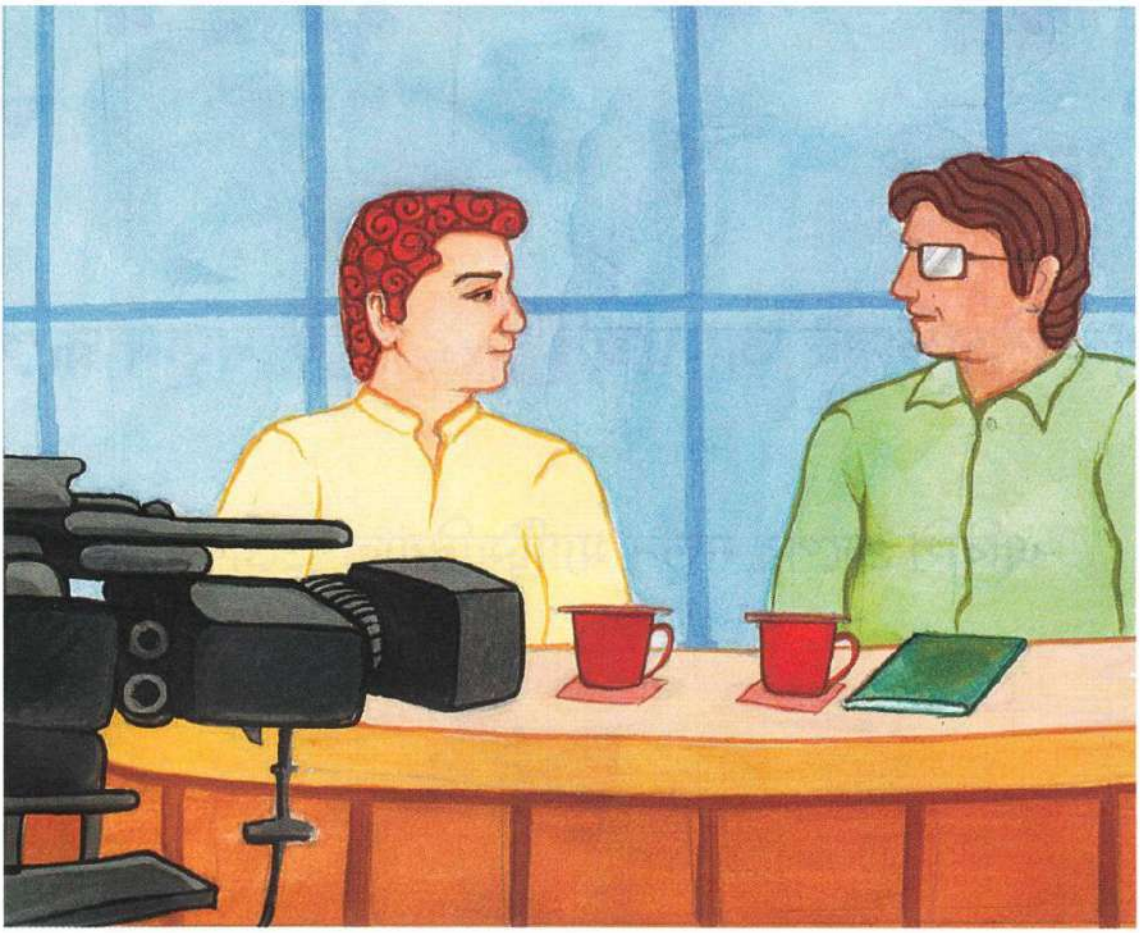

ভেজালও থাকছে কিছু, মন রাখা কথা, মিথ্যে আশ্বাস। পাকামাথা শ্রীকান্তর সেগুলো বাছাই করতে অসুবিধে হচ্ছে না। লোকগুলোর উপর যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছে শ্রীকান্ত। বলছে অকৃতজ্ঞ। শ্রীবাস, দুলালকে ওদের সঙ্গে কথা চালাতে বারণ করছে। দু'জনেই শুনছে না। শ্রীকান্তকে কোনওভাবে বাঁচানো যায় কিনা, খুঁজে চলেছে সেটাই। ব্রজলাল কিন্তু বিশ্বাস করেন গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শ্রীকান্তর উপর ধার্য করা জরিমানা মেনে নিতে পারছে না। শাসক দলের বিরুদ্ধে যাওয়ারও উপায় নেই। সরকারের সুযোগ সুবিধেগুলো থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অনেক কষ্টে নিজের নব্বই বছরের শরীরটা দালানে খাঁড়া করালেন ব্রজলাল। এখন চলেছেন ওষুধ ঘরের দিকে, শ্রীকান্তকে বড় একা, অসহায় লাগছে। শ্রীবাসটা এখনও ফিরল না। অন্ধকার যত বাড়ে ভয় যেন আরও চেপে বসে ভিটেতে। ওষুধ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন ব্রজলাল। শ্রীকান্ত একটু চমকে উঠলেন। প্রথমটায় বাবাকে চিনতে পারেননি। ভেবেছিলেন বাইরের কেউ। বাবাকে বললেন, "কী হল, কিছু বলবে? শরীর খারাপ লাগছে?"

মাথা এপাশ ওপাশ করে ব্রজলাল বললেন, "শ্রীবাস গেল কোথায়? কাজে পাঠিয়েছিস নাকি?"

"না তো। আমিও তো ভাবছি, কেন ফিরছে না এখনও?"

"ফোন করেছিলিস?"

"করেছি দু'বার। বেজে যাচ্ছে, ধরছে না।"

"দুলালকে একটা ফোন কর।"

"করে কী হবে, দু'জনে তো এক জায়গায় থাকে না। দুলাল হয়তো কোনও ক্লাবঘরে আড্ডা মারছে।"

'ডেকে নে। সন্ধে উতরে গেল। বাপ-ছেলের কেউ তো একটা বাড়ি থাকবে।'

শ্রীকান্ত কোনও উত্তর করলেন না। বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বৃদ্ধ পিতার উৎকণ্ঠার কারণ যে তিনি নিজে।

দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকালেন ব্রজলাল। শরীরটা ছেড়ে দিলেন। ষাট বছরের সন্তানের প্রহরায় উপবিষ্ট হলেন নব্বই পার করা পিতা। সামান্য বলশক্তি অবশিষ্ট নেই শরীরে। গুন্ডাবাহিনী শ্রীকান্তকে মারতে এলে কিছুই করতে পারবেন না। মনটাও কেমন যেন আলগা পড়ে গিয়েছে। কোনও ঘটনাতেই আজকাল তেমন উত্তেজিত হতে পারেন না। শোকতাপও বুক খামচে ধরে না সে ভাবে। তার তো এমন সন্দেহও হতে শুরু করেছে, শ্রীকান্তকে ওরা যদি এই উঠোনেই পেটায়, হাড়গোড় ভেঙে দেয়, যতটা কষ্ট পাওয়া উচিত ব্রজলালের, পাবেন না। চোখ দিয়ে জল হয়তো পড়বে অভ্যেস বশে। বড় অপমানের এই বাঁচা!

ব্রজলালের এতদিনে মনে হচ্ছে তাম্র পদকটা নিয়ে এলেই ভাল করতেন। বিয়ের পর শৈলজা বারবার বলত, "যাও না, সদরে গিয়ে একবার খোঁজ নাও না। তোমার পদক, সার্টিফিকেট হয়তো এখনও পড়ে আছে।"

ব্রজলাল বলতেন, "ধুর এত দিন ধরে ওসব থাকে! বিডিও, এসডিও সব বদলি হয়ে গিয়েছে।"

ওটা আসলে অজুহাত। ব্রজলালের কোনও ইচ্ছেই ছিল না পদক, সার্টিফিকেট নেওয়ার। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশনও পাওয়া যেত। সে টাকা নিতে লজ্জা পেয়েছেন। তখন বোধহয় ওঁর বয়স চোদ্দো-পনেরো, পরশরপুর থানায় আগুন দেওয়া হল। বড়দের পিছন-পিছন ব্রজলালও ছুটেছিলেন। একটা মশালও ছুঁড়েছিলেন থানার বাড়িতে। তাতেই কি স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়া যায়! অথচ রাধাবিনোদ, যার দশ-ও হয়নি, উপস্থিত ছিল আগুন লাগানোর সময়। বীরেশবাবু ওকে একটা

Scanned with CamScanner

চড় কষিয়ে বলেছিলেন, তুই এখানে কী করছিস! বাচ্চা ছেলে, বাড়ি যা। চোখের সামনে ঘটনাটা দেখেছিলেন ব্রজলাল। সেই রাধাবিনোদ শেষ বয়স অবধি স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন পেয়েছে। বাড়িতে সার্টিফিকেট, পদক ছিল বলে অনেক সভা সমিতিতে ডাক পেত। শৈলজার কথা শুনে পদক নিয়ে এলে কংগ্রেসি পরিচয়টা জোরদার হত ব্রজলালের। নতুন কংগ্রেসের ছেলেদের বলতে পারতেন, আমি কংগ্রেস করতাম। দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমরা। তোমরা তো কংগ্রেস থেকেই জন্ম নিয়েছ। আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও।

মনে হয় না নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা এসব কথা শুনবে। স্বাধীনতার ইতিহাস লোকে ভুলে গেছে। পনেরোই অগস্ট যা একটু স্কুলগুলোয় পতাকা তোলা হয়। ক্লাবগুলোয় পিকনিক আর মদ খাওয়া। তাম্র পদকের এখন আর কোনও মূল্য নেই। গুড়গুড় করে একটা আওয়াজ এগিয়ে আসছে না? মনে হচ্ছে দুলাল ফিরছে বাড়ি। বাড়ির মোটরবাইকের আওয়াজটা তিনি চেনেন।

দুলালের পিছনে শ্রীবাস। বাপ-ছেলে একসঙ্গে ফিরল। কোথা থেকে?

ওষুধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে শ্রীকান্ত। ওর-ও নিশ্চয়ই মনে একই প্রশ্ন। বাইক থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে দালানে উঠে এল শ্রীবাস। দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, "নবকুমার জানার ভিটে জমিতে কঙ্কাল পাওয়া গেছে। দুটো কঙ্কাল। পুলিশে, মানুষে ছয়লাপ ওদের বাড়ি।"

শ্রীকান্ত জানতে চাইলেন, "কোন নবকুমার? গোপীমোহনপুরের?"

"হ্যাঁ, আমাদের পার্টির লোক।" বলল শ্রীবাস।

বাইক দাঁড় করিয়ে দুলাল এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "সরকারের দল বলছে কঙ্কাল দুটো চণ্ডীগ্রামের।"

অবিশ্বাসের গলায় শ্রীকান্ত বললেন, "তা কী করে হয়! চণ্ডীগ্রাম থেকে মাঠ ধরে হাঁটলেও গোপীমোহনপুর প্রায় তিরিশ কিলোমিটার!"

ব্রজলালও ভীষণ অবাক হয়েছেন, চণ্ডীগ্রামে বাম আমলের শেষের দিকে গুলি চালিয়ে ছিল পুলিশ, পার্টির গুন্ডারা। প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছে। লুকিয়ে তাদের কবর দিতে তিরিশ কিলোমিটার হাঁটবে কেন পার্টির ছেলেরা। কাছাকাছি কোথাও পুঁতে দেবে। তা হলে কি কঙ্কালরা নিজেরাই কবর ফুঁড়ে উঠে হাঁটতে শুরু করে দিল? গ্রামের অন্ধকারে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে কঙ্কালরা! চোখের সামনে দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছেন ব্রজলাল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তাঁর।

৩

কুকুর এত বড় হয়, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না বিহানের। কথাকলি তাকে অনেক ধরনের বিপদের মধ্যে ফেলেছে, আজ প্রায় বাঘের মুখে পড়তে হল। গায়িকা রূপাঞ্জনা সেনের কুকুর। বিহান এখন রূপাঞ্জনার গড়পার রোডের বাড়িতে। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি, ওয়েল মেনটেনড। রূপাঞ্জনা বিহানকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে গানের ক্লাস নিচ্ছেন ভিতরের কোনও ঘরে। ভেসে আসছে কোরাসে রবীন্দ্রনাথের গান। রূপাঞ্জনা অবশ্য রবীন্দ্রগান, আধুনিক দুটোই গেয়ে থাকেন। বেলের আওয়াজের উত্তরে ভিতরে ডেকে উঠেছিল ভারী গলার কুকুর। তখনও বোঝা যায়নি সাইজ এমনটা হবে। তাতেও মনটা দমে গিয়েছিল বিহানের। কুকুরওলা বাড়িতে সে স্বস্তি বোধ করে না। কুকুরে তার বড্ড ভয়। গাল তোবড়ানো, পুরনো ঢোলা জামা-প্যান্ট পরা এক মাঝবয়সি সদর খুলেছিল। বোঝাই যায় কাজের লোক। পাশে কালো মুশকো কুকুরটাকে দেখে বুক ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল বিহানের। কাজের লোকটি বিহানের নাম জেনে খবর দিতে গেল মালকিনকে। কুকুরটা বিহানকে শুঁকতে লাগল। ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিহান। সিচুয়েশনটা লম্বা হয়নি। রূপাঞ্জনা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কুকুরটা সরে গিয়েছিল। ঘরোয়া সাজে রূপাঞ্জনাকে ভারী স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। বাইরে পরেন জমকালো শাড়ি, জাঙ্ক জুয়েলারি আর কপালে বড় টিপ। সিঁথিতে চিলতে সিঁদুর। মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গেলে বারবার টিপের দিকে চোখ চলে যায়। বিহানের লেখা দুটো গানের একটি উনি গেয়েছেন। সেই সুবাদে যে ক'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সব বাইরেই। আজ বিহানকে অন টাইম চলে আসতে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "মুখার্জি তো বাঙালি পদবী। তুমি সত্যিই বাঙালি তো?"

"আমি ভেবেছিলাম চারটে বলেছি, পাঁচটার আগে আসবে না। পাঁচটায় আমার গানের ক্লাস শেষ হবে। দেখছি। আজ তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। প্লিজ, ততক্ষণ একটু ওয়েট করো। এই ঘরেই বসো। বই, ম্যাগাজিন আছে, ওলটাতে পারো।" বলার পর রূপাঞ্জনা যখন দেখলেন বিহান নিজের জায়গা থেকে নড়ছে না, কুকুরভীতিটা বুঝে ফেললেন। বলেছিলেন, "কোনও ভয় নেই। কিচ্ছু করবে না। খুবই নিরীহ টাইপের। চেহারাটাই যা একটু বড়।"

সব কুকুরের মালিকই নিজের পোষ্যকে নিরীহ বলে। যদি নিরীহই হবে, তা হলে চোর-ডাকাত তাড়ানোর জন্য তাকে পোষে কেন? মালিকদের আশ্বাসে কোনও দিনই ভরসা পায় না বিহান। তবে এই কুকুরটা এখনও অবধি তেমন কিছু করেনি, সদর মুখো হয়ে জিভ বের করে বসে আছে। শ্বাস নেওয়ার কারণে শরীরটা কাঁপছে একটু। একবারই শুধু ঘাড় ফিরিয়ে ঘ্রাউ করে উঠেছিল, বিহান যখন সেন্টার টেবিল থেকে ম্যাগাজিন নিতে যাচ্ছিল। নেওয়া হয়নি। বিশাল সোফার এক কোণে ঠায় বসে আছে বিহান। কাজের লোক চা-বিস্কুট দিয়ে গিয়েছে। খাওয়ার সময় আপত্তি জানায়নি কুকুরটা। ওর জন্য একটা বিস্কুট রেখে দিয়েছে বিহান। যদি কোনও কারণে এগিয়ে আসে, বিস্কুটটা দিয়ে সমঝোতার চেষ্টা করবে। কুকুরটার একটা ছবি তুলতে ইচ্ছে করছে, কথাকলিকে গিয়ে দেখাতে পারবে। বলবে, দ্যাখো, তোমার জন্য আমি কত বড় রিস্ক নিয়েছিলাম। বিহানের মোবাইল কম দামি, ছবি ভাল ওঠে না। তা ছাড়া ছবি তুলতে গেলে কুকুরটার মেজাজ যদি বিগড়ে যায়! ইচ্ছেটা দমন করে বসে আছে বিহান। মিনিট পনেরোও হয়নি এ বাড়িতে এসেছে, সময় যেন কাটতেই চাইছে না! বেশ কিছু দিন ধরেই বিহানের মনে হচ্ছে তার জীবনে কথাকলির সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব খারাপ ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট। বিহান কলিকে প্রথম দেখেছিল ন'বছর আগে, কলিদের এখানকার বাড়ির ভিতে ওর বাবার সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। পরনে নীল-সাদা জংলা ছাপ লংস্কার্ট, কাঁধ অবধি ঝাঁকড়া চুল, ভীষণ ফরসা, ছিপছিপে গড়ন, যেন ইউরোপের পেন্টিং থেকে নেমে আসা কোনও কিশোরী। পাড়ার মাঠে তখন ক্রিকেট খেলছিল বিহান। টেনিস বলের ক্রিকেট। ফিল্ডিং করছিল। সব ভুলে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। কলিকে দেখে বিহান মনে-মনে চেয়েছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটা যেন তাদের পাড়ায় চলে আসে। ঠিক এক বছরের মাথায় কলিদের বাড়িটা কমপ্লিট হয়ে গেল। ঝাঁ-চকচকে বাড়ি। ওরকম বাড়ি পাড়ায় প্রথম। কলির উপর পাড়ার ছেলেদের চোখ পড়লেও, প্রেম নিবেদনের ভাবনাটা মাথায় আনল না। অত বড়লোকের ওরকম সুন্দরী

মেয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত পাড়ার ছেলেদের পাত্তা দেবে কেন? বিহানও প্রেম নিবেদনের কথা ভাবেনি, কিন্তু কলির আকর্ষণটা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায়নি। কলি মাধ্যমিক পাশ করে এ পাড়ায় এসেছিল। ইলেভেনে ভর্তি হয়েছিল এখানকার স্কুলে। কলির ছুটির সময় সাইকেল নিয়ে স্কুলের কাছে পৌঁছে যেত বিহান। ফেরার সময়ও ফলো করত। হাওড়ার রাস্তাগুলো সরু হওয়ার কারণে কলির গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলে বিহান সাইকেল চালিয়ে চলে যেত সামনে। আসলে নজর কাড়ার চেষ্টা আর কী। সাইক্লিংটা করত একটু জাগলিং মিশিয়ে, যাতে স্মার্ট দেখায়। একটা ব্যাপারে বিহান কনফিডেন্ট ছিল। তার ক্রিয়াকলাপে কলি যদি কোনও অভিযোগ তোলে, জানিয়ে দেয় নিজের বাবা অথবা পাড়ার বড়দের, বিহান সহজেই নালিশ নস্যাৎ করে দিতে পারবে। কারণ সাইকেলের সঙ্গে কোনও দিন চারচাকার প্রেম হতে পারে না।

এই ভাবে মাস দুয়েক কাটল। তখনও কলির গাড়ি চালাত কার্তিকদা। কার্তিকদা বিহানের দিকে বিরক্তির চোখে তাকাত। এদিকে ক্লাবে বেশ ক'টা মিটিংয়ের পর সিদ্ধান্ত হল রুদ্রবাবুকে বলা হবে পাড়ার মাঠটা রেলিং দিয়ে ঘিরে দিতে। অত টাকা দিয়ে বাড়ি করলেন, ক্লাবের মাঠটার জন্য কিছু করবেন না? আসলে তোলা আদায়, তবে পুরোটাই পাড়ার স্বার্থে। রেলিং দিয়ে ঘিরে দিলে মাঠটা সুন্দর লাগবে। বল সহজে বাইরে যাবে না। রাস্তা দিয়ে চলা বয়স্ক এবং শিশুদের গায়ে হামেশাই বল লাগে। রুদ্রবাবু রেলিং ঘেরার টাকা দিলে ক্লাবের ফান্ড থেকে দড়ির জাল কেনা যাবে। টাঙিয়ে দেওয়া হবে খেলা চলাকালীন। ক্লাবের তিনটে ব্যাচ। প্রত্যেক ব্যাচ থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় দু'জনকে নেওয়া হবে রুদ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার জন্য। ছোটদের ব্যাচের দু'জনের একজন হল বিহান। এড়িয়ে যেতেই পারত, কলিকে যদি সামনাসামনি দেখা যায়, এই আশাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। মিটিংয়ে ঠিক হল টাকাটা প্রথমে ভদ্রভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে চাওয়া হবে। তাতে যদি কাজ না হয়, সুর চড়াতে হবে। দেখাতে হবে রুস্তমি।

কলির উপর ছেলেদের চোখ পড়লেও, প্রেম নিবেদনের ভাবনাটা আনল না। বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে পাড়ার ছেলেদের পাত্তা দেবে কেন?

ভদ্রভাবে অ্যাপ্রোচ করে কাজ হল না। কথা হচ্ছিল কলিদের ড্রয়িং হলে দাঁড়িয়ে। রুদ্রনারায়ণ রায় পাড়ার ছেলেদের বসতে পর্যন্ত বলেননি। সবক'টা ছেলে যে ভদ্র নয়, তা তিনি জানতেন। বড়দের গ্রুপের লোটনদা এক কারখানার মালিককে বেদম পিটিয়ে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার কেসে দু'বছর জেলের ভাত খেয়েছে। বলে উঠেছিল, "দেখুন, পাড়ায় বউ-মেয়ে নিয়ে বাস করতে এসেছেন, এত সুন্দর বাড়ি, জানলায় কাচের পাল্লা। মাঠের বল যদি বারবার আপনাদের জানলায় এসে আছড়ে পড়ে, বাচ্চাদের বারণ করতে পারব না। খেলতে-খেলতে এমন হয়েই থাকে। রেলিং থাকলে, সেটা আটকানো যেত। ক্লাব থেকে নেট লাগিয়ে নিতাম। তারপর ধরুন আপনার মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি দেবে, সিরিয়াস ব্যাপার। পাড়ার পুজোর সাউন্ড বক্স যদি বাচ্চারা আপনার বাড়ির দিকে করে রাখে, মেয়ের লেখাপড়ার ক্ষতি। পাড়ার ছেলেদের বারণ করতেও পারব না, আপনি তাদের মনে কোনও রেসপেক্ট তৈরি করতে পারেননি...।"

কথার মাঝেই বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কলি। গ্রেটনিং-এর সুর কানে গিয়েছিল তার। ভয়ে-বিস্ময়ে পাড়ার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে যেই না বিহানের উপর চোখ পড়েছিল কলির, বলে উঠেছিল, "এ কী, আপনি এঁদের সঙ্গে কেন! আপনাকে তো এরকম ভাবিনি।"

পুরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল বিহান। নিঃশব্দে কেটে পড়েছিল কলিদের বাড়ি থেকে।

ক্লাবমুখো হয়নি ক'দিন। বাড়িতে এসে ধ্যাতানি দিয়ে গেল বড়রা। আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলেছিল, "মেয়েটাকে যখন লাইন মারিস, উইকনেস আছে, তুই আমাদের সঙ্গে গেলি কেন রে গাধা!"

ফলো করা ছেড়ে দিল কলিকে।

বিহান এখন শুধু কলেজ আর বাড়ি। কলিকে ফলো করতে গিয়ে কলেজ কামাই হয়েছে অনেক। ভয়ে নয়, বিবেচনাবোধ থেকে রুদ্রকাকু কিছু দিনের মধ্যে মাঠটা ঘেরার টাকা দিয়ে দিলেন। রেলিং দেওয়া হল। যেন গয়না পরানো হল পাড়াকে। শ্রী ফিরল ধূসর পাড়াটার। কলিদের ঝকঝকে বাড়িটাকে বেমানান মনে হত না।

দেখতে দেখতে সরস্বতী পুজো এসে পড়ল। মাঠে ক্লাবের পুজো হচ্ছে। সাউন্ড বক্সের মুখ কলিদের বাড়ির উল্টো দিকে, তখন অবশ্য গান বাজছিল না। পুষ্পাঞ্জলি চলছিল মণ্ডপে। খানিক দূরে বিহান ডেকরেটরের প্লাস্টিক চেয়ারে বসেছিল। আশপাশে কেউ ছিল না। ঘিয়ে রঙের লাল-পাড় শাড়ি পরা কলি বেরলো ওদের সদর দিয়ে। হাতে ট্রান্সপারেন্ট ছোট্ট ক্যারিব্যাগ, তাতে ফুল। কী অসামান্য সুন্দরী লাগছিল কলিকে। শাড়িতে ওকে প্রথমবার দেখছে বিহান। অপার্থিব এক আভা যেন ঘিরে রয়েছে কলিকে। বিহানের বিহ্বলতা কাটল যখন দেখল কলি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কী জানি, কী আছে কপালে... ভাবতে না ভাবতেই সামনে এসে পড়ল কলি। জিজ্ঞেস করেছিল, "পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে?"

বিহান তো বিস্ময়ে হাঁ। মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের হয়েছিল ঠিকই, সেটা হ্যাঁ কি না, নিজেই বুঝতে পারেনি। কলি নিজের সুবিধে মতো মানে করে নিয়ে বলেছিল, "চলুন, একসঙ্গে দেব।"

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিল, কলি নিজের ক্যারিব্যাগ থেকে ফুল তুলে দিয়েছিল হাতে। তার আগের চার বছর পুষ্পাঞ্জলি দেয়নি বিহান। ব্যাপারটা ছেলেমানুষি মনে হত। সেদিন পুষ্পাঞ্জলির পর কলি বলেছিল, "চলুন, আমাদের বাড়ি গিয়ে উপোস ভাঙবেন।"

বাড়ি ঢুকে কলি হাঁক পাড়ল, "মা, আমরা একসঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। একসঙ্গেই উপোস ভাঙব। খেতে দাও।"

কাকিমা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বিহানকে দেখলেন। অবাক হলেন, খুব বেশি নয়। হেসে বললেন, "খুব ভাল কথা। বসো, খাবার আনছি।"

কলি একেবারে ডাইনিংরুমে নিয়ে গিয়েছিল বিহানকে। হয়তো আন্তরিকতা বোঝাতে। বহিরাগত অতিথির মতো ড্রয়িংরুম থেকে বিদায় করতে চায়নি। খাবার আসার পর রুদ্রকাকু একবার এলেন ডাইনিংরুমে। কলি বলেছিল, "বাবা, একে মনে আছে? বিহান। আমাদের বাড়িতে মস্তানি করতে

Scanned with CamScanner

এসেছিল।''

রুদ্রকাকুও বিহানকে দেখে অবাক হননি। অপাঙ্গে চেয়ে ছোট্ট করে হেসে সরে গিয়েছিলেন। বিহান খেয়াল করেছিল 'আপনি' সম্বোধনটা বাড়ির বাইরে ফেলে এসেছে কলি। সেদিনের পর থেকে 'তুমি'। কাকিমা খাবার নিয়ে এসেছিলেন। ইংলিশ নয়, সরস্বতী পুজোর সকালের মেনু ছিল সাদা ফুলকো লুচি, কড়াইশুঁটি দেওয়া আলুর দম। নতুন আলু। খেজুর গুড়ের পায়েস। আর বোধহয় সন্দেশ-রসগোল্লাও ছিল। কাকিমার সঙ্গে গল্পগাছা হল অনেক। ওঁরা আগে সালকিয়াতে থাকতেন। তথ্যটা অবশ্য আগে থেকেই জানত বিহান। নতুন যেটা জানা গিয়েছিল, সালকিয়াতে রুদ্রকাকুর পৈতৃক বাড়ি। একান্নবর্তী

ইংলিশ নয়, সরস্বতী পুজোর সকালের মেনু ছিল সাদা ফুলকো লুচি, কড়াইশুঁটি দেওয়া আলুর দম। নতুন আলু। খেজুর গুড়ের পায়েস। সন্দেশ-রসগোল্লাও ছিল।

সংসার। লোক বাড়ছিল, স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সকলেরই অসুবিধে। রুদ্রকাকুর আর্থিক অবস্থা ভাল বলে বাড়ি করে চলে আসেন এখানে। বিহানের বাড়ির খবর নিলেন কাকিমা, ক'ভাইবোন, কে কী করে? বিহান কী পড়ছে? নিচু গলায় তথ্যগুলো দিচ্ছিল বিহান, বড়মুখ করে বলার তো কিছু নেই। বাবার লিলুয়া কারশেডের চাকরি। প্রাইভেট কোম্পানিতে দাদা। দিদির তখনও বিয়ে হয়নি। গ্র্যাজুয়েশন করে কম্পিউটার শিখছে। বিহান বাংলা অনার্স ফার্স্ট ইয়ার। বাড়িটা নিজেদের। রান্নাঘর, বাথরুম যে টালির ছাদের, সেটা বলেনি। এখন অবশ্য সবটাই সিমেন্টের হয়ে গেছে। আর বলেনি পত্রিকা বের করে, কবিতা লেখে। ঘটে বুদ্ধি থাকা কোনও নবীন কবি, আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কবি পরিচয়টাকে অস্ত্র করে না। কবিতা লেখার জন্য নবীন কবিকে আজও আওয়াজ খেতে হয়, তখনও হত।

সেদিন কলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর বিহান নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এই ভেবে, যাক প্রেম না হোক, বন্ধুত্ব তো হল। রিলেশন হওয়ার চান্সটাই চলে গিয়েছিল পুরোপুরি। বন্ধুত্বের হাত ধরে প্রেমটাও ফিরে আসতে পারে। ধৈর্য ধরতে হবে।

চারদিনের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ফোন করেছিল বাড়ির ফোনে। নাম্বার নিয়েছিল সেদিন খাবার টেবিলেই। তখন বিহানের মোবাইল ফোন ছিল না। মা কলির ফোনটা ধরেছিল প্রথমে। বিহানকে ডেকে দিতে এসে বলেছিল, ''মেয়েটা কে রে? আমার সঙ্গে অনেক কথা বলল। নাম বলল কথাকলি। একদিন বাড়িতেও আসবে বলছে। তোর সঙ্গে কতদিনের আলাপ? থাকে কোথায়? কলেজের বন্ধু?''

''পাড়াতেই থাকে।'' বলে ফোন ধরতে গিয়েছিল বিহান। কলি ফোনে বলল, ''কাল বিকেলে কি ফ্রি আছ?''

বিহান বলেছিল, ''সেরকম জরুরি কোনও কাজ নেই। কেন বলো তো?''

''তোমাদের বোটানিকাল গার্ডেনে নিয়ে যাবে?'' আবদারের সুরে বলেছিল কলি।

খানিক মজা আর বিস্ময়ের সঙ্গে বিহান জানতে চেয়েছিল, ''বি গার্ডেন হঠাৎ আমাদের হতে যাবে কেন? ওটা সবার। সর্বসাধারণের জন্য।''

''বাঃ রে, তুমি সেই ছোট থেকে বি.গার্ডেনের কাছে আছ। আমি পাড়ায় এলাম সেদিন। হিসেব মতো বি গার্ডেন তোমাদেরই। বাবাকে কত দিন বলেছি জায়গাটা দেখাতে নিয়ে যেতে, সময় বের করতে পারেনি। বিহান অভিসন্ধি খুঁজছিল। ফোনে জানতে চেয়েছিল, ''আমি কি বি.গার্ডেনের গেটের কাছে পৌঁছে যাব? ক'টার সময় বলো?''

''ও মা, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে যাবে কেন! বাড়ি থেকে একসঙ্গেই বেরোব আমরা। গাড়ি নিয়ে যাব। না নিলেও হয় গাড়ি। তুমি তো আছ সঙ্গে, রিকশা বা বাসেও যেতে পারি। বিকেল চারটে নাগাদ চলে এসো আমাদের বাড়িতে।''

কথাগুলো থেকে বিহান বুঝতে পেরেছিল গাড়িটা আরাম কিংবা বড়লোকি দেখানোর জন্য নয়, কলির পাহারার ব্যবস্থা। পরের দিন সঠিক সময় কলিদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল বিহান। গাড়ি নেয়নি। রিকশা করে বি.গার্ডেনে গিয়েছিল দু'জনে। অনেকটাই রাস্তা, কলিই চেয়েছিল রিকশায় যেতে। চারপাশ দেখতে-দেখতে যাবে। কোনও লুকোছাপার বালাই নেই দেখে বিহান বুঝেই গিয়েছিল সম্পর্কটা আপাতত প্রেমের দিকে গড়াবে না। তবু মনের গভীরে ক্ষীণ একটা আশা জেগেছিল, কলিরা বড়লোক। ওদের স্ট্যাটাসে প্রেমট্রেমগুলো গার্জেনদের জানিয়েই হয়, মধ্যবিত্তদের মতো প্রেমিক জীবনে না দাঁড়ানো অবধি গোপন করতে হয় না।

রিকশার পথটুকু কাঠ হয়ে বসেছিল বিহান। বেশি ছোঁয়াছুঁয়ি হলে কলি অসভ্য ভাবতে পারে। কলি ছিল একেবারেই ফ্রি। বি গার্ডেনে গিয়ে ঘোরাঘুরি হল অনেকক্ষণ। প্রকৃতির ঘন আবরণে খুবই খুশিখুশি দেখাচ্ছিল কলিকে। গাছতলায় বসা হল। বাদামওলা এল। একগাদা কিনে দু'জনের মাঝখানে রাখল কলি। বাদাম ভাঙতে-ভাঙতে সম্পর্কের অবস্থানটা নির্দিষ্ট করে দিল। বলেছিল, ''দ্যাখো বিহান, তুমি আমাকে পছন্দ করো, অনেকদিন থেকেই টের পেয়েছি। আমারও তোমাকে ভীষণ ভাল লাগে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করা তোমার স্বভাব নয়। তার মানে আমাকে জেনুইনলি ভাল লাগে তোমার। তুমি প্রেমে পড়ে গিয়েছ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমি এনগেজড। একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছি। কোনও কারণ ছাড়া তার থেকে দূরে চলে যেতে পারি না।''

Scanned with CamScanner

বিহানের মনে হয়েছিল তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এই গল্প ফাঁদছে কলি। ভদ্র মেয়েরা এভাবেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করে থাকে। সন্দেহটা প্রকাশ হতে না দিয়ে ক্যাজুয়ালি জানতে চেয়েছিল, এতদিন ধরে তোমার গতিবিধির উপর নজর রেখে চলেছি, তার উপস্থিতি তো চোখে পড়েনি।

"নির্মাল্য দিল্লিতে চাকরি করে। সদ্য পেয়েছে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়র। ওখানে ছ'বছর কাটানোর পর কলকাতায় পোস্টিং পাবে। ছুটিতে ক'দিন আগে এসেছিল, এখানকার বাড়িতে ঘুরে গিয়েছে। আমাদের আগের পাড়ার ছেলে নির্মাল্য..." আরও নানান বৃত্তান্ত দিয়ে যাচ্ছিল কলি। কিছুই কানে ঢুকছিল না বিহানের। বি গার্ডেনের গাছপালা চুঁইয়ে তখন সন্ধে নামছে। আস্তানায় ফিরে আসতে শুরু করেছে পাখিরা। তাদের প্রবল হইচই। যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে কলির কথার বিরুদ্ধে।

ফেরার সময় রিকশায় বসে কলি বলেছিল, 'সম্পর্কটা প্রেমের না হোক বন্ধুত্বের তো হতেই পারে। তুমি মানুষটা খুব ভাল বিহান। সত্যিই তোমাকে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমাদের প্রেম না হওয়াটা অঘটন বলে ধরে নাও। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা হারাতে চাই না।'

যাকে প্রেমিকা ভাবা হয়, সে যদি বন্ধুত্বের ললিপপ ধরিয়ে দেয় হাতে, তার চেয়ে বড় অপমান আর কিছুতে হয় না। বিহান সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলির সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখবে না। বন্ধুত্বের ছলনায় পছন্দের মেয়েটির সঙ্গ পাওয়াটাও বড় অসম্মানের। আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু কলি যে ছাড়ার পাত্রী নয়। বাড়িতে ফোন এলে বিহান তুলত না, সবাইকে বলে রেখেছিল, কথাকলি ফোন করলে বলবে বাড়ি নেই আমি।

বেশ ক'বার ফোন করে, বিহানের নাগাল না পেয়ে বাড়িতেই চলে এসেছিল কলি। ফোন না ধরার জন্য এতটুকু না রেগে বলেছিল, "এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। এতেই প্রমাণ হয় তুমি আমাকে কতটা ভালবাস। যাইহোক, যে কারণে ফোন করা, সেদিন বি.গার্ডেনে আমার ভাল করে ঘোরা হয়নি। ঘোরার সময় মাথায় ঘুরছিল তোমাকে কীভাবে বোঝাব, আমাদের মধ্যে প্রেম সম্ভব না হোক, তোমার বন্ধুত্বটা আমার ভীষণই প্রয়োজন। একেবারে বাড়ি অবধি ধাওয়া করেছি যখন, তাগিদটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ! কাল চলো আবার বি গার্ডেন যাই। গাছগুলো চিনি, নামগুলো পড়ি। প্রেম ছাড়াও তো পৃথিবীতে আরও অনেক বিষয় আছে, যা আমাদের চেনাজানা হয়নি।"

কলিকে এড়ানো যে কত কঠিন সেদিনই বুঝে গিয়েছিল বিহান। কোনও আড়ষ্টতা নেই, প্রথমবার এসেই মা-দিদির সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছিল। বিহান যদি বি.গার্ডেন যাব না বলত, যাওয়ানোর জন্য কলি নির্ঘাত মা-দিদিকে বোঝাতে বসত। তার আর বিহানের সম্পর্কটা যে বন্ধুত্বের, গোড়াতেই মা-দিদির কাছে খোলসা করে দিয়েছিল। নিজের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, বলেছিল সেটাও। কলি চলে যেতেই দিদি সতর্ক করেছিল বিহানকে। বলেছিল, "এই ধরনের মেয়েরা কিন্তু সাঙ্ঘাতিক হয়। একসঙ্গে দু'টো সংসার ভাঙে।"

সংসার তখন বিহানের কাছে সুদূর কল্পনা। সে উপলব্ধি করেছিল, কলি শুধু একজনেরই মন ভাঙল, নির্মাল্যর নয়। দ্বিতীয়বার যেতেই হয়েছিল বি.গার্ডেনে। কলি অসম্ভব রোম্যান্টিক। অদ্ভুত সব ভাবনা ঘোরে মাথায়! বিহানের অনেক কবিতাই কলির উসকে দেওয়া। উধাও হওয়া গাছটা নিয়েও কবিতা লিখেছিল বিহান। কবিতাটা পড়ানো হয়নি কলিকে। কবিতার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই কলির। কারও থেকে জেনেছিল বিহান কবিতা লেখে, ওদের একটা পত্রিকা আছে। তথ্যটা জোগাড় হওয়ার পর বিহানের উপর চোটপাট করেছিল, "অন্যের থেকে জানতে হল, কবিতা লেখো, পত্রিকা বের করো! আমাকে এসব বলার যোগ্যই মনে করো না!"

বিহান প্রতিশব্দের কয়েকটা সংখ্যা দিয়েছিল কলিকে। দু'দিন পর কলি কমেন্ট করল, 'দারুণ পত্রিকা। আমাকে গ্রাহক করে নাও। আর তোমার কবিতা তো সুন্দর হবেই, কত সংবেদনশীল ছেলে তুমি!'

এরকম উদাসীন প্রশংসার চেয়ে কঠোর নিন্দা অনেক বেশি সহনীয়। তারপর থেকে কলিকে নিজের কবিতা শোনায়নি বিহান। কলিও শুনতে চায়নি। প্রতিশব্দর গ্রাহক অবশ্য হয়েছিল। লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক পাওয়া মরুভূমিতে বৃষ্টি হওয়ার সামিল। প্রতিশব্দতে বিহানের কবিতা পড়ে কদাচিৎ মন্তব্য করেছে কলি এবং সেই একটাই, অমুক কবিতাটা বেশ ভাল হয়েছে। তোমার কবিতা তো সুন্দর হবেই... ব্যস আর কোনও কথা নয়, প্রসঙ্গ ঘুরে যেত। মিউজিক আর ড্রয়িং-এর ব্যাপারে কলির সামান্য উৎসাহ দেখা যায়, ইনস্ট্রুমেন্ট এবং সব ধরনের গান পছন্দ করে। গুনগুন করে নিজেও। খুবই সুরেলা গলা। ছবি আঁকে, আজ পর্যন্ত ওকে কোনও ছবি সম্পূর্ণ করতে দেখেনি বিহান। আঁকতে-আঁকতে ছেড়ে উঠে যায়। ওর আঁকা দুটো কমপ্লিট ছবি বাঁধিয়ে টাঙানো রয়েছে ওদের বাড়িতে। ছোটবেলায় আঁকা ছবি। বিহান কলিকে বেশ কয়েকবার বলেছে, তুমি গান কিংবা ড্রয়িং যেকোনও একটা নিয়ে চর্চা চালিয়ে গেলে অনেকদূর যেতে পারতে।

কলি মিষ্টি করে হেসে বলে, 'তুমি আমায় ভালবাস বলে আমার সবকিছুই তোমার সুন্দর লাগে।'

এ হচ্ছে এড়িয়ে যাওয়ার ছল। চর্চার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই কলির। ওর যাবতীয় উৎসাহ 'রহস্য' আর 'উৎকণ্ঠা' নিয়ে। সামান্য ব্যাপারেও রহস্য খুঁজে পায়, উৎকণ্ঠায় ভুগতে ভীষণ পছন্দ করে। কলির এই ঝোঁকের ঠেলায় বিহানকে কত কিছু না করতে হয়েছে, ওর বান্ধবী একটা এমন ছেলের প্রেমে পড়েছে, যাকে দেখে কলির মনে হয়েছে লম্পট। ছেলেটার সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে বলেছে কলি। ওদের বাড়িতে এক মহিলা বড়ি বিক্রি করতে আসত, হঠাৎ অনেকদিন আসছে না। মহিলার ঠিকানা রয়েছে কলির কাছে, কলিকে নিয়ে যেতে হয়েছে বড়িওলির গ্রামে। পাড়ায় এক নতুন ফেরিওলাকে ক'দিন অবজার্ভ করে সন্দেহ হল কলির, মনে হল বদ মতলবে ঘুরছে, বিহানকে ফলো করতে পাঠাল। এরকম বিবিধ দায়িত্ব বিহানের উপর চাপিয়েছে কলি। ওর প্রেমিক নির্মাল্যর সঙ্গে ঝামেলা হলেও মধ্যস্থতা করতে হয়েছে বিহানকে। এমনকী, ওদের বিয়ের পরও। এখন তো ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, বড় একটা গোলমাল পাকিয়েই এসেছে। মধ্যস্থতা করে দিতে চাইছে বিহান, কলি পারমিশন দিচ্ছে না। আরও একটা বিষয়ে কলি বরাবর উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে, বিহানের একটা প্রেমিকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া। নিজের অনেক বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বিহানকে আড়ালে জিজ্ঞেস করেছে, কাকে পছন্দ হচ্ছে? এসব ক্ষেত্রে যা হয়, কোনও মেয়ে তার চেয়ে কম সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করায় বন্ধু বা ভালবাসার পাত্রটিকে। সেখানেও কলি সৎ থেকেছে, অলক্তিকা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, সে একেবারে ডাকসাইটে সুন্দরী। কলিকেও খানিক ম্লান লাগছিল ওর কাছে। অলক্তিকা মরিয়া হয়ে উঠেছিল বিহানকে পেতে। কলির সাহায্য নিয়ে সেই যাত্রায় রেহাই পায় বিহান। শান্তিনিকেতনের ট্রিপে চন্দ্রিমার সঙ্গেও বিহানকে ভেড়াতে চেয়েছিল কলি,

Scanned with CamScanner

যথারীতি সাফল্য পায়নি। বিহানকে কিছু করতে হয়নি, চন্দ্রিমাই ভীষণ গুটিয়ে গিয়েছিল। গ্রামে মানুষ হয়েছে, সঙ্কোচ ওর বেশি। বেশির ভাগ সময় শাড়ি পরত আর লাজুক বলে সহপাঠীরা চন্দ্রিমার নাম দিয়েছিল বঙ্গবালা। সেই বঙ্গবালার সূত্রে বিহান আজ পশ্চিমবাংলার বিরাট এক রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি। কলি তাকে ঠেলে না পাঠালে সজ্ঞানে সে এই ঝামেলার মধ্যে পড়ত না। বসে থাকত না চেন ছাড়া ওই বিশাল কুকুরটার সামনে। এদিকে নির্ভেজাল সত্যিটা হল, কলির প্রতি এখন আর কোনও প্রেম নেই বিহানের। কলি যদি নির্মাল্যকে ডিভোর্স দিয়ে বিহানকে বিয়ে করতে চায়, বিহান নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। ডিভোর্স বোধহয় ফাইল করে দিয়েছে কলি, এত দিন ধরে যখন বাপের বাড়িতে বসে আছে, মাথার চিলতে সিঁদুরও যখন উধাও... নির্মাল্যকে অসম্ভব জ্বালিয়েছে কলি। ওর সঙ্গে বসবাস করা যে কঠিন টাস্ক, ওদের দাম্পত্য সমস্যা মেটাতে গিয়ে বুঝেছে বিহান। কলির মাথার স্ক্রু খানিকটা ঢিলে। তাহলে বিহান কেন কলিকে আজও এত পাত্তা দেয়? দেয় না তো পাত্তা। কলি না ডাকা অবধি আজকাল আর যায় না ওর কাছে। তারপর শুরু হয় কলির ম্যাজিক। সমস্যাগুলো এমনভাবে বলবে, শ্রোতার বুক ছুঁয়ে যাবেই। বিহানের ধারণা পাষাণ হৃদয় গলিয়ে ফেলার ক্ষমতা আছে কলির।

কলির থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বিহান যে মেয়েদের এড়িয়ে চলেছে, তা নয়। বেশ কিছু মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। কলির বন্ধু অলক্তিকার সঙ্গে শরীরী ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। এইসব মেয়েদের সঙ্গে প্রেম না হয়ে ওঠার জন্য বিহান এবং বিশেষ মেয়েটি দায়ী। এর মধ্যে কলি কোনওভাবেই জড়িত নয়। অলক্তিকা ছাড়া আর কোনও মেয়ের ব্যাপারে কিছুই জানে না কলি। কেন জানাতে যাবে বিহান? তেমন তো কোনও শর্ত হয়নি। কলির সাহায্য ছাড়া অলক্তিকাকে এড়ানো যেত না, তাই বলেছিল, অলক্তিকাও বন্ধুর কাছে ধারাভাষ্য দিয়ে গেছে বিহানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার। সে এক লজ্জাজনক, বিব্রতকর এপিসোড। ছোট্ট অধ্যায়, আর একটু বয়স বাড়লে হয়তো ভুলেও যাবে বিহান। যকুকুরটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিহানের সমস্ত মনোযোগ এখন কুকুরটার দিকে। এই রে, এগিয়ে আসছে। বিস্কুটটা প্লেট থেকে তুলে নিল বিহান। ছুড়ে দিল কুকুরটাকে লক্ষ করে। বিস্কুটটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না সে। গেরামভারী চালে এগিয়ে আসছে, ফের সিঁটিয়ে যায় বিহান। কার থেকে জানি শুনেছিল কুকুররা মানুষের ভয়ের গন্ধ পায়। কেউ বেশি ভয় পেলেই সন্দেহ হয় ওদের। বিহান কম ভয় পাওয়ার প্রবল চেষ্টা করে যাচ্ছে। কুকুরটা ওর পায়ের কাছে এসে থাবায় মুখ রেখে বসে পড়ল। একটু হলেও, স্বস্তি ফিরল বিহানের। তবে এই টেনশন আর নেওয়া যাচ্ছে না। চুপচাপ যে কেটে পড়বে, তাও সম্ভব নয়। কুকুরটা ঘ্যাঁক করে কামড় বসাবে। রূপাঞ্জনা কেন যে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন, কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না বিহানের। গত তিনদিন ধরে ফোনের মাধ্যমেই চন্দ্রিমাদের বিষয়টার কাজ চালিয়েছে বিহান। কলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমিতেশদাকে গিয়ে সমস্যাটা বলেছিল।

অমিতেশদার সমর্থন পেলে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলার জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগতে হত না বিহানকে। সে পথে গেল না অমিতেশদা। বলেছিল, "দ্যাখ, এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়, বাম আমলেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। কাগজে, টিভিতে এরকম খবর আমরা দেখেছি, পড়েছি আর ভেবেছি, আক্রান্তের পাশে গিয়ে নিশ্চয়ই কেউ বা কয়েকজন দাঁড়াবে। কিন্তু এই ঘটনাটা এখনও সংবাদমাধ্যমে পৌঁছয়নি। কথাকলির থেকে জেনেছিস তুই, তারপর আমি। আমাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাটা অন্যায় হবে। নিজের কাছেই জবাব দিতে পারব না।"

বলার পর অমিতেশ ফোন করেছিল মুকুলদাকে, অমিতেশদার বন্ধু, 'সংবাদপ্রবাহ'র সাংবাদিক। ওদের ব্যাপক সার্কুলেশন। ফোনালাপের মাঝেই অমিতেশদা বিহানকে বলেছিল, 'ওই ভদ্রলোকের ফোন নাম্বারটা দে। মুকুল ওদের জেলা করেসপন্ডেন্টকে জানিয়ে দেবে।'

'এই রে, চন্দ্রিমার বাবার নাম্বারটা তো নেওয়া হয়নি।' আক্ষেপের গলায় বলেছিল বিহান।

অমিতেশদা ফোনে থাকা মুকুলদাকে বলেছিল, 'আপাতত বিহানের নাম্বারটা তোকে এসএমএস করছি। পরে পাঠাচ্ছি শ্রীকান্ত মিশ্রর নাম্বার।'

বিহান ততক্ষণে ফোনে ধরেছে কলিকে। বলেছে 'চন্দ্রিমার বাবার ফোন নাম্বার দাও।'

অপর প্রান্ত থেকে কলি বলেছিল, 'ভেরি গুড। কাজ শুরু করে দিয়েছ। ফোনটা কাটো, চন্দ্রিমার থেকে জেনে নিয়ে এক্ষুনি জানাচ্ছি।'

তারপর থেকে অজস্র ফোন চালাচালি। অমিতেশদাকে মুকুলদার সাহায্য নিতে দেখে বিহানের মাথায় এসেছিল আমারও তো দু'বন্ধু জার্নালিস্ট। সুব্রত খবরের কাগজের, জয়ন্ত টিভির। নিজেদের পত্রিকার কথাবার্তা সেরে, কথাকলির পাঠানো শ্রীকান্ত মিশ্রর ফোন নাম্বার অমিতেশদাকে দিয়ে ও বাড়িতে বসেই বিহান ফোন করেছিল দু'বন্ধুকে। দু'জনকেই পাওয়া যায়নি। সুব্রতর ফোন বেজে গেল, জয়ন্ত সম্ভবত কেটে দিয়েছিল। পরে ওরা নিজেরাই মিস্‌ড কল দেখে ফোন করে। বিহান শ্রীকান্ত মিশ্রর সংকটটা জানায়, ফোন নাম্বার দেয় ওঁর। দু'বন্ধু আশ্বাস দেয়, কোনও চিন্তা করতে হবে না। আমাদের ওখানকার সাংবাদিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি ভদ্রলোকের কাছে। তিনটে নিউজ মিডিয়ার রিপোর্টারের সঙ্গে ফোনে কথা চলতে লাগল বিহানের, যারা পশ্চিম মেদিনীপুর কভার করে। শ্রীকান্ত মিশ্রর বাড়ি যাওয়ার আগে পরে যা যা ঘটছে বিহানকে ফোনে জানাতে লাগল তিনজনে। লাগাতার ফোনের কিছু কল বিহানের অফিসেও এসেছিল। বড়বাজার অফিসে রোজ এক ঘণ্টার হাজিরা দিতে হয় বিহানকে। গোটা সময়টাই থাকে মালিক কিশোরীলাল বাজাজের ঘরে। বিজনেস স্ট্র্যাটেজি ঠিক হয়। তারপর সেলসের কাজে বেরিয়ে পড়ে মার্কেটে। নামী ভারতীয় এক গার্মেন্ট কোম্পানির শাড়ি, জামা-প্যান্টের পিস সেল করে বিহান। কোম্পানির পশ্চিমবঙ্গের ডিলার কিশোরীজি। হেড অফিস মুম্বই। প্রোডাক্টে দম আছে, দামও অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় কম। ফলে সেল করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। ব্রিফকেসের চেয়ে একটু বড় সুটকেসে শাড়ি, জামা-প্যান্টের পিসের টুকরো স্যাম্পেল নিয়ে দোকানে-দোকানে ঘুরতে হয়। আজ সুটকেস নিতে হয়নি, কার্টসি ভিজিটে গিয়েছিল। স্যালারি, ট্রাভেলিং অ্যালাওয়েন্স, কমিশন মিলিয়ে রোজগার ভদ্রই হয়। এই চাকরিটা জোগাড়ের পিছনে কথাকলির বিরাট ভূমিকা আছে। পরশুদিন কলির চাপিয়ে দেওয়া ঝামেলার বেশ ক'টা ফোন এল কিশোরীজির সামনে। প্রতিবারই চেম্বার থেকে বেরিয়ে গিয়ে কথা সেরেছিল বিহান। ফোনের বহর দেখে কিশোরীজি একসময় বলতে বাধ্য হলেন, "কেয়া বাত হ্যায় মুখার্জি, ঘর পে কুছ প্রবলেম হো গয়া কেয়া?"

"নেহি, মেরা এক রিলেটিভ বিমার হ্যায়।" বলেছিল বিহান।

কিশোরীজি বলেছিলেন, "মেরে সে কুছ হো সকে তো বোলো।"

"উতনা কুছ সিরিয়াস নেহি। উয়ো লোগ থোড়া ঘবরা গয়া।" বলে পাশ কাটিয়েছিল বিহান। এই প্রবলেমে কোনও হেল্পই করতে পারবেন না কিশোরীজি। মাঝখান থেকে ঘটনা বৃত্তান্ত শুনে বিহানের ব্যাপারে শেকি হয়ে পড়বেন। মনে করবেন বিহান খুব সোর্সফুল লোক, এত মিডিয়া ওর সঙ্গে কথা বলছে। কবি পরিচয়টাও কথায়-কথায় চলে আসবে সামনে। এরকম হেভিওয়েট কর্মচারীকে অর্ডার করতে বাধবে তাঁর। নমস্কার জানিয়ে বলতেই পারেন, আপনি এখানে কাজ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না প্লিজ। একদিন পার হতে বিহানের মনে হতে লাগল রিপোর্টাররাও খুব একটা কিছু করে উঠতে পারবে না। ওরা সকলেই ঘটনাটা ঘটার অপেক্ষায় আছে। খবর পেয়ে ওদের পৌঁছতে যদি দেরি হয়ে যায়, অঘটনটা ঘটেই যাবে। অগত্যা কলির দেখানো পথ ধরল বিহান। নীচের তলার ক্যাডার বাহিনীকে আটকাতে হলে পার্টির উপরতলাকে ধরতে হবে। ফোন করেছিল সুরকার রাজদীপ সেনকে। খোশমেজাজি লোক। বললেন, "কী ব্যাপার বস? হঠাৎ এই অধমকে মনে পড়ল। আমি তো ভাবলাম ভুলেই গেলে। নতুন গান লিখলে কিছু?"

"না, লেখা হয়ে ওঠেনি। আমি একটা অন্য দরকারে ফোন করেছি।' বলার পর শ্রীকান্ত মিশ্রর গোটা ঘটনাটা জানিয়ে রাজদীপ সেনের সাহায্য চেয়েছিল বিহান। কীভাবে হেল্প করতে পারবেন বলেছিল সেটাও, 'আপনাকে তো সরকারের প্রচার মঞ্চে হামেশাই দেখা যায়, দেখুন না কোনও মন্ত্রীকে বলে যদি বাঁচানো যায় ভদ্রলোককে।"

রাজদীপদা হাত তুলে নিলেন। বলেছিলেন, "দ্যাখো বস, সোজাসাপটা একটা কথা বলি, আমার কাজ আসার ফ্লো যাতে কমে না যায়, সেই ভেবেই আমি সরকারের মঞ্চে উঠি, মিছিলে হাঁটি। মন্ত্রী কিংবা পার্টির আপার লেভেলের কারও সঙ্গে দহরম-মহরম নেই আমার। এটা আছে রূপাঞ্জনার। সরকারের কালচারাল ফ্রন্টের কোনও একটা কমিটির হেড। তুমি বস রূপাঞ্জনাকে ধরো। তোমার লেখা গানে সাকসেস পেয়েছে, রিকোয়েস্টটা সহজে ঠেলতে পারবে না।"

পরামর্শ মতো রূপাঞ্জনা বসুকে ফোন করেছিল বিহান। বিহান আমতা-আমতা করে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। উনি বলে উঠেছিলেন, "আরে বাবা, চিনেছি। কেমন আছ বলো। লেখালিখি চলছে?"

গৌরচন্দ্রিকায় সময় নষ্ট করেনি বিহান। খুব তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গে চলে এসেছিল। উনি মন দিয়ে সব কথা শুনে বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আমি দেখছি কিছু করা যায় কিনা।"

সুর শুনে মনে হয়েছিল 'দেখছি'টা ভদ্রতা করেই বললেন। যেমন লোকে বলে। ফোন রাখার সঙ্গে-সঙ্গে বিহানের রিকোয়েস্ট ভুলে যাবেন। মাঝে মাত্র একদিন গেছে, বিহানকে অবাক করে আজ দুপুর দুটো নাগাদ ফোনসেটে রূপাঞ্জনার নাম জ্বলে উঠল। বিহান জগদ্দলের স্বদেশ বস্ত্রালয়ে বসে আছে। রূপাঞ্জনা বললেন, "তোমার ওই প্রবলেমটা নিয়ে কিছু কথা আছে, চারটের সময় আমার বাড়িতে চলে আসতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই পারব।" বলেছিল বিহান। ভাল মতো করে জেনে নিয়েছিল ঠিকানা। স্বদেশ বস্ত্রালয়ের মন্টু দত্তকে অবাক করে বেরিয়ে পড়েছিল দোকান থেকে। মন্টুবাবু বিহানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমার। দুর্দান্ত চালু দোকান। মন্টুবাবুর সঙ্গে যতদিন সম্পর্ক অটুট থাকবে, টার্গেট নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বিহানকে। মন্টুবাবু বিহানকে খুবই পছন্দ করেন। স্বদেশ বস্ত্রালয়ে গেলে হাতে সময় নিয়ে যেতে হয়। সুখ-দুঃখের গল্প করেন মন্টুবাবু। পাশেই একটা মিষ্টির বড় দোকান। বিহানের জন্য পছন্দসই মিষ্টি আনান। রূপাঞ্জনা ফোনে ডেকে পাঠানোতে মন্টুবাবুর গল্পের মাঝখান থেকে উঠে আসতে হয়েছে বিহানকে। উনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, "বাবা, আজ এত হুড়োহুড়ি! ফোনটা যেন কোনও মন্ত্রীর মনে হচ্ছে।"

"হলে খারাপ হত না।" বলে দোকান থেকে বেরিয়ে বাস ধরেছিল বিহান। অনেকটাই রাস্তা। সারাক্ষণ ভেবে গিয়েছে, রূপাঞ্জনা বাড়িতে ডেকে পাঠালেন কেন? চন্দ্রিমার বাবার সংকট নিয়ে ফোনাফুনি করেই তো কাজ এগনো যাচ্ছিল। ধোঁয়াশা এখনও কাটল না। একঘণ্টা হতে চলল ভয়ার্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে বিহান। রবীন্দ্রনাথের গান এত তেতো কখনও লাগেনি।

'তুমি নিশ্চয়ই পোগোকে বিস্কুটটা দিয়েছিলে। এসব ওর মুখে রোচে না।' কথাটায় অপমানিত বোধ করা উচিত হবে কিনা, বুঝে উঠতে পারে না বিহান।

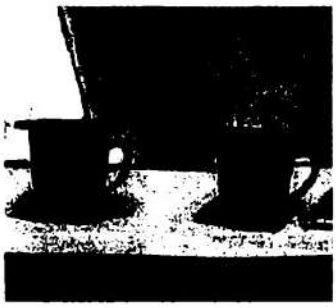

না, জানান দেওয়ার দরকার পড়বে না মনে হচ্ছে। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ছাত্রীরা। রূপাঞ্জনা ঘরে এসেই বিহানকে বললেন, "সরি, সরি। অনেকক্ষণ বসতে হল তোমাকে।" এরপরই ওঁর চোখ পড়ল মেঝেয় পড়ে থাকা বিস্কুটটার দিকে, কারণটা অনুধাবন করলেন চট করে। বিহানকে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই পোগোকে বিস্কুটটা দিয়েছিলে। এসব ওর মুখে রোচে না। ওর জন্য আলাদা বিস্কুট।' কথাটায় অপমানিত বোধ করা উচিত হবে কিনা, বুঝে উঠতে পারে না বিহান। কুকুরের বিস্কুট তাকে দেওয়া হয়নি, এটা তো সম্মানের। রূপাঞ্জনা 'বলাই' বলে হাঁক পাড়লেন। কাজের লোকটি এসে পড়ল। বিস্কুটটা দেখিয়ে রূপাঞ্জনা বললেন, 'এটা নিয়ে যাও।'

নির্দেশ পালন করল লোকটি। রূপাঞ্জনা এবার বিহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো কী বলবে? আর একবার চা খাবে কি?'

কথা হারিয়ে ফেলেছে বিহান, মাথা নেড়ে চায়ের প্রস্তাবে না করে দেয়। সে কী বলবে? রূপাঞ্জনাই তো কিছু বলবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিহান বিনয়ের সঙ্গে মনে করিয়ে দেয়, "ওই ধুমুরিয়া গ্রামের..."

"ওহ ইয়েস। ঠিক আছে, ওসব কথা পরে হবে। তার আগে বলো নতুন গান কাকে দিলে?" জানতে চাইলেন রূপাঞ্জনা। বিহান বলে, "নতুন কিছু লিখে উঠতে পারিনি। নানান কাজে এমন বাজেভাবে জড়িয়ে গেছি লেখার মতো মনের অবস্থা নেই।"

"সে কী, একসঙ্গে দুটো গান হিট দেওয়ার পর যে কোনও নতুন গীতিকার গান লিখে খাতা ভরিয়ে ফেলত। তুমি আমায় মিথ্যে বলছ না তো কারও নির্দেশে? যাকে তোমার নতুন গানগুলো দিচ্ছ?"

হতাশার হাসি হাসে বিহান। তাতেও রূপাঞ্জনার বিশ্বাস আদায় করা গেল না। বলতে লাগলেন, "দ্যাখো, তোমার লেখা দুটো

গানের মধ্যে আমার চেয়ে সায়নেরটাই মিডিয়া হাইপ পাচ্ছে বেশি। এফএম-এ বারবার দিচ্ছে। সেটার কারণ, সায়নের পি আর খুব স্ট্রং। সাধারণ শ্রোতার কিন্তু বেশি পছন্দ হয়েছে আমার গানটা। ডাউনলোড হচ্ছে প্রচুর। শো করতে গেলে তোমার লেখা গানটার রিকোয়েস্ট আসছে গোড়াতেই। এবার পুজো মণ্ডপগুলোতে আমার গানটা কী পরিমাণে বেজেছে বলো?''
কোনও মন্তব্য না করে সমর্থনসূচক হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলল বিহান। কোন গানটা বেশি হিট, তা নিয়ে সে মাথাই ঘামায়নি। বুঝতে পারছে রূপাঞ্জনা সন্দেহ করছেন, সায়ন গুপ্তই বিহানের গানগুলো নিয়ে নিচ্ছেন। অথচ সায়ন কোনও যোগাযোগ রাখেননি বিহানের সঙ্গে। রূপাঞ্জনা ভুগছেন অলীক আশঙ্কায়। ফের বলে উঠলেন, 'শোনো, তোমার এই ভদ্রলোকের সমস্যাটা নিয়ে আমি যতদূর সম্ভব করব। তার আগে একটা ডিল হয়ে যাক, তুমি এখন থেকে যে ক'টা গান লিখবে, ফোনে প্রথমে আমাকে শোনাবে। মেলও করতে পারো। মাস চারেকের মধ্যে একটা অ্যালবাম করতে চলেছি। সেখানে তোমার লেখা বেশ ক'টা গান আমার চাই।''
''লেখাগুলো যদি পছন্দ না হয় আপনার?''
''কিছু তো পছন্দ হবেই। মোটকথা আমার অ্যালবাম না বেরনো অবধি তুমি একটা গানও অন্য কাউকে দেবে না। রাজি?''
ঘাড় হেলিয়ে দেয় বিহান। রাজি না হয়ে আর উপায় কী? এখানেও সেই গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। নিজের লেখার কদর দেখে অবশ্য ভালই লাগছে বিহানের। রূপাঞ্জনা বলছেন, ''এবার তোমার ব্যাপারটায় আসা যাক, বড় এক নেতাকে আমি ধুমুরিয়ার ঘটনাটা বলেছি, তোমার ফোন নাম্বার উনি চেয়ে নিয়েছেন। হয়তো কালই তোমার সঙ্গে কথা বলে ঘটনার ডিটেলটা শুনবেন।''
বিহান আক্ষেপের সুরে বলে ওঠে, ''ইস, শ্রীকান্ত মিশ্রর নাম্বারটা আপনাকে দিয়ে রাখলে ভাল হত। ওখানকার ব্যাপারটা উনিই সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন।''
''না, নেতা ওঁর সঙ্গে প্রথমে কথা বলবেন না। শ্রীকান্ত মিশ্র নিজের হয়ে সাফাই দেবেন। তুমি নিরপেক্ষভাবে ওখানকার খবর নাও। শ্রীকান্ত মিশ্রর অতীতটা জানো। ওঁদের পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন উনি কী কী সুবিধে পেয়েছেন, কোনও অন্যায় কাজ করেছেন কিনা, সমস্তটাই জানবে। যদি বড় কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকেন, তা হলে কোনও সাহায্যই পাওয়া যাবে না।''
শ্রীকান্ত মিশ্রর সম্বন্ধে কীভাবে খোঁজ নেবে, ভেবে পায় না বিহান। তাও যখন একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকান্ত মিশ্রকে বাঁচানোর, হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিহান বলে, ''আমি যতদূর জানি উনি সৎ মানুষ। সেই কারণেই বাম জামানার শেষ ক'বছর পার্টির থেকে দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। ডাক্তারিটাই করতেন মন দিয়ে। তবু আমি ওঁর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি।'' থেমে বিহান জিজ্ঞেস করে, ''কোন নেতা ফোন করবেন আমাকে?''
একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন রূপাঞ্জনা। চটকা ভেঙে বলে ওঠেন, ''ও হ্যাঁ, ইম্পর্ট্যান্ট কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। নেতার নাম তোমাকে জানানো যাবে না। ফোনে কথা বলার সময় তুমিও চেষ্টা করবে না জানার। উনি যা জিজ্ঞেস করবেন, শুধু সেটারই উত্তর দেবে। ওকে?''
ঘাড় হেলাতে দেরি করে ফেলে বিহান। ব্যাপারটা যে এরকম রহস্যের দিকে টার্ন নেবে ভাবতে পারেনি। সোফা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলে, ''আমি তা হলে এখন আসি। নেতার সঙ্গে কী কথা হল, ফোনে আপনাকে জানাব।''
''ঠিক আছে।'' বলে মিষ্টি করে হাসলেন রূপাঞ্জনা।
বিহানের সঙ্গে কুকুরটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। সি-অফ করতে সদর অবধি এল। চৌকাঠ ডিঙোতে যাবে বিহান, রূপাঞ্জনা বলে উঠলেন, ''অ্যালবামের কথা মাথায় থাকে যেন।''
ঘাড় ফিরিয়ে হাসি সহযোগে বিহান বলল, ''থাকবে।''

মাথায় এক রাশ চিন্তা নিয়ে পাড়ায় ফিরল বিহান। বিশুদার চায়ের দোকানে ভিড়। সান্ধ্যআড্ডা। ওখানে বিহানের দু'-চারজন বন্ধু অবশ্যই আছে। অন্যদিন কাজ থেকে ফিরে বিশুদার দোকানে ঘণ্টাখানেক আড্ডা মেরে বার দুয়েক চা খেয়ে বাড়ি ঢোকে বিহান। আজ আড্ডায় ভেড়াই যাবে না। সোজা যেতে হবে কলিদের বাড়ি। এখনও মাথায় আসেনি, কীভাবে জোগাড় করবে শ্রীকান্ত মিশ্র সম্বন্ধে পক্ষপাতহীন তথ্য। শাসক দলের নেতা কাল কখন ফোন করবেন, নির্দিষ্ট করে বলেননি। সকালেই যদি করেন। ভুলভাল ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না। পার্টির লোকেদের নেটওয়র্ক খুব স্ট্রং। ধরা পড়ে যাবে বিহান। সকালের আগেই কলির সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। যদি কোনও বুদ্ধি দিতে পারে।
কলিদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে বিহান। পাঁচিলের গেট খুলে ভিতরে ঢোকে। পৌঁছে গিয়ে ডোরবেল টিপল বিহান। একটু বাদে দরজা খুললেন কলির পিসিমা, দরজার সামনেই কোলাপসেবল গেট, বন্ধ। পয়সাওলা লোকেদের যেমন থাকে আর কি। বিহান বলে, 'কলি আছে?'
পিসিমা কোনও উত্তর করলেন না। ভিতর ঘরের দিকে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা এত কম কথা বলেন কেন, কে জানে! রুদ্রকাকুকে আসতে দেখা যাচ্ছে। গেটের কাছে এসে বললেন, 'কলি তো নেই। নির্মাল্য এসে নিয়ে গিয়েছে।'
পায়ের নীচের সিঁড়িটা যেন ধসে গেল। কী করবে এখন বিহান? কাল সকালেই যদি ফোন করে বসেন নেতা, কী বলবে সে? রুদ্রকাকুর সঙ্গে কি এ ব্যাপারে আলোচনা করবে? লাভ হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত উনি চাইছেন না, বিহান বাড়িতে ঢুকুক। চাইলে, এতক্ষণে কোলাপসিবল গেটটা খুলে দিতেন। আর চন্দ্রিমার বাবার সমস্যাটায় উনি গোড়া থেকেই নিজেকে দূরে রেখেছেন। মাথা নিচু করে এইসব ভেবে নিয়ে বিহান মুখ তুলে রুদ্রকাকুকে বলল, 'ঠিক আছে, কলির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিচ্ছি।'
ঘুরে দাঁড়িয়ে চাতালের নীচের ধাপে পা রেখেছে বিহান, পিছন থেকে রুদ্রকাকু বলে উঠলেন, 'কলিকে এখন বেশ কিছু দিন ফোন কোরো না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে নির্মাল্যর সঙ্গে পাঠিয়েছি। এদিক থেকে যত কম যোগাযোগ করা যায়, ততই মঙ্গল। সংসারে মন বসাতে পারবে মেয়েটা।'
বিষম বিস্ময়ে রুদ্রকাকুর দিকে তাকায় বিহান, কী মিন করতে চাইলেন, ধরতে পারে না। কলির শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসার পিছনে ঘুরিয়ে বিহানকে দায়ী করলেন কি? অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে মন। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গেট লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় বিহান।

৪

সুজন মাঝি যেদিন তুমি লিখবা তুমার গান
সেদিন আমার জুড়াইব পরান।
তুমার কথা বান্ধে যারা সুরে
তুই রইলা নদীর এই পারে, আর

তারা অন্য পারে...

এই হচ্ছে গানের প্রথম ক'টা লাইন। ভেসে আসছে ওষুধঘর থেকে। পুরুষকণ্ঠের গান। শ্রীকান্ত শুনল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অনেক কষ্টে গানের কিছু কথা উদ্ধার করতে পেরেছে কাবিলকু। বাকি লাইনগুলো পিছলে পিছলে যাচ্ছে। কারণ, ভাষাটা এই দিককার নয়। সুরটা অবশ্য চেনে পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি কাবিলকু। বাউল সুর। এ জেলায় বাউলদেরও আনাগোনা নেই। এখানে কীর্তন চলে। কাবিলকুর অনেক কীর্তন মুখস্থ। কাজ করতে-করতে নিজের মনে গায়। বাউল গান শুনেছে জলসায়, যাত্রাপালায়। কাবিলকু শ্রীকান্ত মিশ্রর মাটির বাড়ির দোতলার বারান্দায় শোয়। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে যায় এ বাড়ি থেকে। কোনও জরুরি কাজে যায় তা কিন্তু নয়। অন্ধকার থাকতে সরে পড়ে এক অনিশ্চয়তা থেকে। এ বাড়ির লোক জেগে উঠে যদি তাকে বলে, কাল থেকে আর শুতে এসো না। বলার ন্যায্য কারণও আছে, কাবিলকুর বাড়ি আছে, শোওয়ার জায়গায় আছে যথেষ্ট। গত পনেরো বছর ধরেই আছে। তবু ওদের বাড়ির বারান্দাতেই এসে শোয় সে। ঘুমটা ভাল হয়। অন্য কোথাও ঘুম আসতে চায় না। নিজের বাড়িতেও নয়। চল্লিশ বছরের অভ্যেস বলে কথা! বর মারা গেল, ওর কোলে তখন বাচ্চা। কাবিলকুর দ্বিগুণ বয়স ছিল বরের। সে দ্বিতীয় পক্ষের বউ। বর মারা যেতেই প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েরা কাবিলকুকে বাচ্চা সমেত বাড়ি থেকে বের করে দিল। কাবিলকু আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামের মন্দিরে, এখানকার সবাই দোল মন্দির বলে। আগে পঞ্চায়েত ছিল না। গ্রামের মুরুব্বিদের নিয়ে মন্দিরে বিচারসভা বসত। পুরোহিত ব্রজলাল মিশ্রও ছিল মুরুব্বিদের একজন। বিচারে কাবিলকু হেরে গেল। তার হয়ে ব্রজলাল মিশ্রই সওয়াল করেছিল একমাত্র। প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েরা বলল কাবিলকুকে তার বাবা বিয়েই করেনি। রাখনি হিসেবে রেখেছিল। তার নামে বিষয়সম্পত্তিও লিখে দিয়ে যায়নি কিছু। কাবিলকু বিয়ের কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। বাপেরবাড়ি তার বহুদূর, সুন্দরবনের কাছে। বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ ছিল। কর্তা কী একটা কাজে গিয়েছিল তাদের গ্রামে। সদ্য প্রথম বউ মারা গিয়েছে, কাবিলকুকে চোখে ধরেছিল, বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল। পণের আবদার করেনি। দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না কাবিলকুর বাবার। বিয়ের পর মা-বাবা একদিনের জন্যেও তাকে দেখতে আসেনি এ গ্রামে। কাবিলকুর ধারণা মেয়ের বিয়ে দিয়েই সংসার নিয়ে বাবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। একটা ভাই আর বোন ছিল কাবিলকুর। বাবার অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল গ্রামে। বিয়ের প্রমাণ জোগাড় করতে পারবে না, বুঝেই গিয়েছিল কাবিলকু। বিচারের পর তার গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোথায় যাবে, কে তাকে রাখবে? দুধের শিশু নিয়ে মন্দিরেই রইল একরাত। ব্রজলাল মিশ্রর বউটির মনটা ভাল, পরেরদিনই কাবিলকুকে মন্দির থেকে নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে।

তখন ব্রজলাল মিশ্রর দোতলা ওঠেনি, একতলার দালানের একটা কোণ ঘিরে দিয়ে কাবিলকুর থাকার বন্দোবস্ত হল। বিনিময়ে বাড়ির কোনও কাজ করতে বলা হয়নি। কাবিলকু নিজে থেকেই করত। আরও পাঁচ বাড়িতে খাটতে যেত। ধান সেদ্ধ, মুড়িভাজা, গোয়াল কাড়া, দেওয়াল-উঠোনে ঘুঁটে দেওয়া। আরও নানাবিধ কাজ করে চাল, ডাল যা পেয়েছে বিক্রি করে টাকা জমিয়ে গিয়েছে শুধু। তার আর ছেলের খাওয়া পরা দিত ব্রজলাল ঠাকুর। ওদের বাড়িতেই মানুষ হল ছেলেটা। একটা পাস দিয়ে বেলদা শহরে সার-বীজের দোকানে কাজে ঢুকে পড়ল। জমানো টাকায় কাবিলকু ততদিনে খানিকটা বসত

জমি কিনেছে। চাকরির টাকায় বাড়ি তুলল ছেলে। বেশ ক'টা দিন নিজের বাড়িতে শুল কাবিলকু, ঘুম এল না। গুটি-গুটি পায়ে ফিরে এল পুরনো জায়গায়। ততদিনে ব্রজলাল ঠাকুরের ছেলে শ্রীকান্ত বাড়ি দোতলা করেছে। একতলায় অনেক ঘর। ঢাকা পড়ে গিয়েছে দালান। কাবিলকু জায়গা করে নিয়েছে দোতলায়। ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউমা এনেছে সে, রাতে মিশ্রবাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে পড়া অবধি নিজের বাড়িতে কাটায়। রাত গভীর হলেই মিশ্রবাড়ির বারান্দাটা যেন কাবিলকুকে ডাকে। অন্য বাড়ির কাজ ছেড়ে দিলেও, এ বাড়ির কাজ নিজের মতো করে যায় কাবিলকু। রাতে থাকতে দেওয়ার প্রতিদানটা এইভাবে নিঃসাড়ে সারে। আজ একটা কাজ করার সুযোগ ছিল, কাল অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম গুরুবার,

পাঁঠার মাংসের দাম মেটাতে গিয়ে কম পড়ে গিয়েছিল টাকা। শ্রীকান্ত যাচ্ছিল বউয়ের থেকে গয়না চাইতে, বিক্রি করে টাকা মেটাবে, বাসু আটকেছিল পথ।

লক্ষ্মীপুজো। পৌষমাস পর্যন্ত এই পুজো প্রত্যেক গুরুবারে হবে। চাল গুঁড়ো করা, আলপনা দেওয়া, পিঠে বানানো। কাবিলকু চাল গুঁড়োর কাজটা করে। হামানদিস্তেতে গুঁড়ো করা হয়। এ বাড়ির ঢেঁকিশাল তুলে দিয়েছে শ্রীকান্ত। ধান মেশিনে ভানিয়ে নিয়ে আসে।

ঘুম ভাঙার পর কাবিলকু আজ বাড়ি যায়নি। শ্রীকান্তর বউয়ের ওঠার অপেক্ষায় ছিল। যখনই বড় বউয়ের সাড়া পেয়েছে নীচে, সিঁড়ি ধরে নেমে এসেছিল। বলেছিল, "বউমা, চাউল গুঁড়া করতে হবেনি? কালই তো পুজো।"

"আর পুজো! দেখো সংসারের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। পুজো যাই হউক নমো নমো করি হবে। বাজার থেকে কুটি আনা হবে চাউল।" বলে পাকশালে ঢুকে গিয়েছিল বড় বউ। মুষড়ে পড়ে কাবিলকু। নতুন পার্টির লোকজন জরিমানা হিসেবে যত টাকা চেয়েছে, শ্রীকান্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সেটা জেনেই ওরা চেয়েছে। ওই পার্টিতে দু'জন সুদখোর আছে, যারা এক সময় শ্রীকান্তর পার্টি করত। বহুবার ওদের থেকে টাকা ধার নিয়েছে শ্রীকান্ত। বছরের শেষে শোধ করেছে। বৈশাখে আখিরি পুজোয় যখন রুগিবাড়ির লোক সারা বছরের ওষুধের দাম দিয়েছে শ্রীকান্তকে। এখানে এমনটাই নিয়ম। প্রত্যেক রুগিবাড়ির ধারের খাতা আছে শ্রীকান্তর কাছে। কাবিলকুর ছেলে বাসু বলে এসব নিয়ম শহরে চলে না। এখান থেকে মাত্র আট ক্রোশ দূরে বেলদা শহরেও নয়। সেখানে ওষুধ নাও, তখনই টাকা দাও। ডাক্তার দেখাতে আবার আলাদা পয়সা গুনতে হয়। শ্রীকান্ত বরাবরই কাছা খোলা লোক। হাতে টাকা থাকে না। চাষের খরচ, রুগির জন্য ওষুধ জমিয়ে রাখা, এমনকী কোনও লোক অভাবে পড়ে ন্যায্য দাম পাবে বলে শ্রীকান্তর কাছে যখন জমি বন্ধক কিংবা বিক্রি করতে আসে, ধার করেই সে টাকা জোগাড় করে শ্রীকান্ত। আখিরি পুজোয় টাকা পেয়ে শোধ দেয়, ফের পরের বছরে ধারে পড়ে যায়। রোজগেরে ছেলের থেকে একটা পয়সাও নেয় না শ্রীকান্ত, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই সে কথা জানে। তবু কেউ নতুন পার্টির লোকেদের বলছে না, শ্রীকান্ত মিশ্রর দশ লাখ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। যে কথাটা বাইরের কেউ জানে না, তা হল ভাইঝির বিয়ের সময় কাবিলকুর ছেলের থেকেও ষাট হাজার টাকা ধার নিতে হয়েছে শ্রীকান্তকে। পাঁঠার মাংসের দাম মেটাতে গিয়ে কম পড়ে গিয়েছিল টাকা। শ্রীকান্ত যাচ্ছিল বউয়ের থেকে গয়না চাইতে, বিক্রি করে টাকা মেটাবে, বাসু আটকেছিল পথ। স্বাতীর বিয়ের সময় বগলে টাকার ব্যাগ নিয়ে সব সময় সেঁটে ছিল শ্রীকান্তর সঙ্গে। বলেছিল, 'মামা, তুমি আর মামির গয়নায় হাত দিও না। জীবনে অনেকবার দিয়েছ। এই টাকাটা আমি দিচ্ছি।'

জলভরা চোখে বাসুর হাত থেকে টাকা নিয়েছিল শ্রীকান্ত। বলেছিল, "সামনের আখিরিতেই তোর পুরো টাকা আমি শোধ করে দেব।"

আগামী আখিরি এখনও প্রায় ছ'মাস। টাকা ফেরত দেওয়ার অবস্থায় শ্রীকান্ত থাকবে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। তা নিয়ে অবশ্য মোটেই ব্যাকুল নয় বাসু। তার দুশ্চিন্তা এখন শ্রীকান্তকে নিয়ে। ক'দিন আগেই কাবিলকুকে বলছিল, "বুঝলে মা, খবর যা পাচ্ছি, মারের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না মামাকে। গৌরদা, প্রফুল্লদা'র মতোই মেরে হাত-পা ভেঙে দেবে। চোখের সামনে দেখতে হবে আমাদের।"

কথাটা বিশ্বাস হয় না কাবিলকুর। এরকম একজন বিদ্বান, সজ্জন, পরোপকারীকে মারবে কি না গ্রামের উদোবুধো লোক। যারা বছর খানেক আগেও এ বাড়ির দালানে জড়সড় হয়ে বসে চা খেয়েছে, পরামর্শ করেছে শ্রীকান্তর সঙ্গে। মানুষগুলো সাহসই পাবে না শ্রীকান্তর গায়ে হাত তোলার। মারার আগের মুহূর্তে প্রত্যেকের নিশ্চয়ই মনে পড়বে শ্রীকান্তর থেকে পাওয়া উপকারগুলোর কথা। চরম বিপদের দিনে গ্রামের কেউ পাশে এসে না দাঁড়ালেও, শ্রীকান্ত ঠিক পৌঁছে গিয়েছিল তার কাছে। জাত-বেজাত, গরিব-বড়লোক বিচার করেনি, সকলকে আপনজন হিসেবে দেখেছে। মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। এই যে কাবিলকু, তার যে একটা মানুষের মতো নাম আছে, নিজেই ভুলে গিয়েছিল। বিয়ে হয়ে আসার পর এ গ্রামের লোক তাকে 'কোকিল কু' বলে খেপাত। তার একটা কারণ অবশ্য আছে, কাবিলকু গান খুব ভালবাসে। যেখানে যে গান শোনে মনে রেখে দেয়। কাজ করতে-করতে সেই গানগুলো গুনগুন করে। সেই জন্যই লোকে কোকিল পাখির সঙ্গে তুলনা টানে তার। একবার ভোটে নাম তোলার সময় শ্রীকান্ত বলল, "কাবিলকু কোনও মানুষের নাম হয় নাকি? ভাল করে ভেবে দেখো, তোমার নিশ্চয়ই অন্য কোনও নাম ছিল।"

Scanned with CamScanner

ভাবতে-ভাবতে কাবিলকু পৌঁছে গিয়েছিল ছোটবেলায়, কাবিলকুর আসল নাম গৌরী। একমাত্র মা ডাকত ওই নামে। কাবিলকুর নিজেরই গৌরী নামটা অন্য কারওর মনে হত। বিয়ের সময় কর্তা তার আসল নাম জানলেও, কাবিলকু নামটাই পছন্দ করেছিল বেশি। এই ধরনের দরকারি কাজ শ্রীকান্ত যে কত মানুষের জন্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কয়েকটা বোকা গবেট হুমকি দিতেই এ বাড়ির লোক এত ঘাবড়ে গেল কেন, বুঝতে পারছে না কাবিলকু। সকলেই মনমরা, পৌষ লক্ষ্মীর পুজোও হবে নমো নমো করে। ক'দিন ধরেই এদের বাড়িতে ধানসেদ্ধ, মুড়িভাজা হচ্ছে না। কাজটা রতনের মা করে, হাত লাগাতে দেয় না কাবিলকুকে। রতনের মাকে দেখা যাচ্ছে না এ বাড়িতে। ওকে কি আসতে বারণ করল কেউ? পার্টির লোক আসতে দিচ্ছে না, নাকি এরাই মানা করেছে? গোয়াল কাড়তে ঢুকেছিল ঝাঁটা হাতে। ওখানেই শুনতে পায় গানটা— সুজন মাঝি যেদিন তুমি লিখবা তুমার... সুরের টানে গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল কাবিলকু। গানটা ওষুধঘর থেকে ভেসে আসছে টের পেয়ে অবাক হয়েছিল খুব। উঁকি মেরে দেখেছিল শ্রীকান্ত চেয়ার-টেবিলে বসে হাতে মোবাইল নিয়ে গান শুনছে। শ্রীকান্তকে ওভাবে কখনও গান শুনতে দেখেনি কাবিলকু। ফোনটাও বোধহয় শ্রীকান্তর নয়, দুলাল কিংবা চন্দ্রিমার হবে। শ্রীকান্তর পুরনো ফোনে গান বাজে বলে মনে হয় না। তার চেয়েও বড় কথা, বাড়ির যা পরিস্থিতি, তাতে কি এভাবে বসে বসে নিশ্চিন্তে গান শোনা যায়? কোথায় একটা গোলমাল লাগছে কাবিলকুর।

"ও কাবিলকু, উঠোন তো সাফ আছে। খামোকা ঝাঁট দিচ্ছ কেন? বাড়ি যাও এবার।"

চন্দ্রিমার ডাকে চটকা ভাঙে কাবিলকুর। ঝাঁটা যথাস্থানে রেখে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। ব্রজলাল মিশ্রর নাতনি দালান ধরে চলল ওষুধঘরে।

ওষুধঘরে ঢুকে চন্দ্রিমা বাবাকে বলল, "গান শোনা হল তোমার? দুলাল তো এবার বেরবে, মোবাইলটা দাও।"

সুইচ টিপে গান বন্ধ করলেন শ্রীকান্ত। ফোন সেটটা মেয়ের বাড়ানো হাতে দিয়ে দিলেন। ঘর ছেড়ে চলে গেল চন্দ্রিমা। দুলাল তার জ্যাঠাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে, ফোনসেটটা নিজে চাইতে আসতে পারেনি, দিদিকে পাঠিয়েছে। কিন্তু এত সকাল-সকাল দুলাল যাবে কোথায়? অন্যদিন তো ন'টা-দশটার আগে ঘুমই ভাঙে না তার। সরকারের পার্টি জরিমানা ধার্য করার পর থেকেই বাপবেটা মিলে ছুটোছুটি করছে খুব। বিভিন্ন মহলে মিশে নিজেদের সমর্থনে লোক জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃথাই এই প্রয়াস। সাধারণ মানুষ ক্ষমতার দিকেই ঝুঁকে থাকে। গ্রামের দিকে এই প্রবণতা প্রবল। শহর তুলনামূলক নিরাপদ। হাতের কাছে থানা-পুলিশ, সংবাদমাধ্যম আছে। কিছু ঘটানোর আগে পার্টির গুন্ডারা দু'বার ভাববে। গ্রামের দিকে ভাবাভাবির বালাই নেই। পার্টিই এখানে প্রশাসন। শ্রীবাস-দুলাল যে চেষ্টাটা চালাচ্ছে, তা প্রায় বাতাস খামচে ধরার সামিল। সকলে ক্ষমতার হয়েই কথা বলবে। বাম জমানার শেষ কয়েক বছর গ্রামের পরিস্থিতি এমনটাই হয়ে পড়েছিল। সমর্থনের বিনিময়ে পাইয়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছিল পার্টি। এইসব লক্ষ্য করেই শ্রীকান্ত পার্টির সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। করার আগে বেশ কয়েকবার সুনির্মল নন্দকে জানিয়েছিলেন, গ্রামে পার্টির স্বজনপোষণ, দমননীতি তাঁর পছন্দ হচ্ছে না।

শ্রীকান্তর শিক্ষাগুরু সুনির্মল নন্দ এখন মন্ত্রী। অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলতেন, অনেক গ্রামে এই একই ঘটনা ঘটছে। আমরা যারা মন্ত্রী, তাদের হাজারো কাজ। গ্রাম সংগঠনের ব্যাপারটা তোমাদের মতো কমরেডদেরই দেখতে হবে। তবে আমি সুযোগ পলেই ধুমুরিয়ায় যাব। কথা বলব পার্টির কমরেডদের সঙ্গে।

সেই অবসর তিনি পাননি। ভোটের আগে গ্রামে সভা করতে এসেছেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাল-ভাল কথা বলেছেন, ভুলভ্রান্তির প্রসঙ্গগুলোও তুলেছেন। ভাষণ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে উনি গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, পার্টি কর্মীদের দাপট এতটুকু কমেনি। ক্ষমতার অপব্যবহার চালিয়ে গিয়েছে আগের মতোই। সুনির্মল নন্দের বার্তা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করেনি। অর্ধেক কথার মানেই বোঝেনি তারা। কমিউনিজম তো দূরের ব্যাপার, কত নিপীড়ন সহ্য করে, গণ আন্দোলন গড়ে তুলে এই রাজ্যে পার্টি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেই ইতিহাসটুকু জানা নেই এদের অনেকেরই। এরা বাম সর্মথকদের ঘরে জন্মেছে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনেছে আমরা প্রভু। কেউ এদের বোঝায়নি প্রভুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই পার্টিটার মূলনীতি। বুঝদার লোকজন তো পার্টির মাথার দিকে উঠতে শুরু করেছে। পদ আঁকড়ে থাকতে হলে জনসমর্থন চাই। পার্টি কর্মীদের ভুলগুলো শুধরে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন শ্রীকান্ত। সফল হননি। কারণ, তার হাতে শুধু তত্ত্ব আর তথ্য ছিল। জীবিত আদর্শবান বড় কোনও নেতার উদাহরণ ছিল না। পার্টির ছেলেরা শ্রীকান্ত মিশ্রের মতো নীচের তলার নেতার কথা শুনবে কেন? বড় নেতাদের আদবকায়দা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। দিনে-দিনে দৌরাত্ম্য বেড়েছে তাদের। পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটিতেও হস্তক্ষেপ করেছে। পঞ্চায়েতের সেটা সহ্য হল না। নিজেদের আধিকার কায়েম করতে গ্রামের ছোটখাটো গোলমালেও নাক গলাতে শুরু করল। পঞ্চায়েত মানেই পার্টির রং। সমাধান দেওয়া হত পার্টির স্বার্থ মাথায় রেখে। ভেদাভেদ শুরু হয়ে গেল গ্রামের মধ্যে। ভাঙন ধরল বহু পরিবারে। যেহেতু সরকারের দলের পঞ্চায়েত, ক্ষমতার দম্ভে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকল তারা। দলের সমর্থক নয় এমন কেউ যদি সামান্য অপরাধ করত, তার খেতের ফসল কেটে নিত। মুরগির পোলট্রিতে ধরিয়ে দিত আগুন। বিরোধী পার্টির পরিবারকে একঘরে করে দিত। গ্রামের কোনও দোকান কিছু বিক্রি করতে পারবে না তাকে। ছুতোনাতায় মারধরও বাদ যেত না। এরকম বহু ঘটনা থেকে কর্মীদের নিরস্ত করতে শ্রীকান্ত দৌড়ে গিয়েছেন। পার্টির ছেলেরা তাঁর কথা শুনত না। শ্রীকান্ত মিশ্রর এক্তিয়ার নিয়ে কথা তুলত। পঞ্চায়েত প্রধান নন। ক্রমশ পার্টির সংস্রব ত্যাগ করলেন শ্রীকান্ত। ডাক্তারি সেবাতেই মনোনিবেশ করলেন। তাতে এক ধরনের মানসিক শান্তি পেতেন। বেশ ক'বার পার্টি থেকে রিজাইনের কথা মাথায় এসেছে। পিছিয়ে এসেছেন। মনে হয়েছে, খুব শীঘ্রই পার্টির নেতাদের হুঁশ ফিরবে। নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেবেন। পার্টি নিশ্চয়ই শুদ্ধিকরণের রাস্তায় হাঁটবে। ইতিমধ্যে নতুন কংগ্রেস মাথাচাড়া দিয়ে উঠল গ্রামে। শহরে তারা ছিলই আরও বেশ কিছু পার্টির মতো। বিরোধী পার্টির অস্তিত্ব না থাকলে গণতন্ত্রের সাজগোজ সম্পূর্ণ হয় না। তাই শহরে শিক্ষিত মানুষদের সামনে গণতন্ত্রের একটা বাতাবরণ তৈরি করে রাখতেই হয়। বাম আমলের শেষ ক'বছর নতুন কংগ্রেস অত্যন্ত দ্রুত হারে গ্রামাঞ্চলে তাদের সমর্থক সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল। ভিত যে আলগা হয়ে যাচ্ছে উপরতলার বাম নেতারা প্রথমে টের পাননি। তার দু'টি কারণ। এক, গ্রামের দিকে নজর ছিল না তাদের। পার্টি কর্মীরা যে রিপোর্ট পাঠাত, তার ওপর বিশ্বাস রেখে সরকারের নীতি নির্ধারণ করতেন। অবিশ্বাস করলে যে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছতে

Scanned with CamScanner

হয়। গ্রাম জার্নি বড় ধকলের। দ্বিতীয় কারণটা হল, নতুন কংগ্রেসের সমর্থক বাড়তে থাকাটা গ্রামের বাম নেতা উপরে জানাতে চাইত না। পাছে নিজেদের পদ খোয়াতে হয়। টিকে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে নতুন কংগ্রেসের আগ্রাসন রোখার চেষ্টা চালাল। বাম পার্টি কর্মীরা যে তাণ্ডবটা চালাল নতুন কংগ্রেসের সমর্থকদের উপর, তা নজিরবিহীন। ঘর ভেঙে দিচ্ছে, টিভি আছড়ে ফেলছে। খাট-বিছানা ভাসছে পুকুরের জলে। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল তারা। শ্রীকান্ত জানতেন প্রত্যাঘাত আসবে। অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে বঞ্চিতরা সংঘবদ্ধ হবেই, চিরকাল হয়ে এসেছে। গ্রামের ভোটে দল ক্ষমতায় আসে, এটা অন্য দলগুলোর মতো নতুন কংগ্রেসও জানে। নতুন কংগ্রেস পূর্ণ উদ্যমে গ্রামের বঞ্চিতদের মুখে ভাষা জোগাতে লাগল। গ্রামে থাকার কারণে শ্রীকান্ত টের পেয়েছিলেন বাম সরকারের বিদায় আসন্ন। নতুন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল 'বদলা' শহরের দিকে তেমন না ঘটলেও, গ্রামে গ্রামে আছড়ে পড়ছে। শহরে ঘটলে মিডিয়া প্রচার করবে খবরগুলো, নাগরিক সমাজ ধরে ফেলবে নতুন কংগ্রেসের দ্বিচারিতা। গ্রামের খবর মিডিয়ায় পৌঁছতে-পৌঁছতে বাসি হয়ে যায়। সংবাদমাধ্যম সবসময় টাটকা খবর পছন্দ করে। গ্রাম নিয়ে নাগরিক সমাজের মাথাব্যথা কম। বদলা নেওয়া শুরু হল ধুমুরিয়ার আশপাশের গ্রামে। দু'-চারদিন অন্তর একটা না একটা খবর আসতে লাগল কানে। খারাপ লাগত, বিষণ্ণবোধ করতেন শ্রীকান্ত, তখনও নিজেকে নিয়ে কোনও আশঙ্কার সঞ্চার হয়নি মনে। এখন তো আর রাজনীতির সাতে-পাঁচে থাকেন না তিনি। প্রফুল্ল, গৌর মার খেতেই বুঝে যান রেহাই পাবেন না। শাস্তির খাঁড়া তাঁর উপর পড়বেই। দুই সহচরকে মেরে ওরা বার্তা পাঠিয়েছে, শ্রীকান্ত মিশ্র, তুমি এখন পঙ্গু। তোমাকে মারতে এলে পিঠ পেতে দাঁড়ানোর মতো যে দু'জন ছিল, তাদের আমরা শুইয়ে দিয়েছি।

খতিয়ে দেখলে শ্রীকান্তর এই শাস্তি প্রাপ্য। চোখের সামনে নিজের পার্টির ছেলেদের গুণ্ডামি দেখেছেন, কিছু করে উঠতে পারেননি। পদত্যাগও করেননি দল থেকে। অর্থাৎ সমস্ত দৌরাত্ম্যে তাঁরও সায় ছিল। একসময় তাঁর দল শাস্তি দিয়েছে, দলের একজন হয়ে এখন সেটা ফেরত নিতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে ব্যাপারটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু প্রহার তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সইতে পারবেন ওই মার? মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে প্রফুল্ল, গৌরের। মারের চোটে হাত-পায়ের হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। ভেঙে দিয়েছে অদৃশ্যে থাকা মনটাকেও, এতটুকু জোর আর অবশিষ্ট নেই।

শ্রীকান্তর দেখাদেখি ওই দু'জনও কিন্তু পার্টির কাজে অ্যাকটিভ ছিল না। প্রকাশ্যেই সমালোচনা করত এতদিন ধরে করে আসা পার্টিটার। তা সত্ত্বেও ওদের উপর জরিমানা ধার্য হল পাঁচ লাখ টাকা করে। যাদের পাঁচ বিঘে করে জমি নেই, নিজের জমি ছাড়াও পরের জমিতে কাজ করে সংসার খরচ চালায়, তারা ওই পরিমাণ টাকা দেবে কোথা থেকে? স্কুলবাড়িতে ডেকে নিয়ে যেদিন ওদের নিদান দিয়েছিল নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা, দু'জনেই বলেছিল, অত টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সেটা তোমরাও জানো। মারধর যা করার আজই করে নাও। উত্তরে নতুন কংগ্রেসের ক্যাডাররা বলে, যাও, নেতাদের গিয়ে ধরো। বলো তোমাদের বাঁচাতে। এত বছর ধরে তো ওদের কথা শুনে নানান অপকাণ্ড করেছ। দশদিন সময় দিলাম, এর মধ্যে টাকা চাই।

সময়টা দিয়েছিল টেনশনে রাখার জন্য। মারার আগেই মনোবল যাতে অর্ধেক হয়ে যায়। আরও একটা কারণও ছিল, টেনশনের চোটে এরা যদি পরিবার নিয়ে পালায়, ফেলে যাওয়া ঘর-জমি দখল করা যাবে সহজে। ছোট-বড় কোনও নেতার সঙ্গেই পরিচয় নেই প্রফুল্ল, গৌরের। জরিমানার নিদান মাথায় নিয়ে শ্রীকান্তর কাছেই এসেছিল। বলেছিল, দাদা, তুমি কিছু করো। বাঁচার কোনও পথই খোলা রাখেনি এরা।

শ্রীকান্ত ফোন করলেন সুনির্মল নন্দকে। বেজে গেল, কেউ ধরল না। মেদিনীপুরে মাঝারি ধরনের এক নেতাকে ফোনে পাওয়া গেল। উনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন, তাঁর পক্ষে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়।

দেখতে-দেখতে দশটা দিন কেটে গেল। তেরোদিনের মাথায় প্রফুল্ল, গৌরকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে মারল নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা। শ্রীকান্ত খবর পেলেন দেরিতে। রুগি দেখতে পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা শোনামাত্র দৌড়ে গিয়েছিলেন অকুস্থলে, স্কুলবাড়ি। ক্লাসরুমে রক্তের ছাপ। পার্টির গুণ্ডাবাহিনী গৌর, প্রফুল্লকে নিয়ে গিয়েছে বিশ মাইল দূরে শহরের হাসপাতালে। নিজেদের বাঁচার রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই গিয়েছে। আহতের বাড়ির লোক যদি হাসপাতালে নিয়ে যেত, পুলিশকে না জানিয়ে কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা করত না। গুণ্ডাদের নামগুলো নথিভুক্ত হত পুলিশের খাতায়। আক্রান্তকারীরাই আক্রান্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে জানাবার কোনও দরকার নেই। পরের দিন আক্রান্ত দুই সহচরের বাড়িতে গিয়েছিলেন শ্রীকান্ত। প্রায় সারা শরীরেই ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল তাদের। বিছানায় শুয়ে আছে, চোখে অদ্ভুত এক নিভে যাওয়া দৃষ্টি। পর্যায়ক্রমে শ্রীকান্ত দু'জনকেই বলেছিলেন, "গাড়ি ভাড়া করে আনছি। চল, থানায় গিয়ে ডায়রি করি।" দু'জনের একজনও রাজি হল না। তাদের বক্তব্য, ওরা আমাদের মেরে ফেলেনি সেই ঢের। ডায়রি করে শত্রুতা বাড়াব না। বরং বসতভিটেটা যাতে কেড়ে না নেয়, তার জন্য হাতে-পায়ে ধরব। চাষের জমি নেবেই, পরের জমিতে কাজ করে পেট চালাব। শ্রীকান্ত বলেছিলেন, 'তোদের পর এবার আমার পালা। জরিমানা করতে ডেকে পাঠাল বলে। তোদের মতোই তার পরিমাণ হবে এতটাই, যা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমাকেও বেধড়ক পেটাবে।'

প্রফুল্ল, গৌর এবং ওদের বাড়ির লোকেদের মতামত ছিল শ্রীকান্তর মতো মানী লোকের গায়ে হাত তোলার সাহস পাবে না ওরা। গৌর, প্রফুল্লকে মেরে ওরা শ্রীকান্তকে ভয় দেখিয়ে রাখল। যাতে ওদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উনি মুখ না খোলেন। কথাগুলো থেকে কোনও আশ্বাস পাননি শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত মিশ্র রাজনীতিতে পোড় খাওয়া লোক। তাঁর আশঙ্কা মিলে গেল। ক'দিন বাদেই ধরণী জানার ছেলে রিন্টু ওষুধঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ডাক্তার জ্যাঠা, কাল বিকেল তিনটের সময়

সময়টা দিয়েছিল টেনশনে রাখার জন্য। মারার আগেই মনোবল যাতে অর্ধেক হয়ে যায়। আরও একটা কারণও ছিল, টেনশনের চোটে এরা যদি পরিবার নিয়ে পালায়।

আমাদের পার্টি অফিসে আসবেন। নেতারা ডেকে পাঠিয়েছেন।''

বুকটা ধড়াস করে উঠলেও, বাইরে সেটা প্রকাশ হতে দেননি শ্রীকান্ত। মাথা ঠান্ডা রেখে স্বাভাবিক স্বরে জানতে চেয়েছিলেন, ''কেন ডেকে পাঠিয়েছে রে? হঠাৎ কী দরকার পড়ল?''

''পার্টি অফিসে গিয়ে শুনে নেবেন।'' বলে দালান থেকে নেমে গিয়েছিল রিন্টু। খানিক বাদেই, মানে ভিটের চৌহদ্দি পেরোতে রিন্টুর যতটা সময় লেগেছিল, বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসতে লাগল দু'বউয়ের চাপা কান্নার আওয়াজ। বড় বউ সহজে কাঁদে না। হুমকি আসার আশঙ্কায় থেকে থেকে তার মনটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শ্রীবাসের বউ তো সামান্য

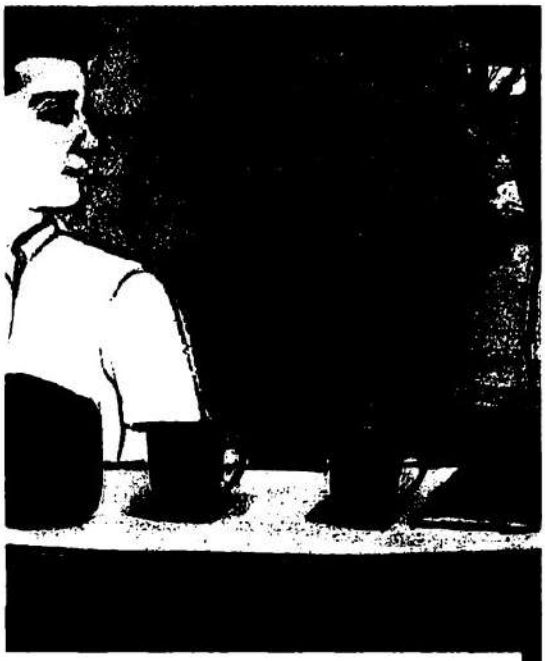

সেই মুহূর্তে অদ্ভুতভাবে মাথাটা শান্ত হয়ে এসেছিল শ্রীকান্তর। ঠিক যেমন ফাঁসিকাঠে ওঠার আগে আসামির মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়। যা হওয়ার, তা তো হবেই।

কারণেই কাঁদে। শ্রীবাস বোধহয় শুয়েছিল ঘরে। খবর শুনে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলে গেল?'

রিন্টু যা বলেছে, বললেন শ্রীকান্ত। মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ভাইয়ের। দালানে অস্থির পায়চারি শুরু করল। মাঝে মাঝে বলে উঠছিল, ''এখন তা হলে কী করা যায়?''

চোখে মুখে একরাশ চিন্তা নিয়ে দুলাল, চন্দ্রিমা এসে দাঁড়িয়েছিল দালানে। বাবাও বেরিয়ে এসেছিলেন। এগিয়ে আসছিলেন ওষুধঘরের দিকে। কুঁজো হয়ে গিয়েছেন, হাঁটতে কষ্ট হয়। বৃদ্ধ পিতার উদ্বিগ্নতা দেখে নিজেকে বড় অপদার্থ মনে হয়েছিল শ্রীকান্ত মিশ্রর। দালানে এসে বাড়ির সকলের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''এখনই এত ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি। কাল যাই, শুনি কী বলে। প্রথমেই তো আর মারধর করবে না।''

''তোমাকে ডেকেছে মানে যে একা যেতে হবে তার তো কোনও মানে নেই। আমি, দুলাল সঙ্গে যাব।'' বলেছিল শ্রীবাস।

এই কথার সূত্রে শ্রীকান্ত মিশ্রর মাথায় একটা প্ল্যান এসেছিল। বলেছিলেন, ''একটা কাজ করা যেতে পারে, আমার বদলে দুলাল যাক ওদের পার্টি অফিসে। বলুক, জ্যাঠা রুগি দেখতে বেরিয়ে গিয়েছে। যা বলার আমাকে বলুন, জ্যাঠাকে জানিয়ে দেব। এতে খানিকটা হলেও গুরুত্ব বাড়বে আমার। পাত্তা না দেওয়াটা দেখে ওরা ভাববে শাস্তি আটকানোর ব্যবস্থা হয়তো আমি করে ফেলেছি। যেমন ইচ্ছে জরিমানা করার আগে দু'বার চিন্তা করবে। জরিমানার পরিমাণটা কমিয়ে আনতে পারে।''

সকলে হয়তো চিন্তা করছিল শ্রীকান্তর পরিকল্পনা কতটা কাজে আসবে, নীরবতা ভেঙে দুলাল বলে উঠেছিল, ''তুমি একেবারে উচিত কথা ভেবেছ জেঠু, আমিই যাব কাল।''

পরের দিন দুলাল যখন পার্টি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, শ্রীকান্ত বলেছিলেন, ''ওদের সঙ্গে কোনওরকম তর্কে জড়াবি না। জড়ানোর চেষ্টা করবে ওরা। দু'-চার ঘা মারার সুযোগ খুঁজবে। যা বলবে, সবেতে ঘাড় নাড়বি। চলে আসবি।''

নীরব থেকে ঘাড় কাত করেই উত্তরটা দিয়েছিল দুলাল। শ্রীকান্ত সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। চলে গিয়েছিলেন বাঁধের ধারে। ভেবেছিলেন নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলে মন শান্ত হবে। নদীর জল স্থির ছিল। মন করছিল ছটফট। বেশি সময় বাইরে থাকতে পারেননি। ফিরে এসেছিলেন বাড়িতে। দুলাল তখনও ফেরেনি। ওর প্রতীক্ষায় বাড়ির সকলেই দালানে।

শ্রীকান্ত ওষুধঘরে গিয়ে বসতে যাবেন, তিনিই প্রথমে দেখলেন দুলালকে। উসকো খুসকো চুল, মাথা নিচু করে ফিরে আসছে দুলাল। সত্যিই ওকে দু'-চার ঘা দিল নাকি? বুদ্ধি করে বাইক চেপে পার্টি অফিসে যায়নি দুলাল। পাছে ওদের মনে হয় ডাঁট দেখানো হচ্ছে। বাইকটা কেড়ে রেখে দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।

উঠোনের মাঝামাঝি পৌঁছতেই হতাশা দুলালকে যেন ঘাড় ধরে বসিয়ে দিচ্ছিল। নিজেকে কোনওক্রমে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দালানে। মাথার চুলে দু'হাতের আঙুল ঢুকিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল উঠোনের দিকে। শ্রীকান্ত ছাড়া বাড়ির সকলে ওকে ঘিরে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ''কী রে, কী হল? কী বলল ওরা?''

কোনও উত্তর নেই। শ্রীবাস ছেলের গা ধরে নাড়া দিতে দিতে একই প্রশ্ন করে যেতে লাগল। দুলাল নিজেকে আর সামলাতে পারল না। পাশেই দালানের খুঁটিটাতে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে বলতে লাগল, ''আমাদের সব কেড়ে নেবে, সব। কোনও ছাড়ছোড় নেই। ভিখিরি করে দেবে।''

শ্রীবাসের বউ অনেক চেষ্টা করল ছেলেকে শান্ত করতে। পারল না। কান্না আর প্রলাপের মধ্যে থেকে বার করা গেল জরিমানার পরিমাণ, সময় পনেরো দিন। সেই মুহূর্তে অদ্ভুতভাবে মাথাটা শান্ত হয়ে এসেছিল শ্রীকান্তর। ঠিক যেমন ফাঁসিকাঠে ওঠার আগে আসামির মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়। যা হওয়ার, তা তো হবেই। ওই অবস্থায় একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর বাবা দালান থেকে নেমে গিয়ে বাড়ির দেওয়ালের কোনও-কোনও জায়গা হাত দিয়ে ঘষছেন।

আপাত বিচ্ছিন্ন ওই আচরণটা আসলে কী, বুঝতে বেশিক্ষণ লাগেনি শ্রীকান্তর। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল এই বাড়িতে একটা ফলক লাগানো হোক। ফলকে লেখা থাকবে, 'শৈলজা ভবন'। মায়ের নাম। মা বেঁচে থাকতে লাগাতে দেয়নি। চকখড়ি দিয়ে বাড়ির এ দেওয়াল, সে দেওয়ালে বাবা 'শৈলজা ভবন' কথাটা লিখতেন। মা দেখতে পেলেই মুছে দিত। আবছা যে ক'টা লেখা ছিল, বাবা সেগুলোই চেটো দিয়ে ঘষে মুছছিলেন। শ্রীকান্ত বাবার কাঁধ ধরে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দালানে। বলেছিলেন, ''এখনই এত হতাশ হওয়ার কী আছে! পনেরোটা

দিন আছে তো হাতে। দেখি না, কী করা যায়।''
পনেরো দিন কেটে গেছে। আজ আঠেরো দিন। কিছুই করা যায়নি। এখনও অবধি ডাকেনি ওরা। যে কোনও সময় ডাক আসতে পারে। মারধরটা মোটামুটি শেষ বিকেলেই করে। সন্ধে নামলে পাপ অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায় অন্ধকারে। পার্টি অফিসে ডেকে জরিমানা ধার্য করা হয়, মারধর করার জন্য বেছে নেওয়া হয় স্কুলবাড়িটা। পার্টি অফিসে মারার কোনও প্রমাণ রাখে না। প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম কোনও শাস্তির ঘটনায় বিশেষ উদ্যোগ নিলে পার্টি অফিস নজরে চলে আসবে। শাস্তির দায় নিতে হবে পার্টিকে। স্কুলবাড়িতে মারলে পার্টির ছেলেরা বলতে পারবে, কারা মেরেছে আমরা কী জানি!
শ্রীকান্ত ঠিক করে রেখেছেন গুণ্ডাগুলো যখন তাঁকে স্কুলবাড়ির দিকে নিয়ে যাবে, বলবেন, আমাকে স্কুলবাড়িতে মেরো না। অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে মারো। যেখানে খুশি।
প্রফুল্ল, গৌরকে মারার আগে আরও দু'জনকে স্কুলবাড়িতে মেরেছে ওরা। ঘটনাস্থল দেখতে যাননি শ্রীকান্ত। ব্যাপারটায় নাক গলিয়ে নতুন কংগ্রেসের বিরাগভাজন হতে চাননি। দুই পার্শ্বচর মার খাচ্ছে শুনে বাড়িতে তো আর বসে থাকা যায় না, স্কুলবাড়ি গিয়ে দেখেছিলেন রক্তের দাগ। মন্দিরে ওই দাগ দেখলেও, এত আঘাত পেতেন না শ্রীকান্ত। যেখানে বাচ্চারা লেখাপড়া করে, মানবসম্পদ গড়ে উঠছে, ওই পবিত্রস্থানে রক্তের দাগ সহ্য করা বড় কঠিন। সেই কারণেই শ্রীকান্ত বলবেন, আমাকে অন্তত স্কুলবাড়িতে মেরো না।
বাম আমলের শেষ পাঁচ-ছ'বছর এ গ্রামে শাস্তি, জরিমানার ঘটনা ঘটেছে। সামান্য অপরাধে অনেক সময় কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ একটাই, সে বাম সমর্থক নয়। দান উলটে গিয়েছে। শ্রীকান্ত এবং তাঁর দুই পার্শ্বচর বাম-পার্টি করতেন। কোনও অপরাধ না করলেও, শাসক দলে থাকাটাই একটা মস্ত অন্যায়। খানিকটা দায়ভার তো নিতে হবে এই তিনজনকে।
ওরকম বীভৎসভাবে মারলে কতটা লাগে, জানার জন্য গত সতেরো দিনে বেশ কয়েকবার প্রফুল্ল, গৌরের কাছে গিয়েছেন শ্রীকান্ত। প্রফুল্ল বলেছে, প্রথম চার-পাঁচ ঘা ভীষণ লাগবে। মনে হবে প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল। তারপরই এমন অবশ হয়ে যাবে শরীর, তুমি কিছু টেরই পাবে না। গৌর বলল অন্য কথা, প্রতিটা মার আমি মনে রেখেছি, গুনে রেখেছি। সারাক্ষণ ভেবে গিয়েছি মরে গেলে চলবে না। যে করে হোক বেঁচে থাকতেই হবে। দিন আমাদেরও আসবেই। তখন সুদ সমেত ফেরত দেব। মার খাওয়ার পর নিজের মনের অবস্থা কেমন হবে, জানেন না শ্রীকান্ত। চিন্তা একটাই, যারা মারবে তারা একেবারেই আনাড়ি। বেজায়গায় মেরে দিলে হয় মরে যাবেন, নয়তো বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে। প্রফুল্লর আঘাত খুব একটা সুবিধের ঠেকছে না গ্রামের ডাক্তার শ্রীকান্ত মিশ্রর।
উঠোনে মোটরবাইক স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ। চিন্তায় ছেদ পড়ল। শ্রীকান্ত দেখলেন বাইক চালিয়ে বেরিয়ে গেল দুলাল। কী ব্যাপার, এত দেরি করল কেন? চন্দ্রিমা তো অনেকক্ষণ হল ওর মোবাইলটা নিয়ে গিয়েছে। বলল এখনই বেরবে দুলাল। ছেলেটা অবশ্য বরাবরই অলস প্রকৃতির। সব কাজেই দেরি। যেমন মোবাইলের গানটা জোগাড় করতেই চারটে দিন লাগিয়েছে। তাও দুটো গানের জায়গায় একটা গান। খড়্গপুর গেলেই বিহান মুখার্জির লেখা দুটো গান পাওয়া যেত। বেলদা থেকে একটা নিয়ে এসেছে। তবু ভাল, এত নিরাশার মাঝে ওই গানটাই যেন একটু ভরসা জাগাচ্ছিল। গানের কথাগুলোর মধ্যে ভরসার জায়গাটা খুঁজছিলেন শ্রীকান্ত। এত বড় বিপদের সময় শ্রীকান্ত মিশ্রর একটা প্রাপ্তিও হয়েছে, তাঁর রোগা শান্ত মেয়েটা তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাড়ির সকলকে। চন্দ্রিমাকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন আধুনিক সময়টাকে বুঝতে। কলেজের ওই ক'বছর মেয়েটা যে পরিধিটা এমন বাড়িয়ে নিতে পারবে, শ্রীকান্ত স্বপ্নেও ভাবেননি। দুলাল নতুন কংগ্রেসের থেকে ফরমান নিয়ে আসার পর একদিন বলল, ''দাঁড়াও, কথাকলিকে একটা ফোন করে দেখি। ওর বাবা খুব বড় উকিল। যদি আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন।''
উকিলবাবু কোনওরকম সাহায্য করতে পারেনি। মেয়ের সেই বন্ধু তখন তার এক কবি-বন্ধুর কাছে সাহায্য চায়। তিনিই বিহান মুখার্জি। বয়স অল্প হলেও, এখনই বেশ খ্যাতিমান। মিডিয়ার লোকজন তাঁকে খুব চেনে। বিহান মুখার্জির কথাতেই গত ক'দিন ধরে এ বাড়ির উঠোনে সাংবাদিকদের বাইকের চাকার দাগ পড়ছে। সংবাদ প্রবাহ কাগজের জেলা সাংবাদিক পথিক পাত্র এই নিয়ে তিনবার ঘুরে গেল। ওই দাগগুলো এখন শ্রীকান্তর জন্য লক্ষ্মণরেখা। ডিঙোতে ভয় পাবে নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা।
দু'জন দুই বড় খবরের কাগজের সাংবাদিক, একজন টিভির, একদম এক নম্বর চ্যানেলের। তিনজনেই একজন করে বন্ধু নিয়ে আসছে বাইকের পিছনে বসিয়ে। বাইরের জগতের ছ'জন উপস্থিত হয়েছে শ্রীকান্তকে জরিমানার ঘটনায়। এরা এমন জগতের লোক, নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা কোনও অজুহাতেই এদের পথরোধ করতে পারবে না। বদনাম হবে শাসকদলের। সাংবাদিক নিগ্রহ তো মারাত্মক ঘটনা। তিন সাংবাদিক নিজেদের ফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছে শ্রীকান্তকে। বলেছে, ''এটা শুধু আপনার কাছে রাখবেন না। বাড়ির অন্যদেরও দিয়ে রাখুন। ওরা যদি আচমকা অ্যাটাক করে, আপনি হয়তো ফোন করার সুযোগ পাবেন না। বাড়ির কারও থেকে ফোন পাওয়া মাত্রই চলে আসব।''
তিনটে নাম্বার বাড়ির সকলকে দেখিয়ে দেওয়াল ক্যালেন্ডারে বড় বড় করে লিখে রেখেছেন শ্রীকান্ত। যে মানুষটার জন্য সাংবাদিকদের এত তৎপরতা, তিনি কতটা প্রভাবশালী বুঝতে অসুবিধে হয় না। ফোনে কথা হয়েছে একবার। অত্যন্ত আন্তরিক ব্যবহার। কোনও আত্মীয়তা নেই, পূর্বপরিচয় নেই, কেন তবে প্রত্যন্ত গ্রামের একজন বয়স্ক মানুষকে বাঁচানোর জন্য এতটা করছেন বিহান, মাথায় আসছে না। ফোনে কথা বলার সময় শ্রীকান্ত মিশ্র এক ফাঁকে জানতে চেয়েছিলেন, বাম পার্টি করেন কিনা? বিহান বললেন, কোনও পার্টিই করি না। ...তা হলে কেন উনি শ্রীকান্ত মিশ্রকে বাঁচানোর জন্য এত উদ্যোগ নিচ্ছেন? যেখানে নিজের পার্টির লোক কিছু করছে না। মানুষটার সম্বন্ধে বিশদে জানতে ইচ্ছে করছে শ্রীকান্তর। সাংবাদিক পথিক তবু খানিকটা আইডিয়া দিতে পেরেছে বিহান মুখার্জির ব্যাপারে। বলেছে বিহানদা খুব বড় মাপের কবি। আমি ওঁর লেখার ভীষণ ভক্ত। গান লেখার পর থেকেই ওঁর নাম সবাই জেনে গেছে। দুটো গান বাজারে রমরমিয়ে চলছে। দুটোর একটা গান আজ শুনলেন শ্রীকান্ত। পথিক কাল বলে গেছে বিহান মুখার্জির কবিতা এনে পড়াবে। এতে যদি মানুষটার সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। পথিকের যে এ বাড়িতে তিনবার আসা হয়ে গেল, তা কিন্তু বিহান মুখার্জিকে শ্রদ্ধা-ভালবাসার কারণেই। অথচ মানুষটাকে সে চোখেই দেখেনি। শ্রীকান্তও বিহান মুখার্জিকে না দেখে ওঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন।
দালান ধরে ওষুধঘরের দিকে এগিয়ে আসছে চন্দ্রিমা। স্নান করে শাড়ি পরেছে। স্কুলে যাবে পড়াতে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

বলল, "বাবা, বেরোচ্ছি।"
শ্রীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, বিহান মুখার্জির বয়স কীরকম হবে?"
"কেন, বয়স জেনে কী করবে?"
"না, বলছিলি তোর বন্ধুর বন্ধু, তাহলে তো বেশি বয়স নয়। এখনই এত চেনাজানা, সোর্স করে ফেললেন কী করে?"
"আমাদের চেয়ে বছর চার-পাঁচেকের বড়ই হবে।"
"খুব কইয়ে-বলিয়ে নাকি? দেখতে শুনতে কেমন?"
"ভাল।" বলে দরজার সামনে থেকে সরে গেল চন্দ্রিমা। রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করল স্কুলের উদ্দেশ্যে। বাবা যেন বড্ড বেশি নির্ভর করে বসছে বিহানদার উপর। অলক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করা হয়ে যাচ্ছে মানুষটার প্রতি। শেষমেশ বিহানদা যদি সব কিছু সামলে না উঠতে পারে, এ বাড়ির লোকেদের কাছে ছোট হয়ে যাবে। চন্দ্রিমাদের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য যা ব্যবস্থা এখন অবধি করা হয়েছে, বিহানদার পক্ষে তা অবিশ্বাস্য। শান্তিনিকেতনের ট্রিপে মানুষটাকে ভাল মতোই লক্ষ করেছিল চন্দ্রিমা, একেবারেই শান্ত, নির্বিরোধী ধরনের। নিজেকে জাহির করার কোনও চেষ্টাই নেই, যা ওই বয়সি ছেলেরা হামেশাই করে থাকে। ওরকম একজন এত সোর্সফুল হয়ে উঠল কীভাবে, বোঝা যাচ্ছে না। এটা ছাড়াও আর একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছে চন্দ্রিমা, কথাকলি কোন অধিকারে বিহানদাকে এই কাজে নিয়োগ করল? বিহানদা কথাকলিকে ভালবাসত, প্রোপোজ করার আগেই কলি জানিয়ে দিয়েছিল, সে এনগেজড। বিহানদার সঙ্গে বন্ধুত্বে অবশ্যই রাজি। চন্দ্রিমা কখনওই বিহানদাকে বন্ধুত্বের বেড়া ডিঙোতে দেখেনি। কলির পাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়নি অকারণে। বসন্তোৎসবের আগের দিন শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিল চন্দ্রিমারা। কথাকলিদের গাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। পরের দিন অনুষ্ঠানের ভিড় দেখে কলির হাঁসফাঁস অবস্থা। বলছিল, আমি আর এখানে এক মুহূর্ত কাটাতে রাজি নই। অন্য কোথাও চলে যাই চল। বিহানদাকে বলছিল, তাড়াতাড়ি একটা নির্জন জায়গা সাজেস্ট করো। থাকা খাওয়ার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা থাকলেই চলবে। বিহানদা ঠিক করল রাজডাঙায় যাওয়া হবে। কোন এক দাদা-বন্ধুর রিসর্ট আছে। শান্তিনিকেতন থেকে রাজডাঙা খুব দূরে নয়। গিয়ে দেখা গেল রিসর্ট কথাটা উপহাস মাত্র। টিনের চালার অযত্নের বাড়ি, গোটা চারেক ঘর, আসবাব নামমাত্র, কারেন্ট নেই, হ্যারিকেন ভরসা। জলের ব্যবস্থা বলতে চাতালের ডিপ টিউবওয়েল। কেয়ারটেকার বাথরুমে জল ভরে দিয়ে যেত। জায়গাটার ভাল কিছুর বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয়, রিসর্টের সামনেই ছিল একটা টিলা। বাকি অংশ ধু ধু প্রান্তর। জনমনিষ্যির দেখা নেই। কেয়ার টেকারের থেকে জানা গিয়েছিল, শেষ একবছরে কোনও টুরিস্ট আসেনি। বিহানদার দাদা-বন্ধু শখ করে রিসর্টটা বানিয়েছিল। সম্পূর্ণ করার আগেই টাকা ফুরিয়ে যায়। অসম্পূর্ণতারও যে একটা অদ্ভুত রূপ হয়, ওখানে দু'রাত কাটিয়ে বুঝেছিল চন্দ্রিমা। দুর্দান্ত সেই স্মৃতি ভোলার নয়। ওখানকার একটা ঘটনায় চন্দ্রিমা বুঝতে পারে কথাকলি কী পরিমাণ ভালবাসে বিহানদাকে। মুখে সেটা স্বীকার করতে পারছে না। যেহেতু সে নির্মাল্যর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কলির বিয়েতে যেতে পারেনি চন্দ্রিমা, স্কুলের পরীক্ষা চলছিল তখন। চন্দ্রিমা ভেবেছিল বিয়ের পর কলি বিহানদার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি করে ফেলবে। নয়তো ওদের দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। বিহানদাও মেনে নেবে সেটা। কলি অসুখী হোক, চাইবে না। কিন্তু তা হল কই! চন্দ্রিমাদের সমস্যায় বিহানদাকেই ঠেলে দিয়েছে কলি। আর একটা খারাপ সংকেত হল, নিজেদের সমস্যা নিয়ে যে ক'বার চন্দ্রিমা ফোন করেছে কলিকে, ও বাপের-বাড়িতে বসে সেটা ধরেছে। বিহানদার জন্য বাড়ি ফিরে এল কিনা, কে জানে! সরাসরি প্রসঙ্গটা না তুলে চন্দ্রিমা তিনবারের ফোনালাপে জানতে চেয়েছিল, "বাপের বাড়িতে বসে আছিস কেন? নির্মাল্য কি অফিসের কাজে বাইরে গেছে?"
"না। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে আমার।" বলল কলি। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রিমার। জিজ্ঞেস করেছিল, "কী নিয়ে ঝামেলা?"
"ফালতু ব্যাপার। পরে শুনিস। আগে নিজেদের সমস্যাটা সামলা।" বলে ফোন রেখেছিল কলি। হয়তো সত্যিই সাধারণ কোনও মন কষাকষি, কলি অভিমান করে চলে এসেছে বাবার কাছে। মাথায় ছিট আছে মেয়েটার। স্কুলের কাছাকাছি এসে পড়েছে চন্দ্রিমা। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালার প্রাইমারি স্কুল, একরাশ বাচ্চা, মিড ডে মিল পাবে বলে অ্যাটেন্ডেন্স-ও ভাল। অধিকারীদের উঠোনে পা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রিমা, কাকা হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসছে। ভীষণ থমথমে মুখ। চন্দ্রিমা ডেকে ওঠে, "ও কাকু, কী হয়েছে? কেউ কিছু বলল নাকি?" উত্তর দিল না কাকা। কথাটা যেন কানেই যায়নি। জোর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বাড়ির উদ্দেশ্যে। নিশ্চয়ই কারওর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছে। নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা কিছু বলল না তো? কাকার মুখচোখ সুবিধের ঠেকল না। স্কুল যাওয়া আপাতত মুলতুবি রাখে চন্দ্রিমা, বাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী হল!

বাড়ির চাতালে পৌঁছনোর আগেই চেঁচামেচির আওয়াজ পাচ্ছিল চন্দ্রিমা। উঠোনে এসে দেখল বাবা, কাকার মধ্যে বিরাট ঝগড়া চলছে ওষুধঘরের সামনে। উৎকণ্ঠায় মুখ শুকিয়ে পাশের দালানে মা, কাকিমা দুজনে দুটো খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বলছে, "তুই এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমি ছাদের তলায় থাকতে পারব না।"
কাকা বলল, "আজ আমার পুজো বন্ধ করতে এসেছিল, কাল খেতের ধান কেটে নিয়ে যাবে। ওদের দলে নাম না লেখালে কী খেয়ে বাঁচব আমরা?"
"ও, এখন যত খাওয়াপরার চিন্তা! এত দিন তো দাদার ঘাড়ে বসে পরিবার সুদ্ধ খেয়েছ। দেখছ, পাঁকে পড়েছে দাদা, পেট বাঁচাতে দাদার বিপক্ষ দলে চলে যাচ্ছিস! নেমকহারাম তুই!" রাগের চোটে তুই, তুমি মিশিয়ে কথা বলছে বাবা। চন্দ্রিমা এবার কাকার কথায় মন দেয়। দালান থেকে উঠোনে নেমে এসে কাকা বলছে, "আমরা শুধু বসে বসে খাই, তাই না? রোদে-জলে মাঠে মাঠে ঘুরে কে চাষের কাজ দেখে? তুমি একবারও যাও ওদিকে? বউদি সংসারে ক'টা কাজ করে? আমার বউ ভোর থাকতে উঠে জোয়াল টেনে চলেছে। দুলালকে দিয়ে বাজার দোকান, ওষুধ কেনানো সবই করাচ্ছ। আমাদের চাকরবাকরের মতো রেখে দিয়েছ তুমি। বলছ ঘাড়ে বসে খাচ্ছি!"
"দুলালকে ব্যবসার জন্য বারে বারে কে টাকা দিয়েছে? বাইরের কাজ করানোর জন্য বাইক কিনে দিইনি? কোন জমিটা আমি একার নামে কিনেছি? টাকা আমার অথচ জমির মালিক তুই, আমি দুজনে। এরপরও বলবি চাকরের মতো দেখি তোদের! তোর মেয়ের বিয়েতে কে দু'হাতে খরচা করেছে?"
"সব লোক দেখানো। ভাগের জমি বিক্রি করার আগে তুমি আমার পরামর্শ নাও? দুলালকে বাইক কিনে দিয়েছ নিজের কাজ তাড়াতাড়ি হবে বলে। স্বাতীর বিয়েতে আড়াই হাজার লোক খাইয়েছ। ভাইঝির বিয়েতে এত খরচা করতে দেখে

লোকে ধন্যধন্য করেছে তোমাকে। ওরা বোঝেনি ডাক্তারির বাজার ধরে রাখতে তুমি পাঁচ গ্রামের লোক খাইয়েছ। স্বাতীর বিয়ের জন্য যে জমিগুলো বিক্রি করেছ, তাতে তো আমারও অর্ধেক অংশ ছিল। আড়ম্বরের জন্য নাম হল শুধু তোমার।"

"ঠিক আছে, সব আমার লোক দেখানো। আর কাউকে কিছু দেখাতে চাই না। বাড়িটা তো আমার, এবার তোরা বিদেয় হ।"

"জানি, এরকম একটা দিন আসবে, অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলাম। তোমার শ্বশুর কম চালাক লোক ছিল না। পণ দিয়েছিল অঢেল, বদলে তোমার একার নামে বাড়িটা রেজিস্ট্রি করতে বলেছিল। তখনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল আমার ভবিষ্যৎ। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, সাংবাদিকদের দিয়ে তুমি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তোমাকে ফাঁসানোর অন্য প্ল্যান খুঁজবে, তখন দেখবে এই রিপোর্টাররাই তোমার বিরুদ্ধে লিখছে। কাউকে পাবে না তোমার পাশে।"

"তুই কী ভাবছিস, ওদের পার্টিতে নাম লেখাচ্ছিস বলে এ বাড়িতে ওসব কাণ্ড করতে সাহস পাবে না? আমার পাশে কাউকে দরকার নেই। নিজেরটা নিজে বুঝে নেব। তোকে একঘণ্টা সময় দিলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।" বাবা ঢুকে গেল ওষুধঘরে। মা, কাকিমা দু'জনেই আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছে। কাকা কাকিমার উদ্দেশে বলে, "ও চাকরানি, কেঁদেকেটে সময় নষ্ট কোরো না। জিনিসপত্র বেঁধে নাও। দেরি করলে ঘাড় ধাক্কা খেতে হবে। কী কী নিচ্ছ বউদিকে দেখিয়ে নিও। পরে আবার চুরির দায়ে দুষবে।"

বড়-বড় পা ফেলে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কাকা। চন্দ্রিমা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বাবা, কাকার মধ্যে এমন ঝগড়া হতে পারে, কোনও দিন ভাবতেও পারেনি। কাকাকে বোঝাতে ঘরের দিকে এগোয় চন্দ্রিমা, দালানে উঠতেই ঠাকুরদা ডাকে, "বোন একবারটি শুনে যা।"

চন্দ্রিমা ঠাকুরদার সামনে যায়। উবু হয়ে বসে থাকা ঠাকুরদা মুখ তুলে বলে, "আমি কী করি বল তো?"

"কী করি মানে?"

"কার কাছে থাকব? আমার উপর তো দু' ছেলেরই সমান অধিকার।"

৫

সাঁতরাগাছির এক ফ্ল্যাটবাড়ির চার তলায় উঠে এসেছে কথাকলি। ছোট কমপ্লেক্স, একটাই বিল্ডিং। লিফটে চেপে এসেছে। নীচে কোনও কেয়ারটেকারের দেখা পাওয়া যায়নি। জীবনে প্রথমবার এখানে এল কথাকলি। যাদের ফ্ল্যাটে এসেছে, তারাও পূর্বপরিচিত নয়। ফ্লোরে চারটে ফ্ল্যাট। যে বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে কথাকলি, নেমপ্লেটে লেখা, অভিজ্ঞান, কবরী, অর্ক। নীচে লেখা সেনগুপ্ত। এই ফ্ল্যাটটার কথাই বলেছিল সুমিতাদি, নির্মাল্যর জ্যাঠতুতো দিদি। ডোরবেল টিপতে ইতস্তত বোধ করছে কথাকলি, চেনাজানা নেই, কীরকম হবে, কে জানে। ঠিকানা চিনে যখন আসতে পেরেছে, ফিরে যাওয়ারও কোনও মানে হয় না। এক পা এগিয়ে বেল টিপে দেয় কথাকলি।

একটু বাদে দরজা খুললেন বছর তিরিশের মহিলা। পরনে হাউজকোট। ভ্রু কুঁচকে বললেন, "বলুন!"

"আমি কথাকলি। আসছি..."

কথার মাঝেই ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "সরি, আমার কিছু কেনার নেই, দেখারও সময় নেই। হাতে প্রচুর কাজ।"

নমস্কারের ভঙ্গিতে পরিচয় দিচ্ছিল কথাকলি, হাত নামিয়ে বলে, "আমি কিছু বিক্রি করতে আসিনি। আপনার কাছে একটা ব্যাপারে হেল্প চাইতে এসেছি।"

"কী হেল্প?"

"জবা আপনার ফ্ল্যাটে কাজ করে তো? ওর সঙ্গে একটু..."

"করত। চারদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। কী দরকার ওর সঙ্গে?"

ভীষণভাবে দমে গেল মন। ভদ্রমহিলা ফের জানতে চাইলেন, "আপনার বাড়িতে কাজ করত নাকি? কোনও গণ্ডগোল পাকিয়েছে?"

প্রায় আঁতকে ওঠার মতো করে কথাকলি বলে, "না না, সে সব কিছু নয়। এখানে ওদের বাড়িটা কোথায় জানেন?"

"জ'গাছার দিকে থাকত। আমি বাড়িটা চিনি না। ওরা এখন চলে গেছে ডোমজুড়ের দিকে, কেশবপুর না কালীতলা, কী যেন নাম জায়গাটার! এখন ঠিক মনে পড়ছে না।"

নমস্কারের ভঙ্গিতে পরিচয় দিচ্ছিল কথাকলি, হাত নামিয়ে বলে, "আমি কিছু বিক্রি করতে আসিনি। একটা ব্যাপারে হেল্প চাইতে এসেছি।"

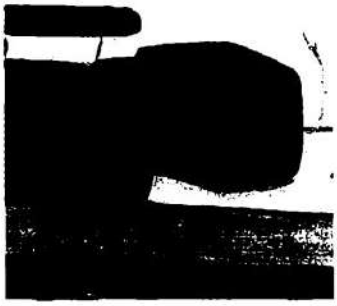

চুপ থেকে একটু ভেবে নেয় কথাকলি। বলে ওঠে, "আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাচ্ছি। জায়গাটার নাম মনে পড়লে প্লিজ আমাকে একটু জানাবেন।"

হাউজকোটের পকেট থেকে মোবাইল বের করলেন মহিলা। বললেন, "বলুন নাম্বারটা। নাম বললেন কথাকলি, তাই তো?"

হাসি মুখে ঘাড় হেলায় কথাকলি। বলে, "আপনি নিশ্চয়ই করবী।"

মাথা নেড়ে সায় দেন মহিলা। অবাক হননি। বুঝতেই পেরেছেন নেমপ্লেট থেকে নামটা আন্দাজ করেছে কথাকলি। কথাকলি নিজের ফোন নাম্বারটা বলল। সেভ করে নিয়ে করবী বললেন, "শুধু জায়গায় নাম জেনে কি আর খুঁজে বের করতে পারবেন? এসব পুলিশ, গোয়েন্দাদের কাজ।"

"হতেও পারে। তবু জায়গার নামটা যদি মনে পড়ে, হাজব্যান্ডকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, হয়তো ওঁর খেয়াল আছে। দয়া করে আমাকে জানাবেন।" বলে ফের নমস্কারের ভঙ্গি করে ঘুরতে যাবে কথাকলি। করবী বলে উঠলেন, "জবাকে কেন এত হন্যে হয়ে খুঁজছেন কিন্তু বললেন না। ও যে আমাদের ফ্ল্যাটে কাজ করত সেটাই বা কার থেকে জানলেন?"

"আমার এক রিলেটিভের থেকে। এই কমপ্লেক্সে এসেছিল কোনও একটা কাজে, জবাকে ঢুকতে দেখেছিল আপনাদের ফ্ল্যাটে। ও তো কোনও অপরাধ করেনি, তাই পুলিশকেও বলতে পারছি না খুঁজে দিতে। জবাকে খোঁজার কারণটা আমি ছাড়া আর সকলের কাছেই অতি তুচ্ছ মনে হচ্ছে। ওকে খুঁজে পাই, তারপর না হয় আপনাকে বলব কেন খুঁজছিলাম। আসি তা হলে।" বলে লিফটের দরজার দিকে এগিয়ে যায় কথাকলি।

কমপ্লেক্সের গেটের কাছে কথাকলির গাড়ি। পিছনের দরজা খুলে উঠে বসে। সিটে শরীর এলিয়ে। অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে অবসন্ন বোধ করে। ড্রাইভার জানতে চাইল, "কোথায় যাব

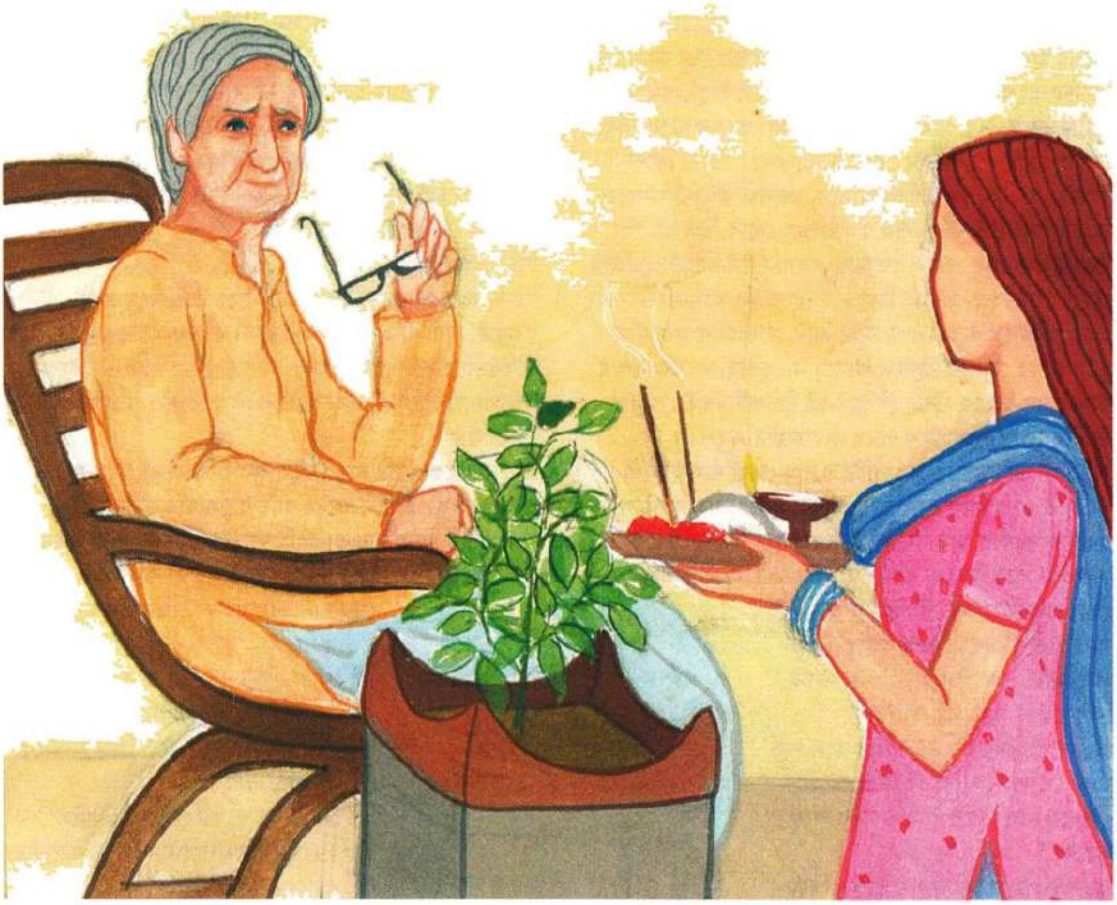

ম্যাডাম?''

''বাড়ি।'' বলে চোখ বন্ধ করে নেয় কথাকলি। জবার সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব জরুরি। একটা ব্যাপারে ক্ষমা চাইবে, কথাকলি জানে যতই অভিমান হোক জবা ক্ষমা করে দেবে তক্ষুনি। কথাকলিকে যে বড্ড ভালবাসত সে। জবার কাছে ক্ষমা চাওয়া নিয়েই কথাকলির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির মনোমালিন্য চরমে ওঠে, কথাকলি রাগ করে বাবার কাছে চলে আসে। একবার হল কী, জবা, জবার মা দু'জনেই ও বাড়িতে কাজ করত, একদিন মা-মেয়ে মিলে ডুব। ছুটির দিন ছিল। দুপুরে প্রথমে খেতে বসেছিল বাড়ির ছেলেরা, নির্মাল্য আর ওর বাবা, দাদা। টেবিলে খাবার এনে বসেছিল দুই বউমা। শাশুড়ি মা সার্ভ করছিলেন। ও বাড়ির একসঙ্গে খেতে বসার ধরন এমনটাই। নির্মাল্যর খাওয়া শেষ হল প্রথমে। টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছিল, কথাকলি বলেছিল, ''বাসন রেখে যাচ্ছ কেন? দেখছ কাজের লোক আসেনি! যে যার থালা-বাটি-গ্লাস ধুয়ে নাও।''

খুব একটা অর্ডারের গলায় কথাটা বলা হয়নি, খেয়াল করিয়ে দেওয়ার মতো করে বলেছিল কথাকলি। নির্মাল্য অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। খেতে-খেতে শ্বশুরমশাই বলে উঠেছিলেন, ''এগুলো তো মেয়েদের কাজ। কাজের লোক আসেনি, বাড়ির মেয়েরা করবে।''

''কেন করবে? কাজের লোক বাড়ির সকলের জন্য। তারা না এলে যে যার নিজের কাজ করে নিলেই তো হয়। কাজের লোকের পরেই বাড়ির মেয়েদের স্থান হতে পারে না।'' বলেছিল কথাকলি। কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে বলেনি। ন্যায্য কথাই বলেছে। শ্বশুরমশাইয়ের খাওয়া থেমে গিয়েছিল। থালায় খাবারের অবশিষ্টাংশের ওপরে বাটি, গেলাস তুলে নিয়ে বেসিনের দিকে এগোলেন।

শ্বশুরমশাই যখনই ধুতে শুরু করেছেন বাসন, শাশুড়িমা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ''খবরদার, তুমি বাসন ধোবে না। আমি কি মরে গেছি? বড়লোকের মেয়ে বলে যা অর্ডার করবে, তাই শুনতে হবে!''

ব্যস শুরু হয়ে গেল নাটক। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, নির্মাল্যদের বাড়ির পুরনো রীতিনীতির বিরুদ্ধে যতবারই কথাকলি কিছু বলতে গিয়েছে পাশে ওর জা-কে পায়নি। পর্ণা তো যথেষ্ট কালচারড ফ্যামিলির মেয়ে। নিজেও অনেকদূর লেখাপড়া করেছে। সব ভুলে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিল পুরনো ধারার শ্বশুরবাড়িতে। পর্ণার নিজস্ব এমন কিছু স্বভাব ছিল, যা মোটেই পছন্দ হত না কথাকলির। যেমন, কোনও এক বিকেলে বলল, ''চলো কলি, ময়ূরীতে একবার ঘুরে আসি। শাড়ির নতুন স্টক এসেছে শুনলাম।''

বাজার রাস্তায় ময়ুরী বুটিক। অনেক ঘেঁটেঘুটে রেয়ার সব শাড়ি জোগাড় করে আনেন। কথাকলি পর্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''তুমি কি শাড়ি কিনবে, নাকি শুধু দেখতেই যাবে?''

''ধুর, এখন কিনে কী হবে? আলমারিতে তো একগাদা শাড়ি।'' বলেছিল পর্ণা।

কথাকলি বলে, ''কিন্তু ভদ্রমহিলা তো ভাববেন আমরা কিনতে গেছি। আমরা যদি ঠিক করে যাই কিনব না, মহিলাকে ঠকানো হবে। তার বদলে তুমি যদি দোকানে গিয়ে বলো, আজ কিনব না, শুধু দেখতে এসেছি। তা হলে সঙ্গে যেতে রাজি আছি।''

কথাকলির প্রস্তাব তক্ষুনি নাকচ করে দিয়েছিল পর্ণা। বলেছিল, ''ধুর, কিনব না জানলেই সব শাড়ি দেখাবে না। এই সুযোগে বাইরে একটু বেরনো হত।''

''চলো, এমনিই রাস্তায় একটু ঘুরি। গঙ্গার ধারে যাই। বেড়ানোর জন্য দোকানে যেতে হবে কেন?'' বলেছিল

কথাকলি।
পর্ণা বলল, "আমার বাবা রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে ভাল লাগে না। দোকান-বাজারে গেলে নতুন নতুন জিনিস দেখা যায়, আইডিয়া হয় কত! খাতির পাওয়া যায়..."
কথাকলি বুঝতেই পারত দু'জনের অবস্থান দুই মেরুতে। অথচ বছর পনেরোর জবার সঙ্গে কথাকলির জমে গিয়েছিল খুব। জবার লেখাপড়া ক্লাস ফাইভ অবধিও নয়, ওদের কালচারের সঙ্গে কথাকলির রুচি খাপ খায় না। তবু কী করে যে অমন মনের মিল হল, কে জানে! আর এই জবা এবং ওর মাকে নিয়েই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মস্ত ঝামেলাটা বাঁধল কথাকলির।
শ্বশুরবাড়ির সকলে মিলে এক বিয়েবাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। রাত হল ফিরতে। প্রত্যেকেই টায়ার্ড। শাশুড়িমা নিজের গয়নাগাঁটি খুলে আলমারির লকারে ঢোকাননি, খোলা র‍্যাকে রেখে দিয়েছিলেন। আলমারি লক করলেন না, বেশির ভাগ সময় করেন না, র‍্যাকে কাপড়-জামা ছাড়া দামি কিছু নেই, টাকা, গয়না থাকে লকারে। অন্যান্য দিনের মতো চাবির গর্তে ঝুলে রইল চাবির গোছা। দুপুরের দিকে হুঁশ ফিরেছিল শাশুড়ির, এই রে, গয়নাগুলো তো লকারে তোলা হয়নি। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে দেখেন গয়নার মধ্যে সীতাহারটা মিসিং। স্বাভাবিক কারণেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হল তাঁর। যখন পাওয়া গেল না নির্দ্বিধায় শাশুড়িমা বলে দিলেন, নির্ঘাত জবার কাজ। কথাকলি বলেছিল, "গয়নাটা আপনি ওরকম খোলা অবস্থায় রেখেছেন, ও জানবে কী করে?"
"জানার তো কিছু নেই। আলমারি চাবি দেওয়া থাকে না। রোজই হয়তো পাল্লা খুলে দেখে, দামি কিছু আছে কিনা? আজ পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছে।"
শাশুড়িমার কথার পিঠে নির্মাল্যর বাবা বলেছিলেন, "চুরিটা তুমি কী করে প্রমাণ করবে?"
"প্রমাণ অর্ধেক হয়েই রয়েছে। কাল রাত থেকে এখন অবধি আমার ঘরে তুমি আর আমি ছাড়া একমাত্র জবা ঢুকেছে। ছেলে-বউমার কেউ ঢোকেনি। জিনিসটা নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি!"
পুলিশ অবধি গড়াল বিষয়টা। তরুণ দত্ত পাড়ার কাউন্সিলার। শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে ভালই যোগাযোগ। দু'জনে মিলে গিয়েছিলেন জবাদের ভাড়াবাড়িতে। জবা বলল, হার নেওয়া তো দূরের কথা, আলমারিতে হাতও দেয়নি সে। জবার মা জানাল এ ধরনের ছোট কাজ তার মেয়ে করতেই পারে না। কথাটা কথাকলিরও মনে হয়েছিল, জবা অত্যন্ত সরল ধরনের মেয়ে। ওর সামর্থ্যের বাইরে এমন কিছুর ওপর লোভ করতে দেখা যায়নি। মা, মেয়ে দু'জনেই ঘর ঝাড়পোছ করতে গিয়ে সামান্য খুচরো পয়সাও যদি পেত, বাড়ির লোকের হাতে তুলে দিত। দশ বছরের উপর এ বাড়িতে কাজ করছে, হাতটানের কখনও কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। একটা ঘটনাতেই এত দিনের বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে হবে!
পুলিশ এসে পড়ল বাড়িতে। অফিসার আর একজন কনস্টেবল। ঘরটা ওঁরাও দেখলেন। ডেকে পাঠানো হল জবা, জবার মাকে। অফিসার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান প্যাঁচালো প্রশ্ন করলেন ওদের। ধমকধামকও দিলেন, কোনও লাভ হল না। ওদের কথায় এমন কোনও ফাঁক পাওয়া গেল না, যা থেকে অনুমান করা যায় জিনিসটা ওরাই নিয়েছে। বেচারিরা কাঁদছিল সমানে। অফিসার ওদের আর একপ্রস্থ ধমকে বাড়ি যেতে বললেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি কোনওভাবে প্রমাণ হয়, চুরির জন্য জেল তো হবেই, পুলিশকে মিথ্যে বলার জন্য মেয়াদ অনেক বেড়ে যাবে।
জবারা চলে যাওয়ার পর পুলিশ অফিসার চা খেতে খেতে একটা ভাইটাল পয়েন্ট তুললেন। বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে এরা নেয়নি। নিলে শুধু হারটা নেবে কেন? অন্য গয়নাগুলো ছিল।"
শ্বশুরমশাই মৃদু গলায় বলেন, "সব একসঙ্গে নেওয়ার সাহস হয়তো পায়নি। দাগি চোর তো নয়। আমার বাড়ির কাজও করছে অনেক বছর ধরে। লোভে পড়ে এই একবারই..."
কথার মাঝেই ঘনঘন মাথা নাড়ছিলেন অফিসার। বলেছিলেন, "এরকমটা হয় না সাধারণত, ওরা জানে একটা গয়না চুরি করলে পুলিশ পিছনে পড়ে যাবে, সব গয়না নিলেও তাই। চুরি যদি করতেই হয়, পুরোটা করবে। কিছু ফেলে রেখে যাবে না এবং এলাকা ছেড়ে পালাবে। এদের সঙ্গে কথা বলে আমার তেমন পাকা মাথার মনে হয়নি। আমার ধারণা এ বাড়িতেই কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে গয়নাটা।"
শাশুড়িমা বলে উঠেছিলেন, "বিশ্বাস করুন, সারাবাড়ি খুঁজেছি আমরা। ছোট বউমা তো আমার ঘরের কোনা-কোনা খুঁজেছে, কোথাও পাওয়া যায়নি।"
কথাটা শুনে ভারী আশ্চর্য লেগেছিল কথাকলির, শাশুড়িমার ঘরটা ওইভাবে খোঁজার পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল জবাকে বাঁচানোর, সেটাই কেমন সুকৌশলে জবাকে দায়ী করার জন্য ব্যবহার করা হল।
গয়নাটা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে আর কোনও সাহায্য করতে পারেনি পুলিশ। স্বাভাবিক ভাবেই জবাদের কাজে আসা বন্ধ হল। নিয়োগ হল নতুন কাজের লোক। কথাকলি কিন্তু জবাকে খুব মিস করত, মন কেমন হত মেয়েটার জন্য।
জবা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিসের কথা বলেছিল, একটা গাছ, নাম বাসরলতা। গাছটার কথা বলেছিল ওরা কাজে আসা বন্ধ করার কিছু দিন আগে। সেদিন সকালে নির্মাল্যর সঙ্গে জোর ঝগড়া লেগেছিল কথাকলির, বিকেলে নির্মাল্যর অফিসের একটা পার্টি ছিল, সেখানে কথাকলিকে নিয়ে যাবেই যাবে। ওদের পার্টি মানেই ককটেল। মদের গন্ধ, আসর কোনওটাই পছন্দ হয় না কথাকলির। নির্মাল্যর কলিগ এবং তাদের বউদের আলোচনার বিষয়েও কোনও ইন্টারেস্ট পায় না। অসুবিধাটা কিছুতেই বুঝতে চাইছিল না নির্মাল্য। বলছিল, "ওখানকার সকলেই যে পার্টিটা এনজয় করে তা নয়। পার্টির প্রয়োজনীয়তা বুঝে মানিয়ে নেয়। বস, কলিগ, ক্লায়েন্ট সবাই একজায়গায় হয়ে গল্পগাছা করলে এক ধরনের ফ্যামিলি ফিলিং হয়, কোম্পানির কাজের গ্রোথের জন্য যা খুবই দরকারি। এবার ধরো তুমি গেলে না, অনেকের প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে আমাকে। তোমার আমার রিলেশন নিয়ে গসিপ তৈরি হবে।"
কথাকলি তখন জানতে চেয়েছিল, "কোম্পানির গ্রোথের জন্য কি তুমি আমাকে বিয়ে করেছ?" খানিকক্ষণ ধরে এরকম চাপানউতোর চলার পর নির্মাল্য রেগেমেগে অফিস বেরিয়ে গিয়েছিল। জবা সে সময় বাড়িতে কাজ করছে। ঝগড়া কানে গেছে তার। সহমর্মিতার মুখ নিয়ে কথাকলির ঘরে ঢুকেছিল সে। স্বগতোক্তির ঢঙে কথাকলি বলে উঠেছিল, "এ বাড়িতে আর থাকা যাবে না। কোনও বনিবনা নেই আমাদের মধ্যে। কদিন তো বিয়ে হয়েছে, এখনই যদি এই অবস্থা হয়..."
জবা বলেছিল, "বাড়িতে একটা বাসরলতা গাছ লাগাও বউদি। টবে পুঁতলেও চলবে। দেখবে, দাদাবাবুর সঙ্গে সব ঝামেলা মিটে গেছে তোমার।"
গাছের ব্যাপারটা ভেঙে বলেছিল জবা, ওই গাছ নাকি এ দেশের অনেকেই চেনে না। জবার ঠাকুরদা বাংলাদেশের লোক ছিল, গাছটাকে ওদেশে ওই নামে ডাকা হয়। ঠাকুরদার থেকে

Scanned with CamScanner

গাছটাকে চিনেছিল জবার বাবা। শিয়ালদার নার্সারির দোকানে জবার বাবা একদিন গাছটা দেখতে পায়। কিনে এনে বাড়ির উঠোনে লাগিয়েছে। ছোট্ট গাছ, খুব বড় হয় না। কুচোকুচো সাদা ফুল। নার্সারি দোকানের মালিকও বাসরলতা নামটা জানে না। অন্য কী একটা নামে যেন চেনে। কথা এতদূর পৌঁছতে কথাকলি জিজ্ঞেস করেছিল, "তোদের বাড়িতেও বুঝি খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়? মা, বাবার মধ্যে অশান্তি..."

মাথা নেড়ে হাসতে-হাসতে জবা বলেছিল, "না গো কখনওই ঝগড়া হয় না। মা তো সে কথাই বলেছিল বাবাকে, তোমার সঙ্গে তো আমার চেঁচামেচি হয়ই না। সংসারেও কোনও অশান্তি নেই, তবু কেন নিয়ে এসেছ এই গাছ? বাবা বলেছে, যাতে কোনও দিন অশান্তি না হয় সেই জন্য।"

বাসরলতা একটা মিথ। গাছের কারণে সংসারের অশান্তি দূর হবে, এমনটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ওটাকে অন্ধবিশ্বাস না বলে মিষ্টি বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করা ভাল। গাছটাকে দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল কথাকলির। জবারা কাজে আসা বন্ধ করেছে। সাহস করে ওদের বাড়িতে যাওয়া যাচ্ছে না, যদি অপমানের শোধ নেয়! আর কিছু দিন গেলে সময়ের পলিতে জবার স্মৃতি, বাসরলতা গাছ, মাটির শালিখ সবই চাপা পড়ে যেত। পড়ল না শাশুড়িমার গলায় সীতাহারটা ফেরত আসতে দেখে। কোনও একটা অনুষ্ঠানবাড়িতে যাওয়া হচ্ছিল সপরিবারে। বাড়ির আর কেউ ওঁর গলায় হারটা লক্ষ করেছিল কি না, কে জানে। কথাকলি চমকে উঠে বলেছিল, "মা, সেই হারটা না? কোথায় পেলেন?"

শাশুড়িমা সখেদে বলেছিলেন, "আর বোলো না বউমা, কী বাজে ব্যাপার, কাল বেনারসিটা নামিয়ে পাট খুলছি, ঠক করে মেঝেতে পড়ল হারটা। জরিতে আটকেছিল মনে হয়।"

কথাকলি বলেছিল, "জবাদের তো তা হলে জানাতে হয় ব্যাপারটা। আমরা যে আর ওদের চোর বলে মনে করি না, জানিয়ে দেওয়া উচিত।"

সঙ্গে-সঙ্গে শাশুড়িমা ঝাঁঝের গলায় বলেছিলেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হল ছোট বউমা। ওদের এ কথা বলতে গেলে, ছেড়ে দেবে ভেবেছ? মুখে যা আসবে, তাই বলবে। পাড়া মাথায় করবে। আমাদের সম্মানটা কোথায় যাবে তখন?"

"আমরাও তো ওদের সম্মানহানি করেছি মা। চোর অপবাদ মাথায় নিয়ে ঘুরছে। আমরা যদি নিজেদের ভুল স্বীকার করে চুরির দায় থেকে ওদের মুক্ত করে দিতে পারি, কৃতজ্ঞতা বশত ওরা হয়তো ততটা খারাপ কথা আমাদের বলবে না।"

শাশুড়িমা বলেছিলেন, "তুমি তো আমাদের চেয়ে ওদের সম্মানটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছ।"

"অবশ্যই দিচ্ছি। দেওয়া উচিত। ওদের আমরা অসম্মান করেছি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। ওরা যদি আমাদের দু'-চারটে খারাপ কথা বলে, সেটা মেনে নিতে হবে। আমরা অন্যায় করেছি।"

কথাকলির এই মন্তব্যের পরেই লেগে গেল কাজিয়া। শাশুড়িমা উলটোপালটা বকতে শুরু করলেন, কথাকলির নাকি শ্বশুরবাড়ির লোকেদের গোড়া থেকেই পছন্দ নয়। তাই একবার যখন হেনস্থা করার সুযোগ পেয়েছে ছাড়ে কখনও! "তোমার যদি এতই অপছন্দ আমাদের, কেন ঘর করতে এলে?"

এসব বলেও কথাকলিকে তার অবস্থান থেকে টলানো যায়নি। সে জেদ ধরে বসে রইল, জবাদের কাছে ভুল স্বীকার করতেই হবে। বাড়ির কোনও সদস্য তার পাশে দাঁড়াল না। নির্মাল্যও নয়। নির্মাল্যকে রাজি করানো যায়নি। ওর একটাই বক্তব্য, তোমার কথায় আমার মরাল সাপোর্ট আছে। এদিকে মা-বাবার সম্মানের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে।

অগত্যা কথাকলিকেই যেতে হয়েছিল মদন বিশ্বাস লেনে জবাদের ভাড়াবাড়িতে। ওদের পাওয়া গেল না। টালির চালের বাড়ি, উঠোনে ইতস্তত কিছু গাছ। কোনটা বাসরলতা বলতে পারবে না নতুন ভাড়াটে। জিজ্ঞেসও করেনি কথাকলি। এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ নিশ্চয়ই কথাকলির শ্বশুরবাড়ির দেওয়া অপবাদটা। সেই বিকেলেই সুটকেসে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়। শ্বশুরবাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাবার কাছে চলে আসে। অফিস ফেরত নির্মাল্য নিতে এসেছিল কথাকলিকে। ওর সঙ্গে কথাকলি কোনও কথাই বলেনি। দরজা বন্ধ করে বসেছিল।

"ম্যাডাম, টোল।"

ড্রাইভারের ডাকে চিন্তাসূত্র ছেঁড়ে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারকে দেয় কথাকলি। এতটাই অন্যমনস্ক ছিল, রাস্তাঘাটের কিছুই চোখে পড়েনি। বিহান বলে, তুমি যখন অন্যমনস্ক হয়ে যাও, মনে হয় কাচের বাবলের মধ্যে চলে গেছ। ডাকতে ভয় হয়, টোকা খেয়ে কাচ যদি ভেঙে যায়! ঝনঝন আওয়াজ তুমি সহ্য করতে পারবে তো? বিহানের মতো করে অন্য কেউ ভাবে না, তবে কথাকলি অন্যমনস্ক থাকলে চেনাজানারা ওকে ডাকতে ভয়ই পায়।

সেকেন্ড ব্রিজে উঠে পড়েছে গাড়ি। গঙ্গার হাওয়াটা মিস করলে চলবে না। ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে কথাকলি বলে, "সজল, এসি অফ করো। কাচ নামাবো।"

নির্দেশ মতো কাজ করে সজল। ড্রাইভারটি নতুন। গাড়িটা পুরনো। বাবার কাছে থাকলে যে গাড়িতে চড়ত কথাকলি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়িটা নিয়ে যায়নি। ছোট করা হত ও বাড়ির লোকেদের। নির্মাল্যদেরও ছিল দুটো গাড়ি, একটা নির্মাল্যর কেনা। ওটাতেই অফিস যাতায়াত করত। অন্য গাড়িটা থাকত বাড়ির সকলের জন্য। কিছু দিন

আগে নির্মাল্য যখন নিতে এসেছিল কথাকলিকে, বলল, কসবায় ফ্ল্যাট নিয়েছে। আর সালকিয়ার শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবে না, কথাকলি এক কথায় রাজি হয়নি। বলেছিল, ''বাবা, মায়ের সম্মানের কথা ভেবে তুমি জবাদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারোনি। এখন বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলে মা-বাবাকে অসম্মান করা হবে না?''

তর্কে জড়াতে চায়নি নির্মাল্য। শান্তভাবে বলেছিল, ''অফিস থেকে যদি আমায় বাইরে কোথাও ট্রান্সফার করে, তখন তো মা-বাবার থেকে দূরে থাকতেই হবে। আর জবাদের ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি নিজেকে গুলোচ্ছ কেন? আমার তো একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, সেখানে বাবা-মায়ের চেয়ে বউয়ের

''আমার তা হলে কী করা উচিত ছিল বলো? মেয়েকে বলতে হত, ওরে, আরও একটু খারাপ হ, আরও একটু নিষ্ঠুর, নির্দয় হ...'' গলা ধরে আসছিল বাবার।

গুরুত্ব মোটেই কম নয়। বাড়ির সকলেরই মত আছে তোমাকে নিয়ে আলাদা থাকার ব্যাপারে।''

নির্মাল্যর কথায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি কথাকলি, কোথায় যেন একটা ফাঁক লাগছিল। নির্মাল্যর বাড়ির লোকজন হঠাৎ এরকম বদলে গেল কী করে! কোন উপায়ে নিজের প্রতি পরিবারের অধিকার বোধটাকে আলগা করে ফেলতে পারল নির্মাল্য? 'ভেবে দেখছি' বলে নির্মাল্যকে ফেরত পাঠিয়েছিল কথাকলি। ওর খুঁত-খুঁতানি শুনে বাবা বলল, ''সব ব্যাপারকে এত প্যাঁচালো করে ভাবিস না তো। নির্মাল্য তোকে ভালবাসে বলেই আলাদা করে ঘর-সংসার পাততে চাইছে। বাড়ির লোকেদের বোঝানোর জন্য ছ'মাস টাইম লেগেছে ওর। তুই ওই সময় ডিভোর্স দিতে চেয়েছিলি ওকে। বিয়ে করে নিতে বলেছিলি, করেছে? মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যবস্থা করেছে তোকে নিয়ে আলাদা থাকার।''

''কিন্তু আমার তো শুধু নির্মাল্যর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে প্রবলেম হচ্ছিল না, নির্মাল্যর সঙ্গেও হচ্ছিল। ও বাইরে একরকম, বাড়িতে একদম আলাদা।''

কথাকলির কথার উত্তরে বাবা বলেছিল, ''পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলত বলেই ওকে অন্যরকম লাগত তোর। এখন থেকে তোরা অন্য ফ্ল্যাটে থাকবি, দেখিস আগের নির্মাল্যকেই ফিরে পাবি। তবে দুটো মানুষ একসঙ্গে থাকলে কিছু মতবিরোধ হয়ই। একটু মানিয়ে চলিস। ফোনে আমার সঙ্গে আলোচনা করিস। বিহানকে কিছুতেই করবি না।''

''কেন?'' অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল কথাকলি।

বাবা বলল, ''বিহানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কারণেই তুই আশকারা পাচ্ছিস বেশি। বরের ঘরে মানানোর চেষ্টা করছিস না। রাগারাগি হলেই বাপেরবাড়ি চলে আসছিস। জানিস এখানে তোর বায়নাক্কা শোনার জন্য একজন সদাই প্রস্তুত। নিজের ঝুড়িঝুড়ি সমস্যা ছাড়া আজ পর্যন্ত বিহানকে তুই কিছুই দিতে পারিসনি। বেচারি ভালমানুষ বলে তোর সব অত্যাচার সহ্য করে।''

কথাগুলো যে কথাকলি ভাবেনি, তা নয়। বাবাকেও একই বিষয়ে নোটিস করতে দেখে বুঝেছিল ভাবনায় সারবত্তা আছে। এমনও হয়েছে, কথাকলির আগে নির্মাল্যই ফোন করেছে বিহানকে। বলেছে, তোমার বন্ধুকে বোঝাও। মাথা গরম করে বসে আছে।

নির্মাল্যও জানত কলির মাথা ওই একজনই ঠান্ডা করতে পারে। আচ্ছা, নির্মাল্যও কি নিজের সুবিধার্থে বিহানকে ব্যবহার করেছে? তাই হয়তো কথাকলি, বিহানের বন্ধুত্ব নিয়ে কোনও দিন কোনও বাঁকা মন্তব্য করেনি।

জবাদের ঘটনাটার পর কথাকলি যখন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, বাবা বিহানকে ডেকে পাঠিয়েছিল ব্যাপারটার মধ্যস্থতা করতে। কথাকলি বিহানের কোনও কথা শুনতে রাজি হয়নি। বলেছিল, ''এ ব্যাপারে তুমি আমাকে একদম জ্ঞান দিতে আসবে না। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, নিয়ে ফেলেছি।''

বিহানের হয়ে বাবা হঠাৎ বলে উঠেছিল, ''বাঃ, নিজের মতো ইচ্ছে মতো তুমি ওর পরামর্শ নেবে। তুমিই নিয়ন্ত্রণ করবে তোমাদের বন্ধুত্বটা।''

বাবার রিঅ্যাকশনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল কথাকলি, জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। বিহান তখন আবার বাবাকেই দুষতে লাগল, ''আপনারাই আগলে-আগলে মেয়েকে এরকম একগুঁয়ে করেছেন। অ্যাডজাস্ট শব্দটাই ওর অভিধানে নেই। উনি একেবারে নীতিবাগীশ হয়ে বসে রয়েছেন।''

''আমার তা হলে কী করা উচিত ছিল বলো? মেয়েকে বলতে হত, ওরে, আরও একটু খারাপ হ, আরও একটু নিষ্ঠুর, নির্দয় হ...'' বলতে বলতে গলা ধরে আসছিল বাবার। কথাকলির গলায় গুটুলি পাকিয়ে ছিল কষ্ট। বুঝতে পেরেছিল, মুখে যাই বলুক বাবা, আসলে মেয়ের মতামতকেই সাপোর্ট করে। এবার তাই নির্মাল্যর সঙ্গে কসবার ফ্ল্যাটে ওঠার আগে-পরে বাবার পরামর্শ মতো বিহানকে ফোনে কিছু জানায়নি কথাকলি। জবাকে খুঁজতে আজ সাঁতরাগাছিতে আসবে নির্মাল্যকে জানায়নি কথাকলি। জানালেই একগাদা কথা উঠত।

জবাদের কথাটা মনে রেখেছিল সুমিতাদি। সাঁতরাগাছির একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায়। গত পরশু সন্ধের দিকে ফোন করে বলল, ''কলি, তোর জবাকে দেখলাম আমার এক স্টুডেন্টের বাড়িতে। আমাকে হয়তো খেয়াল করেনি। আমরা ঢুকছি, ও বেরচ্ছে।''

সাঁতরাগাছির ফ্ল্যাটের বাচ্চাটি, যার নাম অর্ক, সুমিতাদির স্কুলে পড়ে। অর্কর জন্মদিনে সুমিতাদি সহ কয়েকজন টিচারকে

নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। কথার ছলে সুমিতাদি অর্কর মা করবীর থেকে জেনে নেয় ও বাড়িতে জবার ভূমিকা। হাউজিংটার লোকেশান ভাল করে বুঝে নিয়েছিল, ফোনে রুটটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় কথাকলিকে। সমস্ত উদ্যোগ জলে গেল। এত কাছে পৌঁছেও, একটুর জন্য অধরা থেকে গেল জবা। জবারা কোথায় গেছে, জানার জন্য জগাছার যে বাড়িতে ভাড়া থাকত, সেখানে যাওয়া যেতে পারে। শুধু গ্রামের নাম নয়, দেখা গেল প্রপার ঠিকানা বলে দিচ্ছে প্রতিবেশীরা। জগাছার ভাড়াবাড়ির লোকেশনটা জানা এমন কিছু কঠিন নয়। সুমিতাদির মাধ্যমে জোগাড় করতে হবে করবীর ফোন নাম্বার। রাতের দিকে ফোন করবে কথাকলি। করবীর হাজব্যান্ড অভিজ্ঞান নিশ্চয়ই সে সময় বাড়িতে থাকবেন। কথাকলি করবীকে অনুরোধ করবে জবাদের জগাছার বাড়ির অ্যাড্রেসটা অভিজ্ঞানবাবুর থেকে জেনে তখনই তাকে জানাতে। জানার পর কথাকলির কি উচিত হবে একা গিয়ে জবাদের খোঁজ নেওয়া! জায়গাটা তার অচেনা। ওখানে যেতে হলে সঙ্গে একজন পুরুষমানুষ নিয়ে যাওয়া ভাল। নির্মাল্যকে রাজি করানো যাবে না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিহানের অভাবটা ভীষণভাবে ফিল করে কথাকলি। বিহানও ব্যাপারটাকে বাড়াবাড়ি বলত, কিন্তু সঙ্গে অবশ্যই যেত। কথাকলি কসবায় চলে এসেছে, ওর কানে গিয়েছে। জানিয়ে যায়নি বলে হয়তো অভিমান করে বসেছিল কয়েকটা দিন। তারপর ভেবেছে, বাঁচা গিয়েছে! কথাকলি যোগাযোগ রাখছে না। ওর ফোন মানেই তো কোনও ঝামেলার মুখে ফেলে দেওয়া। বাবার ভাষায় 'ঝুড়িঝুড়ি সমস্যা'। সত্যিই তো এ ছাড়া কথাকলি কীই বা দিতে পেরেছে বিহানকে। দরকার ছাড়া বিয়ের পরবর্তী সময়ে বিহানকে ডাকেনি কথাকলি। এটা তো এক ধরনের স্বার্থপরতা। বাবার কথা মেনে কথাকলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যত সমস্যাতেই পড়ুক, বিহানকে ফোন করে আর ব্যতিব্যস্ত করবে না। এই তো, দিন চারেক বোধহয় হল, চন্দ্রিমা ফোন করেছিল, প্রথমে কেমন আছিস, কী করছিলি এখন? বলে টলে নিয়ে আসল কথায় এল, ''তোর কথায় বিহানদা আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে বিপদ পুরোপুরি কেটে গিয়েছে বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা মারধর করতে না পেরে রাগে ফুঁসছে। বাবাকে অন্য কৌশলে ফাঁসাতে চাইছে। তুই কি বিহানদাকে ব্যাপারটা একবার জানাবি?'

''আমাকে জানাতে হবে কেন! তুই নিজেই ফোন কর। এসব ব্যাপারে তোর সঙ্গে তো ওর ফোনে কথা হয়েছে।'' বলেছিল কথাকলি।

চন্দ্রিমা তখন বলে, ''তা হয়েছে। তবে বারবার বিরক্ত করা কি উচিত হবে? আবার এদিককার পরিস্থিতিও ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। তাই ভাবছিলাম, তোর কথাতেই তো বিহানদা আমাদের জন্য এত কিছু করল, তুই যদি বলিস বাকিটুকুও করবে। আমি তো জানি বিহানদা তোকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দেয়!''

''আমার স্তুতি করতে গিয়ে তুই প্রকৃত উপকারীকে ছোট করছিস। বিহান যথেষ্ট সেনসিটিভ ছেলে। তোদের অসহায়তা উপলব্ধি করেই যতটা পেরেছে করেছে। আবারও করবে। তুই ওকে ফোন করে এখনকার সমস্যাটা জানা।'' বলেছিল কথাকলি।

''ঠিক আছে, তাই করি।'' বলে ফোন কাটতে যাচ্ছিল চন্দ্রিমা, কথাকলি বলে উঠেছিল, ''দাঁড়া, একটা খবর দিই, সেটা সু না কু, বলতে পারব না। আমি বরকে নিয়ে এখন একটা আলাদা ফ্ল্যাটে আছি। কসবায়। ওই যে, খারাপ বউরা যেটা করে, বরকে তার মা-বাবার থেকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা থাকে, সেই রকম আর কি।''

চন্দ্রিমা বলেছিল, ''তুই ভাল না খারাপ, তোর মুখ থেকে আমার না জানলেও চলবে। শুধু এটুকু বলব, এবার মনটাকে একটু বাঁধ। একটা দাঁড়ে বসার অভ্যেস কর।''

কিছু কি মিন করতে চেয়েছিল চন্দ্রিমা? কে জানে! দীর্ঘ অসাক্ষাতের ফলে ওর কথার না বলা অংশটা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি কথাকলি। প্রসঙ্গ সূত্রে খেয়াল হয়েছিল চন্দ্রিমাদের সমস্যায় বিহান কী কী ব্যবস্থা নিল, কিছুই জানায়নি। কথাকলি যা জেনেছে, সবটাই চন্দ্রিমার থেকে। তার মানে কি বিহান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, শেষবারের মতো কথাকলির অনুরোধ রক্ষা করছে? কথাকলি যোগাযোগ না রাখার কারণে বিহানের সুবিধেই হয়েছে, সিদ্ধান্তটা মুখের উপর বলতে হয়নি। কিন্তু এরকম হঠাৎ করে সরে দাঁড়ালে তো চলবে না। এত দিন ধরে পাশাপাশি থাকার অভ্যেস। একা চলার মতো মনের জোর আনার জন্য কথাকলিকে তো একটু সময় দিতে হবে। এই যেমন, জবাদের কী করে একা-একা খুঁজে বের করবে কথাকলি? আরও একটা বিষয়ে বিহানের সঙ্গে আলোচনা করাটা ভীষণ জরুরি। বিহান বাবাকে বলেছিল, আপনাদের আশকারায় মেয়ের ধারা এমন হয়েছে। বিহানও তো প্রশ্রয় দিয়েছে কথাকলিকে। বিহান বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি তাই। কেন ভালবেসেছে বিহান? বিনিময়ে কথাকলি তো তাকে কিছুই দিতে পারেনি। ভালবেসে কথাকলির স্বভাব নষ্ট করেছে বিহান। এখন সরে পড়লে তো চলবে না। ভালবাসতে গিয়ে সে যে আসলে কথাকলির ক্ষতিই করেছে, শুনতে হবে সেটাও... উত্তেজনায় হাত কাঁপছে কথাকলির। কাঁপা হাতে ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে ফেলেছে। বিহানের নাম খুঁজে নিয়ে সুইচ টেপে। কানে নিয়েছে ফোন সেট। ও প্রান্তে রিং হচ্ছে। হয়েই

যাচ্ছে। কেন ধরছে না ফোন? আর কি কোনও দিনই ধরবে না? নির্দিষ্ট সময় অবধি বেজে থেমে গেল রিং। গলা শুকিয়ে গিয়েছে কথাকলির। তার অনুমানই মিলে গেল তা হলে। আবারও ট্রাই করে কথাকলি। বেজে যাচ্ছে ফোন... এইবার ধরল বিহান, "বলো।"

প্রথমে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে কথাকলি। বিহানের ফোনে ভেসে আসছে ভিড়ের আওয়াজ। ফের বিহান বলে, "কী হল, বলো!"

ওর কণ্ঠে ব্যাকুলতা আগের মতোই। কথাকলি বলে, "তুমি কোথায় এখন? পিছনে এত আওয়াজ কিসের?"

"মিছিলের। মিছিলে হাঁটছি আমি।"

"তুমি মিছিলে হাঁটছ! মিছিলে হাঁটার ছেলে তো তুমি নও।"

"তোমার জন্য হাঁটতে হচ্ছে। আরও কত জায়গায় যে যেতে হবে তোমার কারণে, ভগবানও বলতে পারবে না।"

"ইয়ারকি মেরো না। কাদের মিছিল? কীসের দাবিতে মিছিল?"

"আর্টিস্টদের মিছিল। যারা নতুন কংগ্রেসের অনুগামী। দাবিটা এখনও ধরতে পারিনি।" এই কথাগুলো নিচু গলায় ফিসফিসে ভঙ্গিতে বলল বিহান।

কথাকলি বলে, "কী নিয়ে মিছিল জানো না অথচ ওদের সঙ্গে হাঁটছ! ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলবে?"

"এখন বলা যাবে না। তুমি কেন ফোন করেছ বলো?"

"তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, এক্ষুনি ভীষণ দরকার।"

"তোমার জন্য এবার তো আমাকে দুটো হতে হবে দেখছি। শুনছ মিছিলে হাঁটছি, এখনই কী করে দেখা করি?"

'মিছিল শেষ হবে ক'টায়?'

"এখন হাজরায় আছি, নন্দনে মিছিল শেষ। ধরে নাও আরও ঘণ্টাখানেক।"

"ঠিক আছে, আমি নন্দনে ওয়েট করব। তুমি চলে এসো।"

"ও কে।" বলে ফোন কাটে বিহান।

"কার ফোন? মনে হল গার্লফ্রেন্ড?" পাশে হাঁটতে থাকা রূপাঞ্জনা জিজ্ঞেস করলেন।

মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল বিহান।

"তোমার কি একটাই গার্লফ্রেন্ড, নাকি আরও অনেক আছে?" মজার সুরে জানতে চাইলেন রূপাঞ্জনা।

হ্যাঁ এবং না-এর মাঝামাঝি একটা হাসি হাসে বিহান।

"গার্লফ্রেন্ড কী করে?"

"ভাবে।" কথাটা ফট করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল বিহানের।

"ভাবে মানে? ঠিক বুঝলাম না।"

কথাটা একবার যখন বলেই ফেলেছে, একটা শেপ তো দিতে হবে। বিহান তাই বলে, "ভাবে মানে, নানান বিষয় নিয়ে চিন্তা করে আর কি।"

"এটা কখনও কারওর প্রধান কাজ হতে পারে?"

"না হওয়ার তো কিছু নেই। কেউ যদি ভাবতে ভালবাসে, বিষয়ের তো অভাব হবে না। ভেবে-ভেবে কাটিয়ে দিতে পারবে গোটা জীবন। ভাবনার কোনও শেষ আছে?" কথাটা বলার পর নিজের কানেই বেশ গোলমাল ঠেকল, রূপাঞ্জনার পরের প্রশ্নের জন্য সিঁটিয়ে থাকে বিহান।

এই মিছিলে প্রচুর সেলিব্রেটির জমায়েত। সিনেমা, নাটক, সংগীত, সাহিত্য জগতের বিখ্যাত সব মানুষ হেঁটে চলেছেন একসঙ্গে। রয়েছে বিহানের মতো অখ্যাত কবি, সাহিত্যিকের দল এবং অন্য আর্টফর্মের অনামীরাও। মিছিলের চেয়ে বেশি ভিড় রাস্তার দু'ধারে। সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখার জন্য হামলে পড়ছে তারা। মিডিয়ার ক্যামেরাও সিনেমার লোকদের প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি। মাঝে-মাঝে চলে যাচ্ছে এই মিছিলের সাপেক্ষে বেমানান চেহারার সামনে। বিহানও মিডিয়ার ক্যামেরার অনুগ্রহ চাইছে, টিভিতে যেন অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখা যায়। এই মিছিলে হেঁটেছে, তার প্রমাণ। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে সে পড়তে চায় না। কারণ, বিহান এখনও ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারেনি মিছিলের উদ্দেশ্য। স্লোগান উঠছে, 'পক্ষপাত নিপাত যাক', 'প্রতিহিংসা মূলক আচরণ রুখবই রুখব', 'কেন্দ্র তোমার চোখরাঙানিকে ভয় পাই না, পাব না', 'মিডিয়ার বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন অবিলম্বে বন্ধ হোক'... এটুকু বোঝা গেছে ক্ষোভ কেন্দ্রীয় সরকার আর কিছু সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে, যারা রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে। কিন্তু ঠিক কোন বিষয়ে সমালোচনা, কেন্দ্রীয় সরকারই বা কী ধরনের অসহযোগিতা করছে, কেনই বা চোখ রাঙাচ্ছে, কিছুই জানে না বিহান। গত কয়েকদিনের হেডলাইন দেখে বোঝা যায়নি শাসক দলের অনুগামী শিল্পীদের মনে এত ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিহানের কেন জানি মনে হচ্ছে, এই মিছিলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এদের স্লোগানের মিল নেই। তাতে বিহানের কিছু যায় আসে না। তার একটাই উদ্দেশ্য, টিভির মাধ্যমে যেন প্রচার হয় সে শাসক দলের অনুগামী শিল্পী। সেই সুবাদে বিরাট একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলবে বিহান। ঠিক এর উল্টোটা হবে যদি সন্দেহবশে কোনও সাংবাদিক এসে বিহানকে কূট প্রশ্নগুলো করে। সমস্ত নম্বর কাটা যাবে। যথাযথ উত্তর দিতে পারবে না বিহান। টিভিতে দেখানো হবে সেটা।

একটা জনপ্রিয় চ্যানেলের ক্যামেরা লক্ষ্য করে ভিড় কাটিয়ে এগোতে থাকে বিহান। হ্যাংলামির মতো লাগছে, লাগুক। সে তো নিজের প্রচারের জন্য যাচ্ছে না, যাচ্ছে শ্রীকান্ত মিশ্রকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। তার মতো অনামী কবি এবং সবে মাত্র দুটো হিট গানের গীতিকারকে দেখে টিভির ক্যামেরা তো এগিয়ে আসবে না, যেতে হবে তাকেই। এমনিতেই প্রথম সারির দু'-চারজন লেখক, কবি, গীতিকারকে বাদ দিলে সাহিত্যক্ষেত্রের কাউকে নিয়েই মিডিয়ার কোনও আগ্রহ নেই। একটাই সান্ত্বনা, আজ মিছিলের পুরোভাগে আছেন কবি রঞ্জন বসু। মিছিলের ছোট-বড় সব কবির কাছে এটাই সবচেয়ে বেশি জোরের জায়গা। কবি রঞ্জন বসু কিছু দিন হল বামশিবির ছেড়ে নতুন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কীসব দুর্দান্ত কবিতা লিখেছেন রঞ্জন বসু! বিহান তো একবার সাহস করে নিজের চারটে কবিতা রঞ্জন বসুর বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে ছিল। কবিতার নীচে লিখেছিল, কেমন লাগল, জানালে বাধিত হব। নিজের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস সবই দিয়েছিল। কোনও উত্তর আসেনি। হয়তো ভাল লাগেনি কবিতাগুলো। ফোন করে খারাপ বলতে বেধেছে। অথবা পড়ার সময় পাননি। বিহানের খুব ইচ্ছে করছে আজ এই সুযোগে রঞ্জন বসুর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপটা সেরে রাখতে। বড় পত্রিকায় কবিতা ছাপার জন্য নয়, বিহানের কবিতা পড়ে মতামত দিলেই চলবে। বড় কবির সান্নিধ্য পাওয়া বিরাট ব্যাপার। মনমরা হয়ে হাঁটছিল বিহান। ওর শরীরী ভঙ্গি দেখেই সম্ভবত রূপাঞ্জনা বলেছিলেন, "তোমাদের ফ্যামিলি কি কমিউনিস্ট মাইন্ডেড?"

"না না, আমাদের বাড়িতে পার্টিপলিটিক্স নিয়ে কোনও আলোচনাই হয় না। ভোটটা দেয়। কে কাকে দিল, জানার চেষ্টাও করি না আমরা।" বলেছিল বিহান।

রূপাঞ্জনা বললেন, "তার মানে তুমিই বাড়ির প্রথম মেম্বার, যে

Scanned with CamScanner

অ্যাকটিভলি পার্টিপলিটিক্সে জড়িয়ে পড়লে।''
ঘাড় নেড়ে সায় দিলে খুশি হতেন রূপাঞ্জনা। সায় দিলে পার্টিটা যে করতেই হত, তাও নয়। তবু ঘাড়টা হেলাতে পারেনি বিহান। মনের ভিতরে তীব্র অনীহার কারণে ঘাড়ের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিহান ঠিকই করে নিয়েছে এবারের ঝামেলাটা মিটলে পলিটিক্স থেকে শতহস্ত দূরে চলে যাবে সে। যেমনটা এতকাল থেকে এসেছে।
মিছিলে জয়েন করার সময়ই কবি রঞ্জন বসুকে দেখেছিল, আলাপ করবে চিন্তা মাথায় আসেনি। কলির ফোনটা আসতেই মনের সমস্ত বিষণ্ণতা উধাও হল বিহানের। মনে হল জীবনের কোনও ঘটনাই পুরোটা খারাপ নয়। আজ মিছিলে না এলে রঞ্জন বসুকে 'সেম বোট ব্রাদার' বলে মনে হত না। আলাপ করতে যাওয়ার যাবতীয় দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছে এই মিছিল। রঞ্জন বসুকে লক্ষ করে এগিয়ে চলেছে বিহান। ইতিমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সেরে ফেলেছে বিহান, জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা জোনে দাঁড়িয়ে হাত ছুঁড়ে বেশ কয়েকবার স্লোগান দিয়েছে। এবার কবি রঞ্জন বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারলেই মিছিলে আসা সফল হবে। আশা করা যায় নন্দনে পৌঁছনোর আগেই রঞ্জন বসুর কাছে চলে যেতে পারবে বিহান। তারপর দেখা হবে কলির সঙ্গে, অনেকদিন পর। কলি নির্ঘাত কোনও একটা ঝামেলা চাপাবে কাঁধে, চাপাক। কলির ঝামেলা বিহানের কাছে অনেকটা ঝোলাব্যাগের মতো। এমনই অভ্যেস হয়েছে, না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। রুদ্রকাকু বারণ করে দেওয়াতে, যথার্থ প্রয়োজনেও কলিকে ফোন করেনি বিহান। আত্মসম্মানে লাগছিল। আজ যখন কলি নিজের থেকে যোগাযোগ করল, বিহানের দেখা করতে বাধা রইল না। এই প্রথমবার বোধহয় এত দিন ধরে কলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বিহানের। কলির বন্ধুত্বটা যে তার জীবনের জন্য কতটা অপরিহার্য বিহান এই সময়টা জুড়ে ভাল মতোই টের পেয়েছে। কলি এই দৈনন্দিনতার মাঝে কীভাবে যেন এক আশ্চর্য পথ আবিষ্কার করে ফেলে। সেই পথ ধরে এগোলে অন্য ধরনের এক জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।
বড়িওলির ঘটনাটা যেমন, বাড়ি-বাড়ি বড়ি বিক্রি করতেন মহিলা। কলির সঙ্গে জমে গিয়েছিল খুব। বৈঁচিগ্রাম থেকে আসতেন। নিজের ঘর-সংসার আর গ্রামজীবনের গল্প করতেন। হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিলেন মহিলা। দু'মাস হয়ে গেল আসছেন না দেখে অস্থির হয়ে পড়ল কলি, মাকে বলতে লাগল বড়ি-দিদার নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছে, গুরুতর কোনও অসুখ। আমি ওঁকে দেখতে যাব। কাকিমা অনেক বুঝিয়েও কলিকে নিরস্ত করতে পারেননি। বিহানকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, ''যাও, তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও তার বড়ি-দিদার কাছে। ঠিকানাপত্তর নিয়ে রেখেছে সে। বৈঁচিগ্রামের অনেক ভিতরের দিকে ঘরবাড়ি। রাস্তাঘাট কেমন, কে জানে! তোমার কাকাবাবু যেতে পারবেন না। তাঁর অত সময়ই বা কোথায়?''
হাওড়া স্টেশন থেকে বর্ধমান লোকাল ধরে বৈঁচিগ্রাম গিয়েছিল বিহান ও কলি। ঠিকানা খুঁজে পৌঁছে গিয়েছিল গভীর গ্রামে। গ্রামের লোকের দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বিহানরা, কলি থমকে গিয়ে বলেছিল, ''এটা হতেই পারে না। বড়ি-দিদার পাকাবাড়ি নয়, মাটির বাড়ি, টালির চাল।''
কড়া নাড়ার পর দরজা খুলেছিলেন কলির বড়িদিদা। কলিকে দেখে উনি বিস্মিত এবং একই সঙ্গে যথেষ্ট বিব্রত।
কলিও কিছু কম অবাক হয়নি। বলেছিল, ''কী ব্যাপার দিদা, তুমি যে বলেছিলে তোমার মাটির বাড়ি, বর্ষায় ফুটো টালির চাল দিয়ে জল পড়ে! তোমার কুয়োতলা কই? উঠোনে তো দেখছি টিউবয়েল।''
''ভিতরে এসো। সব বলছি।'' বড়ি-দিদা ঘরে ডেকে নিয়েছিলেন বিহানদের। বাড়ি পাকা হলে কী হবে, আর্থিক অবস্থা যে সঙ্গিন ভিতরে ঢুকে মালুম পেয়েছিল বিহানরা। দু'টি ঘর। বাইরের ঘরে একটা তক্তপোশে বসতে দিয়েছিলেন বৃদ্ধা। তারপর যা বললেন, এক কথায় অভূতপূর্ব, তিনি সম্পন্ন যৌথ পরিবারের গৃহবধূ। স্বামী মারা যাওয়ার পর প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে পুত্রসন্তানসহ তাঁকে আলাদা করে দেওয়া হয়। নিজের অংশের চাষের জমি থেকে যতটুকু আয় হত, তা দিয়ে অনেক কষ্টে ছেলেকে লেখাপড়া শেখান, বিয়েও দেন। ব্যবসা করার অজুহাতে ছেলে মাকে বুঝিয়ে জমি বিক্রি করায় এবং টাকাগুলো নিয়ে বউসমেত চলে যায় কলকাতায়। বৃদ্ধা মহাজনের থেকে বড়ি কিনে বাড়ি-বাড়ি বিক্রি করে নিজের পেট চালাতেন। মহাজনের কাছে টাকা বাকি পড়ে গিয়েছে অনেক, মাল দিতে চাইছে না। ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয়েছে তাঁকে।
কলি বলেছিল, ''এসব না বলে কেন তুমি আমাদের বলতে গেলে মাটির বাড়ি, ফুটো টালির চাল, গোয়াল ঘর ভেঙে পড়েছে, নিজের জমির ডাল থেকে বড়ি করো, এখন তো শুনছি জমিই নেই। ছেলে-বউমা নাকি খুব তোমায় যত্ন করে... বানানো গল্পে যে দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে তুমি, সত্যিকারের জীবনে তো তার চেয়েও কষ্টে আছ। সত্যিটা বলতে অসুবিধে কী ছিল?''
''আসল দুঃখটা তো দু'কথার। অত অল্প কথায় মানুষের মনে মায়া জাগানো যায় না। নকল দুঃখে কত গল্প, ছেলে বউমা, জমি, শীত-বর্ষার কষ্ট, অনেকক্ষণ ধরে বলা যায়। আগ্রহভরে সবাই শোনে।''
বৃদ্ধার কথাগুলো শুনতে-শুনতে বিহানের মনে হয়েছিল, আমার কবিতাগুলো বোধহয় এরকমই, মিষ্টি করে দুঃখের কথা বলি। যাতে পাঠকদের ভাল লাগে। তত দিন অবধি লেখা নিজের সমস্ত কবিতাকে মিথ্যে বলে মনে হয়েছিল বিহানের।
কলির ওসব বালাই নেই, বড়ি-দিদার প্রকৃত অবস্থা শোনার পর বলেছিল, ''সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, দুপুরে দু'জনে তোমার কাছে খাব। এখন চা চাপাও। এই নাও টাকা, আমাদের খাওয়ানোর জন্য যদি কিছু কিনতে হয়, নিয়ে এসো। ডিমের ঝোল, ভাত হলেও চলবে। মহাজনের টাকাও আজ আমি যতটা পারি দিয়ে যাব। তোমার শরীর খারাপ ভেবে কিছু টাকা সঙ্গে এনেছি, বাকিটা বাড়ি গিয়ে নিও। আর একটা কথা, মিথ্যে দুঃখ শুনিয়েই বিজনেস চালিয়ে যাবে তুমি। সত্যিটা কাউকে বলতে যাবে না। আমার বাড়িতেও না।''
বৃদ্ধা কলির হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ''তোমার মতো মেয়ে যেন ঘরে-ঘরে জন্ম নেয় মা।''
কলি কিন্তু এতটুকু আবেগসিক্ত হয়নি।
ফেরার পথে খোশমেজাজে ছিল কলি। প্রচুর বকবক করছিল। ট্রেনের হকারদের থেকে নানা ধরনের খাবার কিনে খেয়েছে, খাইয়েছে বিহানকে। কলির মতো অত অল্প সময়ে ফ্রি হতে পারেনি বিহান, খালি মনে হচ্ছিল কলি যদি আর কিছু দিন দেরি করত বৃদ্ধার কাছে আসতে অথবা না আসত, কী অবস্থা হত ওঁর! বাড়ি ফিরে একটা রাগের কবিতা লিখেছিল বিহান,

গত-রাতে খুন-রক্ত
কালো পিচে এখনও সতেজ
গ্রামে মা পরিত্যক্ত
সভ্যতা শহরে নাড়ছে লেজ

রঞ্জন বসুর কাছে পাঠানো চারটে কবিতার মধ্যে এটা ছিল। পড়েননি নিশ্চয়ই। যদি পড়েও থাকেন, এখন আর মনে নেই। আলাপ করার সময় নামটা বলবে আর ওঁর কবিতা খুব পছন্দ করে, সেটা জানাবে। পরের বার দেখা হলে মতামত চেয়ে নিজের দু'-চারটে কবিতা তুলে দেবে হাতে।

মিছিলের যা গতি, কলিকে দেওয়া সময় অনুযায়ী নন্দনে পৌঁছনো যাবে না। এক যদি মিছিল ছেড়ে বেরিয়ে যায় বিহান, তা হলে সম্ভব। তখন আবার রঞ্জন বসুর সঙ্গে আলাপের সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া হবে। রঞ্জন বসু এখনও অনেকটাই দূরে। আজ এখানে আসার ব্যাপারে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল অমিতেশদা। চন্দ্রিমাদের পরিবারের জন্য মিছিলে হাঁটাটা কত জরুরি, বলেছিল বিহান। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অমিতেশদার সেই একটাই কথা, ''একটু অপেক্ষা করে যা, অন্য কোনও রাস্তা বেরিয়ে যাবে ওদের বাঁচানোর। মিছিলে হাঁটলে শাসকদলের স্ট্যাম্প পড়ে যাবে তোর গায়ে। কষ্টেসৃষ্টে পত্রিকাটা করি, লোকে বলবে শাসকদল থেকে টাকা জোগাচ্ছিস তুই।''

বিহান বলেছে, ''পত্রিকা ছাপা তো হয় দু'শো কপি। সব বিক্রিও হয় না। তাতেও যদি লোকের মনে হয় সরকারের কাছে হাত পাতছি, সহযোগী সম্পাদক হিসেবে আমার নামটা এবার থেকে আর দিয়ো না।''

তবু খুঁত-খুঁত করে যাচ্ছিল অমিতেশদা। বলছিল, ''একবার শাসকদলের স্ট্যাম্প লাগলে তোর কবিতারও ভুল বিচার হবে। সব গুণ বাদ দিয়ে রাজানুগ্রহ খুঁজবে পাঠক।''

বিহান হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো করে বলেছে, ''আমার মতো নগণ্য কবি কখন শাসকদলের মিছিলে হাঁটল, কখনই বা বেরিয়ে গেল, কেউ লক্ষ্যই করবে না।''

''করবে। যখনই তোর ছবি চলে যাবে মিডিয়ায়। ছোট জিনিসও মিডিয়ার মাধ্যমে দেখলে বড় বলে ভ্রম হয়।'' বলেছিল অমিতেশদা।

তর্কে যায়নি বিহান। মিডিয়ার ক্যামেরাই তার টার্গেট। তবেই উদ্ধার হবে কাজ। অপেক্ষা করে অন্য পন্থা নেওয়ার মতো সময় নেই হাতে। যে কোনও দিন শ্রীকান্ত মিশ্রকে জড়িয়ে ফেলা হতে পারে ফাঁদে। শ্রীকান্ত মিশ্রকে সে কোনও দিন চোখেই দেখেনি। যায়নি ধুমুরিয়া গ্রামে, যাওয়ার কোনও উপলক্ষ্য ঘটেনি। এমনকী, যার বাবার হয়ে সে লড়ছে, মানে চন্দ্রিমা, ওর চেহারাটাও বিহানের স্মৃতিতে খানিক ঝাপসা। কথাকলি বলেছে বলেই বিষয়টার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে। কীভাবে রিপোর্টটা জোগাড় করা যায়, আলোচনা করতে গিয়ে বিহান যখন দেখল কলি তাকে কিছু না জানিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে এবং রুদ্রকাকু মেয়েকে ফোন করতে বারণ করলেন, প্রথম ধাক্কায় বিহানের মনে হয়েছিল আমার ভারী বয়ে গেছে শ্রীকান্ত মিশ্রকে নিয়ে ভাবতে। ভাবার দায়িত্ব আমার একার নয়, পুরুষমানুষ হিসেবে দৌড়ঝাঁপের কাজটা না হয় আমিই করলাম। খানিক বাদেই মাথায় এল, রুদ্রকাকু আমাকে যোগাযোগ রাখতে বারণ করলেন, হয়তো মেয়েকেও করেছেন। আমি বারণ মেনে চললেও, কলি বাবার কথা গ্রাহ্য করবে না। কালই হয়তো ফোন করে জানতে চাইবে, চন্দ্রিমাদের ব্যাপারটা নিয়ে কত দূর কী করলে?

কলিদের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি ঢোকার পথেই আইডিয়া এসে গিয়েছিল মাথায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সাংবাদিকদের থেকে নিতে হবে রিপোর্ট। যারা বিহানের হয়ে কাজ করছে। রিপোর্টারদের কাছে মোটামুটি নিরপেক্ষ খবর থাকে। প্রয়োজন পড়লে একটু ঝোল টেনে পরিবেশন করে সংবাদ। বিহানের হয়ে যে ক'জন রিপোর্টার শ্রীকান্ত মিশ্রর খবরাখবর নিচ্ছে, ওদের মধ্যে 'সংবাদ প্রবাহ'-এর পথিক বিহানকে একটু বেশিই পছন্দ করে, বিহানের কবিতার কারণে। পথিকদের পত্রিকায় বিহানের লেখা বেরিয়েছে। বিহান পাঠায়নি। অমিতেশদা পাঠিয়েছিল। বিহানের দু'-চারটে কবিতা অমিতেশদার কাছে পড়ে থাকে, জায়গার অভাবে অথবা অপছন্দের কারণে যেগুলো প্রতিশব্দ-তে ছাপতে পারে না। লিটল ম্যাগ করিয়েদের সঙ্গে অমিতেশদার একেবারে নাড়ির টান। এর সুফলে পথিক হয়ে পড়েছে বিহানের নিজের লোক। পথিককে ফোন করে শ্রীকান্ত মিশ্র সম্বন্ধে জানতে চাইল বিহান। প্রথমেই বলে নিয়েছিল, ''একেবারে নিরপেক্ষভাবে সব কিছু বলবে। আমি ওঁকে সেভ করতে চাইছি দেখে, আমাকে খুশি করার মতো কিছু বোলো না।''

পথিক বলেছিল, ''না দাদা, তার দরকার পড়বে না। শ্রীকান্ত মিশ্রর সেরকম কোনও বদনাম নেই। আট-দশটা গ্রামের লোক ওঁকে একডাকে চেনে। আমি বেলদা শহরে থাকি, আপনি বলার আগে থেকেই ওঁর নাম জানতাম। তবে কিনা দল যখন ক্ষমতায় আর উনি অ্যাকটিভলি পার্টিটা করছেন, নিজেদের সমর্থকদের অগ্রাধিকার অবশ্যই দিয়েছেন। না দিলে অত দিন সংগঠনটা চালানোই যেত না।''

''কোন কোন ব্যাপারে অগ্রাধিকার?'' জানতে চেয়েছিল বিহান।

উত্তরে পথিক বলল, ''ওই ধরুন সরকার থেকে গ্রামে যে সব সাহায্য আসে, সার, বীজ, চাষের জমিতে কীটনাশক দেওয়ার স্প্রেয়ার মেশিন, আরও টুকটাক জিনিস পার্টিকর্মী সমর্থকদের দেওয়ার পর অন্যদের দেওয়া হত। তারপর বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা পার্টির লোক পেত প্রথমে। সে এখনও পায়। শ্রীকান্ত কিন্তু ডাক্তারিতে রাজনীতির রং দেখতেন না। বিরোধী দলের লোকেদেরও সমান যত্নে চিকিৎসা করতেন। ডাক্তার

হিসেবে ওঁর বেশ নামডাক আছে।''
পরের দিন বিকেল চারটে নাগাদ ফোন এল বড় নেতার। বিহান তখন সেলসের কাজে মার্কেটে। অচেনা নাম্বার, ভারী কণ্ঠ বিহানের নামটা কনফার্ম করে নিতে চাইতেই, বুঝতে দেরি হয়নি ইনিই সেই নেতা। সঙ্গে-সঙ্গে রূপাঞ্জনার সতর্কবার্তা মনে পড়েছিল, কোনও ভাবেই নেতার পরিচয় জানার চেষ্টা করা চলবে না। উদাসীন গাম্ভীর্যে উনি বলেছিলেন, ''বলুন, শ্রীকান্তবাবুর ডিটেলটা দিন।''
পথিকের থেকে যা জেনেছিল পুরোটাই বলল বিহান, খানিকটা নিস্পৃহ স্বরে। যাতে পক্ষপাত না মনে হয়।
সবটা শুনে নিয়ে বড় নেতা বললেন, ''মিডিয়ার লোক দিয়ে ওঁর এসকর্টের ব্যবস্থা তো করেছেন, তাও এত ভয় কীসের?''
ওখানকার খোঁজখবর নিয়ে ফোন করেছেন, মিডিয়ার উপস্থিতি পছন্দ হয়নি বুঝতে পেরে বিহান বলেছিল, ''আমি কোনও বন্দোবস্ত করিনি স্যার, আমার চেনা কয়েকজনকে ব্যাপারটা বলেছিলাম, তারা হয়তো মিডিয়াকে বলে থাকতে পারে।''
''রিপোর্টাররা তো আপনার রেফারেন্স দিয়েছে শ্রীকান্তবাবুকে।''
কথাটা শুনে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল বিহান। পাশ কাটানোর অক্ষম চেষ্টায় বলেছিল, ''ওদের সঙ্গে তো আমার আলাপই নেই। তা হলে বোধহয় যাদের ঘটনাটা বলেছিলাম, তারাই আমার নাম করতে বলেছে। শ্রীকান্তবাবু আমাকে নামে চেনেন। ওঁর এক ফ্যামিলি মেম্বারের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার।''
ও প্রান্ত থেকে সাড়া না পেয়ে টেনশনে পড়ে গিয়েছিল বিহান। মরিয়া সুরে বলেছিল, ''মিডিয়া কি আর প্রোটেকশন দিতে পারে স্যার? বড় জোর যারা ঘটনাটা ঘটাতে চাইছে একটু সতর্ক হবে। আপনি যদি একটিবার ওখানকার নেতাকে ফোন করে ব্যাপারটা ঘটাতে নিষেধ করে দেন, পার্মানেন্ট সলিউশন হয়ে যায়।''
''ঠিক আছে, দেখছি।'' বলে ফোন কেটেছিলেন নেতা। বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিল বিহান। মনে-মনে রিওয়াইন্ড করছিল নেতার কণ্ঠস্বর, টিভির প্যানেল ডিসকাশনে, টিভিতে দেখানো শাসক দলের সভায় কিংবা কোনও ইন্টারভিউতে এই কণ্ঠের মানুষটিকে দেখেছে কি? কারও সঙ্গেই মেলাতে পারছিল না। রূপাঞ্জনাকে ফোন করে বলেছিল, নেতার সঙ্গে কথা হয়েছে। জানিয়েছিল কৃতজ্ঞতা।
রূপাঞ্জনা গান লেখার শর্ত মনে করালেন।
এত বড় একটা সমস্যা এরকম অনায়াসে সামলে দিতে পারবে, বিহান ভাবতেও পারেনি। সাফল্যের কথা কলিকে জানাতে ইচ্ছে করছিল খুব। পরক্ষণেই নিজেকে শাসন করেছিল, ফোন আমি করব না। প্রথমে ও করুক। কিন্তু পরের দিন ফের ঘোরালো হয়ে উঠল পরিস্থিতি। দুপুর নাগাদ নেতা ফোন করে বললেন, ''শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে কথা হল। উনি জানালেন এখন কোনও সমস্যা নেই। আর আনসেফ ফিল করছেন না। ওঁর পাশে মিডিয়ার লোক আছে, গ্রামের মানুষ আছে, আপনি আছেন। সিচুয়েশন কন্ট্রোলড।''
বক্তব্যে প্যাঁচ আছে অনুধাবন করে বিহান বলে উঠেছিল, ''কোথাও একটা বোঝার ভুল হচ্ছে। মিডিয়া ওখানে কত দিন থাকবে? গ্রামের মানুষ পাশে নেই, আমি ভাল করেই জানি। ওঁর দল ক্ষমতায় নেই, তাই উনি ব্রাত্য। আর আমি এত দূর থেকে ওঁকে কীভাবে গার্ড দেব! আমার সাধ্য কতটুকু! শ্রীকান্ত মিশ্রকে বাঁচানোর জন্য আমাকে তো সেই আপনারই শরণাপন্ন হতে হবে।''
''কিন্তু উনি যদি নিজেই বলেন আমি নিরাপদ, আমার আর কিছু করার থাকে কি? আমি কীসের ভিত্তিতে আমাদের স্থানীয় নেতাকে বলব, ওঁর উপর যেন কোনও অত্যাচার না হয়!''
একটু থেমে ফের বড় নেতা বলেছিলেন, ''আমার তো মনে হচ্ছে আপনি ওঁর জন্য একটু বেশিই চিন্তিত। আমাদের ছেলেরা হয়তো সামান্য হম্বিতম্বি করেছে, সেই শুনে আপনি ঘাবড়ে গেছেন। দূরে আছেন বলেই শ্রীকান্তবাবুকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে এত। গ্রামে যান, পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখুন। বাম আমলের স্মৃতি আপনাকে তাড়া করছে। আমাদের ছেলেরা অত খারাপ নয়। এখন ছাড়ছি। ভাল থাকবেন।''
বড় নেতা ফোন কাটার পর হতবুদ্ধির মতো বসেছিল বিহান। ওঁর শেষের কথাগুলোর মধ্যে দু'টি শ্লেষ স্পষ্ট। দুটোই বিহানের উদ্দেশ্যে। এক, দূরে বসে কারওর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়াটা শৌখিনতার সামিল। খবর ভুল হোক অথবা সত্যি, বাড়িতে বসে না থেকে ধুমুরিয়ায় যাওয়া উচিত ছিল বিহানের। দ্বিতীয় খোঁচাটা হল, বিহান নতুন কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসাটা মেনে নিতে পারেনি। একটা ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখাচ্ছে। নেতার বেশ কিছুটা সময়ও নষ্ট করেছে বিহান, তার জন্য নিজেরই ভীষণ কুণ্ঠাবোধ হচ্ছিল। এসব ছাপিয়ে বিহান যে ব্যাপারটায় সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিল, শ্রীকান্ত মিশ্র কোন ভরসায় হঠাৎ নিজেকে এতটা নিরাপদ ভাবতে শুরু করলেন? আস্থাটা অর্জন করলেন কোন উপায়ে? শ্রীকান্তবাবুকে ফোন করে বিহান। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, ''নতুন কংগ্রেসের কোনও নেতার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আপনার?''
''হ্যাঁ, আমার খবরাখবর নিলেন। কোনও সাহায্য দরকার কিনা জানতে চাইলেন।''
শ্রীকান্তবাবুর কথা শেষ হতেই বিহান বলেছিল, ''আপনি বলে দিলেন সাহায্য লাগবে না? আপনার পাশে অনেকে আছে!''
বিহানের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিল। তাই বোধহয় ওপ্রান্তে নীরব ছিলেন শ্রীকান্ত। নিজেকে সংযত করে শান্ত গলায় বিহান বলেছিল, ''আপনি কী কারণে নিজেকে এতটা নিরাপদ মনে করছেন জানি না। তবে ওই নেতার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা আর আপনাকে কেউ দিতে পারবে না। সুযোগটা আপনি হেলায় হারালেন।''
এর উত্তরে শ্রীকান্ত মিশ্র যা বলেছিলেন, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বিহান। বললেন, ''হেলায় হারাইনি। জেনেবুঝে ওঁর সাহায্য এড়িয়ে গিয়েছি। আমি নাম জানতে চেয়েছিলাম, উনি বলেননি। বললেন, নতুন কংগ্রেসের একজন কর্মী বলে ধরে নিন। আপনার সুপারিশে খবর নিচ্ছেন সেটা বলেছেন। তবে উনি যে নতুন কংগ্রেসের একজন উপরের সারির নেতা, কথা বলার ধরন শুনেই বুঝেছিলাম। এই নেতার কাছে আমি যদি সাহায্য প্রার্থনা করতাম, নতুন কংগ্রেসের উপর মহলের কাছে প্রমাণ হত, গ্রামের দিকে আমাদের পার্টি নিঃশেষ। শ্লাঘা এবং স্বস্তিবোধ করত তারা। আমি সেটা হতে দিতে চাইনি। বোঝাতে চেয়েছি ফুরিয়ে যাইনি আমরা।''
শ্রীকান্ত মিশ্র বলে যাচ্ছিলেন, ''আপনি আমার জন্য নিরাপত্তার যে ব্যবস্থাটুকু করেছেন, এতেই মনে হচ্ছে ওদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তারপর দেখি না কী হয়। আপনার লেখা গান আমি শুনেছি। খুব সুন্দর। আপনাকে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে হয়। সময় করে একবার যদি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন...।''
বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, ওর মুখ থেকে 'আপনি-আজ্ঞে, পায়ের ধুলো' এসব শুনতে অস্বস্তি লাগে বিহানের। শ্রীকান্ত মিশ্রকে নিয়ে ভাবা বন্ধ রেখে নিজের কাজে মন দিয়েছিল বিহান। মনে হয়েছিল মানুষটার মনের জোর আছে। ওই জোরটাই ওঁকে

অনেকটা নিরাপত্তা দেবে। কিন্তু কোথায় কী! দিন চারেক বাদেই চন্দ্রিমার ফোন, "বিহানদা, আবার আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে। এখানকার পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। বাড়িতেও বিরাট গোলমাল লেগেছে।"

চন্দ্রিমা যা বলল মোটামুটি এরকম, নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা ওর কাকাকে শাসিয়েছে মন্দিরের পুরোহিতের কাজটা করতে দেবে না। কাকা চাষ দেখাশোনা করেন, ওরা বলছে ফসল কেটে নেবে। ভয় পেয়ে কাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওদের পার্টিতে জয়েন করবেন। সেই সিদ্ধান্তে এতটাই চটেছেন শ্রীকান্ত মিশ্র, পরিবারসুদ্ধু ভাইকে বের করে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। কাকারা আছে ধুমুরিয়াতে, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে। এখনও নতুন কংগ্রেসে যোগ দেননি কাকা, দিতে অবশ্য হবেই। খুড়তুতো ভাইটাও নাম লেখাবে ওদের দলে। চন্দ্রিমার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখেছে কাকার ছেলে দুলাল। ভাইয়ের মারফত চন্দ্রিমা জেনেছে মিডিয়ার যাতায়াত দেখে নতুন কংগ্রেসের গুন্ডারা বুঝে গেছে শ্রীকান্ত মিশ্রকে জরিমানা বা মারধর করা যাবে না এখন। কাগজে, টিভিতে খবর বেরিয়ে যাবে। সাজানো ঘটনায় চন্দ্রিমার বাবাকে ফাঁসিয়ে মারধর, হেনস্থা করবে ওরা। কোনও মহিলাকে রোগিণী সাজিয়ে ডেকে পাঠানো হবে শ্রীকান্ত ডাক্তারকে, মহিলা শ্লীলতাহানির দায় চাপাবে ওঁর উপর। সরকারি হাসপাতাল থেকে বেশ কিছু ওষুধ-ইনজেকশন এনে গোপনে ঢুকিয়ে দেবে চন্দ্রিমাদের বাড়িতে, তারপর নিজেরাই সন্ধান চালিয়ে বের করবে ওই ওষুধ। শ্রীকান্ত মিশ্রকে চোর অপবাদ দিয়ে মারধর করবে। কোনও মরণাপন্ন রোগীকে দেখে শ্রীকান্ত মিশ্র যেই বেরিয়ে যাবেন, ওরা রোগীকে মেরে ফেলে বলবে শ্রীকান্ত ডাক্তারের ভুল ওষুধে মারা গিয়েছে... ফাঁসানোর এরকম আরও অনেক প্ল্যানের কথা ভাবছে নতুন কংগ্রেসের গুন্ডারা। যে কোনও দিন এর একটা কাজে লাগাবে। চন্দ্রিমা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। বাবাকে ওদের প্ল্যানের কথা জানিয়ে বলেছে, চলো আপাতত দাদার কাছে চলে যাই। শ্রীকান্ত রাজি হননি শিলিগুড়িতে যেতে। তাঁর আশঙ্কা, ফিরে এসে দেখবেন বসতবাটিটাও মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ওরা। বিহানকেও ফোন করতে বারণ করেছেন শ্রীকান্ত মিশ্র। মনে হয়েছে বিরক্ত করা হচ্ছে। বিহান নাকি ওঁর জন্য যথেষ্টর চেয়ে বেশি করেছে। চন্দ্রিমা বাবার কথা না শুনে ভয়ে আতঙ্কে ফোন করল বিহানকে।

মনে হয়েছে বিরক্ত করা হচ্ছে। বিহান নাকি ওঁর জন্য যথেষ্টর চেয়ে বেশি করেছে। চন্দ্রিমা বাবার কথা না শুনে ভয়ে আতঙ্কে ফোন করল বিহানকে।

ওই কথোপকথন থেকেই বিহান জানল কথাকলি বরের সঙ্গে কসবার একটা ফ্ল্যাটে থাকছে। আলাদা হয়ে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। চন্দ্রিমা প্রথমে কলিকে ফোন করে এখনকার সমস্যা বলতে গিয়েছিল, কলিই ওকে বলে বিহানকে সব জানাতে। বরকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ভাগিয়ে নিয়ে আলাদা থাকার মেয়ে তো কলি নয়। তাছাড়া ওর তো শুধু শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নিয়ে প্রবলেম ছিল না, বনত না নির্মাল্যর সঙ্গেও। হঠাৎ এধরনের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কী? বিহানকে কিছু জানালোও না! কলির চিন্তা ছেড়ে রূপাঞ্জনাকে ফোন করেছিল বিহান। বড় নেতার সঙ্গে শেষ কী কথা হয়েছে, চন্দ্রিমাদের এখনকার পরিস্থিতি, সমস্তটা জানিয়ে বলেছিল, "জানি একই ঘটনায় দু'বার করে আপনাকে জ্বালাচ্ছি। আমি ভাবতে পারিনি ব্যাপারটা আবার এরকম ঘোরালো হয়ে উঠবে। এখনই কিছু একটা ব্যবস্থা না নিলেই নয়।"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি। বিরক্তও হইনি। কিন্তু ব্যস্ত মানুষটার কথা একবার ভাবো। ওই লেভেলের নেতা, দম ফেলার ফুরসত নেই। আগের বার এই কেসটাতে কত ফোন করেছেন, ধরেছেন বলো। নিটফল, শ্রীকান্ত মিশ্র জানিয়ে দিয়েছেন নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন না। তার মানে আমি, তুমি মিলে অযথা ওঁর কিছু সময় নষ্ট করলাম। এরপর আবার আমি কোন মুখে বলি, শ্রীকান্ত মিশ্রকে বাঁচান।"

কথাটা বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন রূপাঞ্জনা। অনুরোধের চাপ বাড়িয়েছিল বিহান। বলেছিল, "কিছুই কি করা যায় না? ওঁকে একটু যদি বোঝানো যায়। আমিই বোঝানোর চেষ্টা করতাম, বারবার বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাও চাইতাম। কিন্তু উনি আমার ফোন ধরবেন না।"

"বারবার রিকোয়েস্টের ভয়েই তো উনি নিজের পরিচয় দিতে চান না সমস্যাপীড়িতদের কাছে। একটার সমাধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রবলেমের কথা বলবে। তুমি আবার একটা প্রবলেমে দু'বার করে ওঁর হস্তক্ষেপ চাইছ। আর আমি বললেই যে উনি আমার কথা শুনবেন, তা নয়। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝেই গতবার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন। শ্রীকান্তবাবু খুব ভুল করেছেন সাহায্য না নিয়ে।"

কোনও আশা নেই, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রূপাঞ্জনার কথায়। সৌজন্যমূলক কোন কথাটা বলে ফোন কাটা যায় ভাবছিল বিহান। এবং একটা ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, চন্দ্রিমাদের ফোন আর ধরবে না। তার তো আর কিছু করার নেই। এমন সময় ফোনের ও প্রান্ত থেকে রূপাঞ্জনা বলে উঠেছিলেন, "আচ্ছা, লেট আস ট্রাই। একটা কাজ করো তো, পরশুদিন টালিগঞ্জ থেকে নন্দন অবধি মিছিল যাবে। শাসক দল অনুগামী আর্টিস্টদের মিছিল। তুমি চলে এসো, আমিও থাকব। মিছিলে অনেক সিনেমা আর্টিস্ট থাকবে। ভালই কভারেজ দেবে মিডিয়া। তুমি যে মিছিলে হাঁটছ, দেখা যাবে টিভিতে। খবরের কাগজে ছবি উঠে গেলে তো আরও ভাল। পার্টির পক্ষ থেকে ক্যামেরা তো থাকবেই, কে এসেছে, আসেনি পুরোটাই রেকর্ড হবে। ওইসব রেকর্ডেড এভিডেন্স থেকে তোমার ছবি স্পষ্ট করে আমি ওঁকে বলব, ছেলেটা হোল হার্টেডলি পার্টিকে ভালবাসে। আর্টিস্টদের সংগঠনে অ্যাকটিভলি খাটে। ওর জন্য আর একবার ব্যাপারটা আপনি দেখুন।"

মিছিল এক্সাইড মোড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে। নন্দন তো আর একটু এগোলেই। রঞ্জন বসুও বিহানের থেকে হাত দশেক দূরত্বে, পা চালিয়ে গিয়ে কথা বললেই হয়। সমস্যা অন্য জায়গায়, রঞ্জন বসুর পাশে বিশাল নাট্য ব্যক্তিত্ব উদয়ন সোম। সিনেমাতেও অভিনয় করেন। দু'জনকে ঘিরে রয়েছে রিপোর্টাররা। ক্যামেরা চলছে, ওঁরা বাইট দিচ্ছেন। এসব ভেদ করে কীভাবে কবি রঞ্জন বসুর কাছে পৌঁছবে বিহান? মিছিল গন্তব্যে এসে গিয়েছে প্রায়, তাই মিডিয়ার এত হুড়োহুড়ি। কভারেজে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না। রঞ্জন বসু একবার উদয়ন সোমের সঙ্গে কথা বলছেন, পরক্ষণেই রিপোর্টারদের

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আজ বোধহয় আর আলাপ করা হল না... ভাবতে-ভাবতে বিহান রঞ্জন বসুর একদম পিছনে চলে এসেছে। বিহানের উসখুসানি টের পেলেন উদয়ন সোম, একটু সরে গিয়ে রঞ্জন বসুকে বললেন, ''ও বোধহয় তোমাকে কিছু বলতে চায়।''

উদয়ন সোমের সৌজন্য এবং সংবেদনশীলতায় মুগ্ধ হল বিহান। মানুষ এমনি-এমনি বড় হয় না। মনটা বড় মাপের হতে হয়। উদয়ন সোমের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় এসে দাঁড়াল বিহান। রঞ্জন বসুর উদ্দেশ্যে বলল, ''আপনার কবিতার আমি একজন বড় ভক্ত।''

''ও!'' বলে বিহানকে একবার দেখলেন রঞ্জন বসু। ফের সামনে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলেন। একটু বাদে জানতে চাইলেন, ''তোমার নাম কী?''

''বিহান মুখার্জি।''

রঞ্জন বসু কপালে ভাঁজ ফেলে বিহানের দিকে ফের তাকালেন। বললেন, ''সুজন মাঝির বিহান মুখার্জি?''

সলজ্জ হাসি হাসে বিহান। এই প্রথম মনে হয় গান লেখা সার্থক হল। রঞ্জন বসু বিহানের হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, ''ওঃ, গান দুটো কী লিখেছ! বাংলার প্রকৃত রূপ আবার ধরা পড়ল তোমার লেখা গানে। তুমি তো কবিতাও লেখো। তোমার কবিতা আমি পড়েছি। রোববার দেখে একদিন চলে এসো আমার বাড়িতে, চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে। আমার ফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে?''

''নেই। জোগাড় করে নেব।'' বলল বিহান।

মিষ্টি করে হাসলেন রঞ্জন বসু। বললেন, ''আমরা তো এসেই গেলাম। পরের দেখায় বাকি গল্প করা যাবে।''

ঘাড় হেলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিহান। উদয়ন সোমের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, বিহান কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে। অপারেশন সাকসেসফুল। একসঙ্গে দুটো।

নন্দন বলা হলেও, নন্দন চত্বরে ঢুকবে না মিছিল। রবীন্দ্রসদন ঘুরে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে শেষ হবে যাত্রা। মিছিলের মাঝে দাঁড়িয়ে রূপাঞ্জনাকে খুঁজল বিহান। যাওয়ার আগে বলে যাবে। পেল না। উনি কি আগেই বেরিয়ে গেলেন? গেট পার হয়ে নন্দন চত্বরে ঢুকল বিহান। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে। কলিকে তো দেখা যাচ্ছে না! হাতঘড়িটা একবার দেখে, একঘন্টা পার হয়ে গেছে! লেট খুব একটা করে না কলি। সহজে লোকেট করা যায় যে গাছতলার বেদিটা, তাতে গিয়ে বসে পড়ে। অফিসে একটা ফোন করা উচিত? ঝুঁকিটা নেওয়া যাবে না। এদিকে কলি এসে কতটা সময় নেবে বোঝা যাচ্ছে না।

ফেঁসে যাবে বিহান। আজ অফিস থেকে কোনওক্রমে বেরিয়ে এসেছে। বিরাট কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন কিশোরীলালজি। বিহান ঠিক করেছিল একটা অবধি অফিসে কাটিয়ে টালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। দুটো থেকে শুরু হবে মিছিল। আজ আর মার্কেট ভিজিট দেবে না। ফার্স্ট আওয়ারে অফিসে ঢুকেই তার অপেক্ষায় থাকা দুঃসংবাদটা শুনল বিহান। কিশোরীলালজি জানালেন সোদপুরের একটা দোকানে কোম্পানির পার্সেল খুলে দেখা গেছে দেড়শো পিস শাড়ির মধ্যে একশো পিস ফাটা। এত বেশি সংখ্যক ডিফেক্ট আগে বেরোয়নি। এক্সচেঞ্জ করে দেবে কোম্পানি। যেমন দেয়। মাসখানেক সময় লাগবে। সেই সময়টাই নেই সোদপুরের শোভাশ্রী বস্ত্রালয়ের। খদ্দেরের নমস্কারি শাড়ি ওগুলো। বিয়ে এক সপ্তাহ বাদে। বিহানকে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা সামলাতে হবে। পাঁচ-ছ'টা দোকান থেকে মাল তুলে এক্সচেঞ্জের প্রক্রিয়া সারতে হবে আজকেই। ওই পাঁচ-ছ'টা দোকান সহজে রাজি হবে না শাড়ি দিতে। কারণ দুটো। এক, কম্পিটিটর শোভাশ্রীকে বিপদে ফেলা। দুই, তাদের যে দশ-কুড়িটা করে শাড়ি, ফেরত পেতে লাগবে দিন পনেরো। মুম্বইয়ের হেড অফিস থেকে আসবে শাড়ি। সকলেই ক্যাশ পয়সায় কেনে শাড়ি। নগদে কেনা শাড়ি ছেড়ে দিয়ে স্টক দুর্বল করতে চাইবে না কোনও দোকানদার। ওদের রাজি করাতে পারে একমাত্র বিহান। অফিসের আর কোনও সেল্‌সম্যানের সেই ক্যারিশ্মা নেই। সবটা শুনে নিয়ে কিশোরীলালজির মুখের উপর বিহান বলে দিল, আজ আমার পক্ষে মার্কেটে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ভীষণ আর্জেন্ট কাজ আছে।

এই কথা অন্য যে কোনও বেসরকারি কোম্পানির মালিককে বললে চাকরি আজই 'নট' হয়ে যেত। এরকম একটা সংকটে স্টাফ বলছে পার্সোনাল কাজ আছে। কিশোরীলালজি বলেই জানতে চাইলেন, ''কেয়া কাম হ্যায় তুমহারা?''

''মা কো লে কর গুরুদেব কে পাস জানা হ্যায়। বেনারস সে আয়ে হ্যায়ঁ গুরুদেব।''

মা, গুরুদেব এসব কিশোরীলালজির কাছে খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। বাঙালি মালিক হলে পার পেত না বিহান। কিশোরীজি বললেন, ''ঠিক হ্যায়, তুম যাও। মেরি তরফ সে গুরুদেব কো প্রণাম দেনা। কিতনে বজে ফ্রি হোগে তুম?''

''পাঁচ সে ছ' বজে কে অন্দর।''

''ফ্রি হোকে তুরন্ত মেরে কো ফোন করনা। তব এক দুসরা সেল্‌সমম্যান উয়াহা ভেজতা হুঁ। উয়ো গর কুছ না কর সকে তো তুমকো জানা পড়েগা।''

মিছিল শেষ হল পাঁচটায়। কিশোরীজিকে ফোন করে, দরকার বুঝে সোদপুরে চলে যেত বিহান। ওরকম একজন ভাল মালিকের জন্য এটা করা উচিত ছিল তার। কলি দেখা করতে বলে সব গন্ডগোল পাকিয়ে দিল। এখন নিজেরই পাত্তা নেই। ওকে একটা ফোন করবে কি? দরকার নেই বাবা, এমন কিছু দেরি হয়নি। এক্ষুনি বলবে এইটুকু অপেক্ষা করতে এত কষ্ট! কে আগে? চাকরি না কলি? এই নিয়ে এখন ধর্মসংকটে বিহান। চাকরিটা আবার কলির জন্য হয়েছিল। বিহান তখন অলক্তিকার সঙ্গে ঘুরছে। কলিই আলাপ করিয়ে দিয়েছে তার ডাকসাইটে সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে। সিনেমা হল, সন্ধে নামা পার্কে অলক্তিকা নিজেই বিহানের হাত টেনে নিচ্ছে আদরের জায়গায়। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিল বিহান। অলক্তিকা যেদিন বলল, ''আজ দুপুরে আমাদের ফ্ল্যাটে চলে এসো। বাড়ির কেউ থাকবে না।'' বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল বিহান। ফ্ল্যাটে কত দূর কী ঘটবে, ভালই আন্দাজ করতে পারছিল। বিহানের কেন জানি মনে হয় কোনও মেয়ের সঙ্গে সমস্ত রকম শরীরী সম্পর্ক স্থাপন হলে বড় ধরনের ঋণের বোঝা চাপে কাঁধে। মেয়েটি যদি বিহানকে বলে আমাকে বিয়ে করো, ঋণের কারণে না করতে পারবে না বিহান। অগত্যা কলির শরণাপন্ন হতে হল। কারণ, ওই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অলক্তিকার সঙ্গে। সব শুনে কলি বলল, ''বাবাঃ, তোমরা তো অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছ দেখছি। বাকিটুকু থেকে অলক্তিকাকে বঞ্চিত রাখছ কেন?''

সম্পর্কটা নিয়ে নিজের অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছিল বিহান। কলি বলেছিল, ''খুব একটা ভুল কিছু ভাবোনি। তোমার মতো সাদামাটা ছেলের সঙ্গে বেশি দিন পোষাবে না অলক্তিকার।'' একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, ''চলো ওদের ফ্ল্যাটে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।''

কথাটা শুনে থতমত খেয়ে গিয়েছিল বিহান। এরকম ড্রাসটিক স্টেপ আশা করেনি। বলেছিল, ''এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? অন্য কোনও রাস্তা ভাবো। খামোকা একটা সিন

হবে।"

"হোক না সিন। এই সিনটা চিরদিন মনে রাখবে। সুন্দরী বলে বড্ড ডাঁট। মনে করে ওর জন্য সব ছেলে অ্যাভেলেবল। আজকের পর থেকে ধারণাটা ভাঙবে।"

কলির উৎসাহ দেখে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, বান্ধবীর ডাঁট ভাঙার জন্যই বিহানের সঙ্গে আলাপ করিয়েছে কি? যতটা ভরসা করেছিল বিহানের উপর, অনেকটাই খোয়া গেছে। বাদবাকিটা হারাতে চায়নি। তাই বিহানের সঙ্গে গিয়েছিল অলক্তিকাদের ফ্ল্যাটে। স্বাভাবিক ভাবেই অলক্তিকা রেগে কাঁই। সরাসরি খারাপ ব্যবহার করতে পারছে না। চা বানিয়ে নিয়ে এসে কলিকে ঠেস দিয়ে বলল, "আছিস ভাল! এক লাভার বাইরে চাকরি করতে গিয়েছে, পার্টটাইম লাভারকে নিয়ে ঘুরছিস।"

কাপে চুমুক দিয়ে স্বাভাবিক গলায় কলি বলেছিল, "বিহানকেই ফুলটাইম করে নিতাম। কিন্তু ও যে কাঠ বেকার। বাবা-মা'র কাছে কোন মুখে ওর কথা তুলব। তাই নির্মাল্যকেই বেছে নিতে হয়েছে।"

বিহানকে বেশি ভালবাসে বোঝাতে গিয়ে পরোক্ষে ছোট করা হল বোঝেনি কলি। কাঠবেকার কথাটা গায়ে লেগেছিল বিহানের। তার চাকরি থাকলে, কলি তাকে মোটেই বিয়ে করার কথা ভাবত না। নির্মাল্যর কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কথার দাম কলির কাছে অনেক বড় ব্যাপার। তবু তাচ্ছিল্যটা মেনে নিতে পারেনি বিহান। পাড়ার দীপঙ্করদা ক'দিন ধরেই বিহানকে বলছিল, তুই আমার চাকরিটা কর। দিল্লিতে বেটার চাকরির অফার পেয়েছে দীপঙ্করদা। স্যালারি এখানকার চাকরির থেকে অনেক বেশি। ফ্ল্যাট পাবে থাকার। এখানের কাজটা ছাড়তে পারছে না মালিক বড় ভাল বলে। একটা সৎ, কর্মঠ ছেলে এই মালিককে না দেওয়া অবধি দীপঙ্করদা চাকরি ছাড়তে পারছে না। মনে হচ্ছে মালিকের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। বিহানকে উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট বলে মনে করে দীপঙ্করদা। সেই জন্যই অফারটা করছে।

মালিক ভাল না হলে, স্টাফ কেন তাঁর জন্য এত ভাবতে যাবে? অফারটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কাজের ধরনটা বিহানের পছন্দ হচ্ছিল না। রোদে জলে ঘুরে শাড়ি-কাপড় ফেরি করতে সায় দিচ্ছিল না মন। স্যালারি কম হলেও অফিসে বসে কাজ পছন্দ করে বিহান। কলির তাচ্ছিল্য এতটাই তাতিয়ে দিয়েছিল তাকে, দীপঙ্করদাকে গিয়ে বলল, "চাকরিটা আমি করব।"

কিশোরীলাল বাজাজের কাছে নিয়ে গেল দীপঙ্করদা। রেফারেন্সটাই যথেষ্ট ছিল। প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে নিয়ে কিশোরীজি কাজে বহাল করলেন বিহানকে। বাড়িতে ফিরে খবরটা দিল বিহান। গরমে হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া আসার মতো খুশি ছড়িয়ে পড়ল বাড়িতে। তারপর গিয়েছিল কলির কাছে। বিহান বলেছিল, "আমি চাকরি করি না বলে আর কারওর কাছে তোমাকে আক্ষেপ করতে হবে না। কাল থেকে এক জায়গায় জয়েন করছি। স্যালারি যদিও নির্মাল্যর চেয়ে অনেক কম। কী করা যাবে! যার যেমন কোয়ালিফিকেশন, সে তেমনটাই রোজগার করবে।"

"সেদিনের কথাটা তার মানে খুব আঁতে লেগেছিল।" বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে গালে চুমু খেয়েছিল কলি। ঠোঁটে কোনও দিন খায়নি। গালে ক'বার খেয়েছে, কড় গুনে বলে দিতে পারবে। মন দিয়ে ভাবলে ক'টা নাগাদ খেয়েছে, বলবে সেটাও।

চেয়ারে ফিরে গিয়ে কলি বলেছিল, "বাড়ির লোক নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে? কথাটা বলা আমার বৃথা যায়নি।"

ফের বিহানের সন্দেহ হতে শুরু করেছিল, কলি সেদিন দু'টো পারপাস মাথায় রেখে কথাটা বলেছিল। খুব সূক্ষ্ম এবং জটিলভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে পারে। ওর বুদ্ধির নাগাল পাওয়া ভারী কঠিন।

"এই যে মশাই, পরের বউয়ের জন্য এরকম হাঁ করে বসে থাকতে লজ্জা করে না?" সামনে দাঁড়িয়ে একমুখ হাসি নিয়ে কথাটা বলল কলি। পরনে সুন্দর একটা শাড়ি, মাথায় সিঁদুর এখন বেশ স্পষ্ট।

ওর কথা পাত্তা না দিয়ে বিহান বলে, "কী ব্যাপার, এত দেরি হল! জ্যামে পড়েছিলে না কি?"

বিহানের পাশে এসে বসতে বসতে কলি বলল, "না, জ্যামে পড়ার কোনও চান্স ছিল না। তোমাকে যখন ফোনটা করলাম, রবীন্দ্রসদনের কাছেই। ভাবলাম এক ঘন্টার জন্য বাড়ি ফিরে লাভ নেই, এখানেই ওয়েট করি। অ্যাকাডেমির গ্যালারিতে পেন্টিং এগজিবিশন দেখতে ঢুকে গেলাম।"

সামনে চা'ওলা এসে দাঁড়াল। কলি বলল, "দুটো লেবু চা দাও।" তারপর বিহানের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'আমার বাড়ি এখন কসবায় জানো তো?'

"জানি। তা গ্যালারিতে কী এমন ঘটল, যে এত দেরি?" জানতে চাইল বিহান।

"সেটাই বলছি।" বলে কলি চা'ওলার থেকে চায়ের প্লাস্টিক কাপ নিয়ে বেদিতে রেখে বলল, "সব ছবিই খুব ভাল বুঝলে। কিন্তু একটা পেন্টিং আমাকে সময় ভুলিয়ে দিল। দেখছি তো দেখেই যাচ্ছি। ঘোর যখন ভাঙল, ঘড়িতে দেখি এক ঘন্টা অনেক আগেই পার। ইচ্ছে ছিল আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা করার। হল না।"

"ছবিটা কীরকম? অ্যাবস্ট্র্যাক্ট?" চা খাওয়ার ফাঁকে জানতে চাইল বিহান।

"ভাবনাটা অ্যাবস্ট্রাক্ট। আঁকাটা ইমপ্রেশনিস্ট রীতিতে। অয়েল পেন্ট। রাতের দৃশ্য। আধ-খাওয়া চাঁদ আর তারা। হাইরাইজ বিল্ডিং-এর জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক যুগল, আন্দাজ হয় স্বামী-স্ত্রী। দু'জনে ভাসছে। পুরুষটির পিঠে মেয়েটি। দু'জোড়ার বদলে এক জোড়া ডানা ওদের। সেটা ঠিক করে বোঝা যাচ্ছে না। দু'টো শরীর যেখানে মিশেছে, ডানা বেরিয়েছে ওখান থেকে। অর্থাৎ ওরা আলাদা হয়ে উড়তে পারবে না। সময়টা যেহেতু রাত এবং জানলা দিয়ে ভেসে বেরিয়ে আসা দেখে ধরে নেওয়া যায় স্বপ্নভ্রমণ। ওরা নিশ্চয়ই কোনও অসুখী দম্পতি। সম্পর্কটাকে কতটা নিরুপায় ভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে, বোঝাতে ওরকম একটা স্বপ্নভ্রমণের ছবি আঁকা হয়েছে। স্বপ্নতেও ওরা আলাদা উড়তে পারে না।"

বিহান কোনও মন্তব্য করে না। ছবিটা না দেখে করবে কী করে? চা শেষ দু'জনেরই। দুটো কাপ নিয়ে ওয়েস্ট বক্সে ফেলে এল বিহান। বেদিতে বসে বলল, "কী কারণে দেখা করতে চাইলে বলো?"

ছবির ভাবনা কাটিয়ে উঠেছে কলি। বলল, "তার আগে তুমি বলো, এত দিন ফোন করোনি কেন?"

"ফোন তো ইদানীং তুমিই করো। তোমার সব খবর তো পাচ্ছিলামই, তাই আর করা হয়ে ওঠেনি।"

আসল কারণ এড়িয়ে গেল বিহান। ঈষৎ বিমর্ষ গলায় কলি বলছে, "সত্যিই আমার দরকারেই বারবার তোমাকে ফোন করি, তোমার কখনও আমাকে দরকার পড়ে না।"

নন্দন চত্বরে নিশ্চুপে সন্ধে নামছে। জ্বলে ওঠা আলোকস্তম্ভ চোরাগোপ্তা অন্ধকার ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। আজ আর কিশোরীজিকে ফোন করা হল না বিহানের, ফের কলি বলে

উঠল, "জবার একটা খোঁজ পেয়েছিলাম, জানো। সাঁতরাগাছির একটা ফ্ল্যাটে কাজ করছে। আজ গিয়েছিলাম সেখানে। ক'দিন হল ছেড়ে দিয়েছে কাজ। এলাকাও ছেড়েছে। কাছেই জগাছার এক ভাড়াবাড়িতে। সেখানে অবশ্য আমি যাইনি। অচেনা জায়গা, একা যাওয়ার সাহস নেই। ওরা এখন ডোমজুড়ের দিকে কোন একটা গ্রামে চলে গেছে। জগাছার প্রতিবেশীরা বলতে পারবে কোন গ্রাম। চলো, একদিন আমি, তুমি মিলে জগাছায় যাই, ঠিকানা নিয়ে জবাদের খুঁজে বের করি।"

"ওরে বাবা, তোমার দেওয়া চন্দ্রিমাদের কাজটাই তো এখনও শেষ হল না। আবার নতুন অ্যাসাইনমেন্ট!" অনীহাটা মজার সুরে প্রকাশ করল বিহান।

তাতে কলি এতটুকু প্রভাবিত হল না। সিরিয়াস নোটে বলতে থাকল, "হ্যাঁ, ঠিকই। চন্দ্রিমা ফোন করেছিল আমাকে। বলল, আবার কী সব গোলমাল হয়েছে ওদিকে।। আমি তোমাকে জানাতে বললাম। ইটস ও কে, ওদের ব্যাপারটা তুমি সামলে নাও, তারপর না হয় জবাদের খোঁজার কাজে নামব আমরা।"

নন্দন চত্বর এখন আলোকময়। চারপাশে হাসিখুশি মুখ-চোখ। এরই মাঝে আড়াল খুঁজে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে যুগলরা। বিহানদের দেখলে মনে হবে এইমাত্র ঝগড়া হয়েছে তাদের। কলি বলে ওঠে, "আর একটা ব্যাপারও আমায় চিন্তায় ফেলেছে খুব।"

"আবার কী হল?" 'আবার' কথাটা লম্বা করে উচ্চারণ করল বিহান।

দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে কপাল কুঁচকে বলতে থাকল, "কসবায় যে ফ্ল্যাটে এখন আছি, দাম চল্লিশ লাখ টাকা। এত টাকা নির্মাল্য পেল কোথায়?"

"লোন নিয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে।" বলল বিহান।

কলি মাথা নেড়ে বলে, "নেয়নি। প্রোমোটারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছি, টোটাল অ্যামাউন্ট একটা চেকে পেমেন্ট করেছে। ব্যাঙ্ক ফ্ল্যাটের ব্যাপারে কোনও ভেরিফিকেশনে আসেনি। পুরো টাকাটাই নির্মাল্য দিয়েছে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে। ওর যা স্যালারি, এই ক'বছরে এত টাকা জমানো সম্ভব নয়। সালকিয়ার বাড়িতে সংসার খরচের জন্য আগে যত টাকা দিত, এখন সেই টাকাই দেয়। এবং সেটা ওর দাদার অ্যামাউন্টের তুলনায় বেশি। কারণ, দাদার চাকরিটা নির্মাল্যর মতো অত ভাল নয়।"

"ফ্ল্যাটের পুরো টাকাটাই হয়তো নির্মাল্যর নয়, ওর বাবাও কিছুটা দিয়েছেন। ব্যাঙ্কের কোনও ফিক্সড ম্যাচিওর করেছে।"

"কতটা? দুই থেকে চারের বেশি তো নয়। বাকি রইল অনেকটা। তাছাড়া নির্মাল্যর আত্মীয়দের থেকে শুনছি, শ্বশুরমশাই বলছেন ছেলে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে। ওঁকে নিশ্চয়ই নির্মাল্য সেই কথাই বলেছে। এমনও হতে পারে ছেলের শেখানো কথা বলছেন। হয়তো জানেন ছেলে কীভাবে টাকাটা জোগাড় করেছে। অসৎ উপায়ে রোজগার করা টাকা।"

"এত দ্রুত এটা ভেবে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। সৎভাবে টাকা জোগাড়ের অনেক রাস্তা আছে। হয়তো শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রেখেছিল। সেটা ভাঙিয়ে ফ্ল্যাটটা কিনেছে। অফিস থেকেও অনেক সময় লোন পাওয়া যায়।"

"সে কথা আমায় বলছে না কেন? খালি এড়িয়ে যাচ্ছে। ওর একটাই কথা, কাঁচা টাকায় তো ফ্ল্যাট কিনিনি, ব্ল্যাকমানির প্রশ্ন আসছে না, চেকে পেমেন্ট করেছি। ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে শো করতে হবে টাকাটা কোথা থেকে এসেছে, সেটা যখন পারব, তোমার এসব ব্যাপার নিয়ে না চিন্তা করলেও চলবে।"

"ঠিকই তো বলেছে। রোজগার করে সুখে থাকার বন্দোবস্ত করেছে তোমার। যেটা ওর কর্তব্য। এবার তুমি একটু মন দিয়ে সংসারটা করো তো। বাচ্চাকাচ্চা হোক।"

"হিসেব না মেলা পর্যন্ত বাচ্চার কথা ভাবা উচিত হবে না। টাকা কীভাবে এসেছে, তার কোনও কাগজপত্র দেখাচ্ছে না আমাকে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে প্রোমোটারকে নগদ টাকাই দিয়েছে। ব্ল্যাকমানি। শিখিয়ে রেখেছে, আমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করি, পেমেন্ট চেকে হয়েছে যেন বলে। সব কিছু না জেনে আমি যদি বাচ্চা ধারণ করি, পৃথিবীতে আনি তাকে, বড় হয়ে যখন জানতে পারবে, বাবা অসৎ পথে রোজগার করেছে, ঘুষ খেয়েছে। তখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, ঘুষখোরের সন্তান পরিচয় কেন বহন করব আমি? কী জবাব দেব তাকে?"

কোনও মানুষই দুঃখ পেতে চায় না অথচ কত সহজে মানুষের মন ভেঙে দেওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি সুখী হবে না বলে পণ করে থাকে, সেই প্রাচীর কোনও ভাবেই ভাঙা যায় না। বিহান এখন বুঝতে পারছে এগজিবিশনের অসুখী দম্পতির ছবিটা কেন মন কেড়েছিল কলির।

৬

"বলি, ও শ্রীকান্তদা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? শ্রীকান্তদা!"

গলাটা চেনা চেনা ঠেকল শ্রীকান্ত মিশ্রর। এখন রাত। সত্যিই চোখ লেগে গিয়েছিল। শ্রীকান্ত বসে আছেন ওষুধঘরে। কখন যে টেবিলে মাথা রেখে চোখ বুজে ফেলেছেন, খেয়ালই নেই। আবার ডাক, "শ্রীকান্তদা গো, ওঠো। কথা আছে।"

এত রাতে কে ডাকছে? পেশেন্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে। রোগ ছাড়া রুগির আলাদা কোনও কথা থাকে না। এত রাতে রুগি নিজে আসবেইবা কী করে! কল আসতে পারত। কিন্তু কথা

আছে বলছে কেন? চোখ কচলে শ্রীকান্ত মিশ্র যা দেখলেন, গায়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে গেল। আকস্মিকতার অভিঘাত। ভয় ততটা পাননি। দালানের খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল। চোখের ভ্রম।

"না গো, শ্রীকান্তদা, যা দেখছ, ঠিকই দেখছ।"

মনে হল কথাটা কঙ্কালটাই বলল। শ্রীকান্ত মিশ্র বললেন, "দ্যাখো, তোমার গোটাটাই কারসাজি। ভূতটুতে ভয় পাই না আমি। খামোকা সময় নষ্ট করছ নিজের, আমারও।"

"তোমাকে ভয় দেখাতে আসিনি আমি। ভূতে বিশ্বাস করো না তাও জানি। তোমার উপকার করতে এসেছি বা বলতে পারো প্রতিদান দিতে আসা।"

"সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু কী করে মাটি ফুঁড়ে উঠে এলে? এ তো সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।"

গলাটা ভীষণই চেনা ঠেকছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। টেবিলের উপর রাখা টর্চটা তুলে সটান কঙ্কাল লক্ষ করে জ্বেলে দিলেন শ্রীকান্ত, না আগু-পিছু কিছু নেই। কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে রয়েছে একা, একটু বুঝি বিনীত ভঙ্গিতে। টর্চ অফ করে বললেন, "উদ্দেশ্যটা খোলসা করলে ভাল হয়।"

"গলাটা চিনেও চিনতে পারছ না, তাই তো? একটু চেপে ভাবো, ঠিক মনে পড়বে। তাহলে আর কঙ্কালের সঙ্গে কথা বলছি মনে হবে না। আমাকে কল্পনা করতে পারবে।"

কাণ্ডটার পিছনে যেই থাকুক, মনের কথা পড়তে পারছে। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়। ...আচমকাই কণ্ঠস্বরের মালিকের নামটা মাথায় এসে গেল। বিস্ময়ের চোটে মুখ ফুটে সে নাম বেরিয়েও গেল, বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ দাস! কী করে সম্ভব?

"সম্ভব, অসম্ভব পরে ভাববে। এখন উঠে এসো তো। কাজটা এইবেলা সেরে নাও। নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা খানিক আগে তোমার গোয়ালঘরের পিছনে পুঁতে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ওরা চলে যেতেই উঠে এসেছি। তাড়াতাড়ি অন্য কোথাও গোর দাও। নয়তো কাল সকালে তোমার কপালে দুঃখ আছে।"

"দাঁড়াও, ব্যাপারটা আগে বুঝতে দাও। তুমি বৈকুণ্ঠ দাস। দু'বছর হল মারা গেছ। তোমার শেষ চিকিৎসা আমিই করেছি। তুমি বৈষ্ণব বলে সমাধি দেওয়া হয়েছিল, পোড়ানো হয়নি। আশ্রমের পিছনের জমিতে পোঁতা হয়েছিল তোমার বডি। নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা সেখান থেকে তোমার কঙ্কাল তুলে আমার ভিটেতে পুঁতে দিয়ে গেল। কাল সকালে এসে খুঁড়ে বের করবে কঙ্কাল। বলবে চণ্ডীগ্রাম গণহত্যায় মারা গেছে। আমিও সামিল ছিলাম ওই কাণ্ডে। একটা কঙ্কাল নিজের জমিতে লুকিয়েছি। তারপর মারধর করবে। কিন্তু তুমি তো ওই হত্যাকাণ্ডে মারা যাওনি। কোনও দিন হয়তো পা-ই রাখোনি চণ্ডীগ্রামে। এ গ্রামের বাইরে বড় একটা যেতে না তুমি।"

"কঙ্কালের গায়ে কি ঠিকানা লেখা থাকে, যা দেখে বোঝা যাবে বাড়ি কোথায় ছিল? কীভাবে মারা গেছে তাও লেখা থাকে না। চেহারা বলতে শুধু হাড়। মানুষটা কে ছিল, বোঝা যাবে না তাও। ওরা যা বলবে বিশ্বাস করবে লোকে। ওরাই এখন মালিক কিনা!"

"সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু কী করে মাটি ফুঁড়ে উঠে এলে? এ তো সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।"

"আমি বিজ্ঞান কিছুই বুঝি না। লেখাপড়া বিশেষ হয়নি। চেষ্টা করে দেখলাম মাটি ফুঁড়ে উঠতে পারি কি না, তোমার বিপদের কথা ভেবেই চেষ্টাটা করা, পারলাম। তাই এসে দাঁড়ালাম দালানে। জীবনে ভাল কিছু কাজ করেছ বলে বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সুযোগটা পাচ্ছ।"

"তুমি কর্মফলের যে উদাহরণ দিচ্ছে, আমি তাতে বিশ্বাস করি না। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।"

"তোমার বিজ্ঞানের কি সব কিছু আবিষ্কার করা হয়ে গেছে? তার বাইরে কি জগতে কোনও ঘটনা ঘটছে না?"

একটু ভেবে নিয়ে শ্রীকান্ত বললেন, "এটা একটা কূট যুক্তি। অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা এরকমটাই বলে থাকে।"

"যুক্তিটা ভুল কি ঠিক বিচার করার সময় পরে অনেক পাবে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাতে মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা। সময়টা কাজে লাগাও।"

মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে শ্রীকান্তর। বস্তুত নিজেকে বাঁচানোর জন্যই তিনি রাত জাগছিলেন ওষুধঘরে। ওরা তো রাতের বেলাটাকেই বেছে নেবে বাড়িতে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ ঢোকানোর জন্য কিংবা কঙ্কাল পুঁতে দিয়ে যাবে ভিটের জমিতে। টর্চ আর লাঠি সঙ্গে রেখেছেন, সন্দেহজনক কোনও আওয়াজ পেলেই বেরিয়ে আসছেন। এরকম চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। কানে এসেছে ওরা এই ধরনের কেসে ফাঁসিয়ে শ্রীকান্ত ডাক্তারকে মারধর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

কাণ্ডটা ঘটানোর সময় ওদের হাতেনাতে ধরে প্ল্যান ভেস্তে দেবেন, ঠিক করেছিলেন শ্রীকান্ত মিশ্র। কিন্তু তা আর ঘটল কোথায়? প্রহরা আলগা পড়ে গেল, কতক্ষণ ধরে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন, কে জানে! মওকা বুঝে বৈকুণ্ঠের কঙ্কালটা বাড়ির চৌহদ্দিতে পুঁতে দিয়ে গিয়েছে। যেভাবেই হোক, কঙ্কালটা যখন তার নাগালের মধ্যে রয়েছে, এটাকে এক্ষুনি নিজের বসতজমির সীমানা পার করা দরকার। টর্চলাইট, লাঠি হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন শ্রীকান্ত। দালানে এসে দাঁড়ালেন। কঙ্কালটার দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ নামিয়ে শ্রীকান্ত বললেন, "দ্যাখো, ব্যাপারটা মোটেই আমার

তেমন সুবিধের ঠেকছে না। নেহাত বিপদে পড়ে আছি বলেই তোমার কথা শুনছি।''

''বেশ করছ। এবার যাও, কোদালটা নিয়ে এসো।''

সিঁড়ির নীচে রাখা কোদালটা নিয়ে উঠোনে নামলেন শ্রীকান্ত। কৃষ্ণপক্ষ চলছে বলে চারপাশটা বড্ড অন্ধকার। টর্চটা কোমরে গুঁজে নিয়েছেন। এক হাতে কোদাল, অন্য হাতে লাঠি। পাশে কঙ্কাল। জীবনে কোনও দিন এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে, সুদূর কল্পনাতেও ছিল না শ্রীকান্ত মিশ্রর। কঙ্কালটার দিকে না তাকিয়ে বললেন, ''বৈকুণ্ঠ, তোমার জন্য আমি কী এমন করেছি, যার কারণে প্রতিদান দিতে এলে?''

''শুধু আমার জন্য নয়। অনেকের জন্য বহু ধরনের উপকার করেছ। জেনে, না জেনে বেশ কিছু ক্ষতিও করেছ, তবে উপকারের তুলনায় তা নগণ্য। এত কাজ করেছ, সব কিছু তোমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের মনে আছে। মানে, যারা সাধারণ মানুষ। যাদের জন্য কেউ কিছু করে না। প্রথম যখন বর্ধমান থেকে এই গ্রামে উঠলাম আমাদের আশ্রমে, ক'দিন পরেই পড়লাম বেজায় জ্বরে। নামতেই চায় না সেই জ্বর। খাওয়াদাওয়ায় রুচি নেই। আশ্রমের গোঁসাইয়ের হোমিওপ্যাথি ওষুধ ফেল। তোমার কানে কীভাবে যেন কথাটা গেল। সটান চলে এলে আশ্রমে। ঠুসে দিলে এক বোতল স্যালাইন। সেদিন সন্ধেতেই জ্বর উধাও। তুমি আমায় নতুন জীবন দিলে। তারপর আরও অনেক উপকার করেছ। বলতে গেলে রাত ফুরিয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাকে কোনও দিন অভুক্ত থাকতে হয়নি। আশ্রম থেকে ঝগড়া করে যখন বেরিয়ে এলাম, এর তার জমিতে কাজ করে পেট চালাতাম। এমনও হয়েছে, কাজ নেই দিনের পর দিন। পয়সা নেই হাতে। খাবার টাইমে চলে যেতাম তোমার বাড়ি। মা-বউমারা ডেকে খাইয়ে দিতেন। পেটের চিন্তা ছিল না বলে আশ্রমের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর ধুমুরিয়াতেই থেকে গিয়েছি। অন্য আশ্রমে যাইনি। আমার মতো বৈষ্ণবদের তো ঘুরে ঘুরে জীবন কাটানোর কথা। ঘর-সংসার করিনি।''

বাড়িতে একসময় রোজ দশ থেকে পনেরোটা এক্সট্রা পাত পড়ত। সেই সময় কখন কবে বৈকুণ্ঠ খেয়ে গেছে খেয়াল নেই শ্রীকান্তর। এখনও এক্সট্রা পাত পড়ে, পাঁচের বেশি নয়। বৈকুণ্ঠকে স্যালাইন দেওয়াটা মনে আছে শ্রীকান্তর, কী লক্ষণ দেখে জ্বরের উপর স্যালাইন চালিয়ে ছিলেন, এখন আর মনে পড়ছে না। বাঁ দিকে বাঁশবন, ডানদিকে শ্রীকান্ত মিশ্রর ভিটের সীমানা শেষ হল। মোরাম রাস্তায় দু'জনের পায়ের মৃদু খসখস আওয়াজ। রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করতে পারেননি শ্রীকান্ত। এখন দেখা যাচ্ছে না পারারও কিছু সুবিধে আছে, এভাবে কঙ্কাল পাচারটা কারওর চোখে পড়ার সুযোগ থাকছে না। বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল বলে উঠল, ''দাও দাদা, এই পুকুর ধারেই পুঁতে দাও আমাকে। বীরেনের জমি। তোমার কোনও ঝামেলা রইল না।''

''না, পাড়ার মধ্যে পোঁতা ঠিক হবে না। ঝামেলা ঘুরেফিরে আমার ঘাড়েই পড়বে। বীরেন আমাকে এসে বলবে বাঁচাও। চলো, আর-একটু যাওয়া যাক।''

''চলো, আমার কোনও সমস্যা নেই। ভয় একটাই কেউ যদি পস্‌সাব করতে উঠে আমাদের দেখে, তাহলেই চিত্তির!''

আশঙ্কা অমূলক নয়। গায়ের চাদরটা দিয়ে মাথাটাও ভাল করে মুড়ে নিলেন শ্রীকান্ত। কঙ্কাল দেখে ভিরমি খাবেই কেউ যদি বাইরে আসে। তাঁকে চিনতে না পারলেই হল। বৈকুণ্ঠের কঙ্কালের উদ্দেশ্যে বললেন, ''তুমি তো আমার অনেক গুণগান করলে, কার কী ক্ষতি করেছি, তার ফিরিস্তি দাও।''

''সরলাবুড়ির জমিটা তোমার বর্গা করা ঠিক হয়নি। তোমার পার্টির অনেকে কিন্তু বর্গায় ছাড় পেয়েছে। আমাদের আশ্রমের হরিমন্দিরটার কোনও সংস্কার করনি তুমি, বাইরে থেকে সাহায্যও নিতে দাওনি।''

''তোমার তো আশ্রমের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, তুমি হরিমন্দির নিয়ে ভাবতে যাচ্ছ কেন?''

''ঝগড়া তো হয়েছিল সেবায়েতদের সঙ্গে, ভগবানের উপর রাগ করব কেন?''

অপ্রাকৃত অভিযানে বেরিয়ে ভগবান আছে কি নেই, তা নিয়ে আর তর্কে গেলেন না শ্রীকান্ত। চুপ করে রইলেন। বৈকুণ্ঠের কঙ্কাল ফের বলতে লাগল, ''বংশানুক্রমে দোলমন্দিরের সেবায়েত যেহেতু তোমাদের পরিবার, প্রত্যেক বছর রং হয়েছে। চার বছর অন্তর মূর্তি পাল্টেছ। তারপর ধরো, বিনয়েন্দ্র পাণ্ডা যখন গ্রামের জন্য অ্যাম্বুলেন্স দিতে চাইল, তুমি নিলে না। কারণ, সে কংগ্রেস করে। গ্রামে বসে পার্টিটা তো সে করে না। কলকাতার নামী ব্যারিস্টার। দেশে আসার সময় পায় না। এখানে জন্মেছিল বলেই গ্রামের জন্য কিছু করতে চেয়েছিল। সুযোগ দাওনি তুমি। আজও গ্রামে একটা অ্যাম্বুলেন্স হল না। আর ওই যে, পশ্চিম দেশ থেকে আসা লোকগুলো, যারা নিজেরা চাষ করে না। বেছে বেছে কংগ্রেস পার্টির লোকেদের ধান কেটে নিয়ে যেত, তুমি কিছুই বলতে পারতে না। যেহেতু ওরা ছিল তোমাদের গুন্ডাবাহিনী। এ গ্রাম সে গ্রাম গুন্ডামি করে বেড়াত।''

''সব কিছু তো আমার হাতে ছিল না। পার্টিলাইন মেনে চলতে হত। যেমন আমার মতো অনেক নেতাই চায়নি চণ্ডীগ্রামে ওই কাণ্ড হোক। কিন্তু হল তো। কত নিরীহ গ্রামবাসী মারা গেল।''

''শুধু চণ্ডীগ্রাম কেন, নূরপুর, শালবেতায় লোক মারা যায়নি?''

''তা গেছে।'' বলে বড় করে শ্বাস ফেললেন শ্রীকান্ত।

বৈকুণ্ঠের কঙ্কাল বলে, ''তবু বলব মানুষ হিসেবে তুমি লোকটা উপকারী। পার্টি যখন গোল্লায় যেতে বসেছে, তুমি সরে গেছ ওদের কাজকম্ম থেকে। মানুষের উপকার করার স্বভাবটা রয়ে গেছে। সেটাকেই ভয় পাচ্ছে নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা। যদি তোমার হাত ধরে বামপার্টি আবার ঘুরে দাঁড়ায় এ গ্রামে।''

কঙ্কালটার দিকে একবার তাকিয়ে ফেলেন শ্রীকান্ত, পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নেন। বলেন, ''তোমার গলাটা বৈকুণ্ঠের মতো হলেও, কথাবার্তা ওর মতো নয়। বৈকুণ্ঠ রাজনীতির কিছুই বুঝত না। একেবারে সরল, সাধাসিধে লোক।''

''সব বুঝতাম। গ্রামের যাদের দেখে বোকা-সরল বলে মনে হয়, মোটেই সেরকম নয় তারা। বোকাদের কেউ শত্রু মনে করে না বলে ওরকম সেজে থাকে।''

তেমাথার মোড়ে ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটার কাছে এসে পড়ল দু'জনে। অখিল গিরির ভিটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল বলল, ''এইখানটাই তো ভাল। অখিল তোমাকে কোনও দিনই সহ্য করতে পারত না। কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে পঞ্চায়েত ভোটে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।''

''না, অখিলকে ফাঁসানো ঠিক হবে না। ওর মেয়েটা সদ্য বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে বসে আছে। এর উপর যদি নতুন ঝামেলা চাপে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে লোকটার।''

''ও ফাঁসতে যাবে কেন? তুমি যে আমাকে এখানে পুঁতেছ, নতুন কংগ্রেসের ছেলেরা জানবে কীভাবে?''

''জানবে না, খুঁজে বের করবে। যখনই দেখবে আমাদের গোয়ালের পিছনে কঙ্কালটা নেই, বুঝবে ওখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও পোঁতা হয়েছে। সারা গ্রাম চষে ফেলবে, দেখবে সদ্য মাটি খুঁড়ে কোনও নতুন কবর হয়েছে কিনা! তখনই দোষ

Scanned with CamScanner

চাপবে অখিলের ঘাড়ে।'' বলে থামলেন শ্রীকান্ত। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''একটা কাজ করা যাক, তুমি যেখানে ছিলে ওখানেই পুঁতে দিয়ে আসি। ওরা আমার জমিতে কঙ্কাল না পেয়ে সারা গ্রাম ঘুরবে। তবু তোমার আগের জায়গাতে যাবে না। কারণ, এখান থেকেই যে তুলে এনেছে তোমায়।''

''না গো শ্রীকান্তদা, ঘটনা তেমনটা নাও হতে পারে। ছেলেগুলো নেশা করে চুর হয়েছিল। তোমার জমিতে আমাকে না পেলে ভাববে, নেশার ঘোরে আসল কাজটাই করতে ভুলে গেছে। ফের তুলে আনতে যাবে আমাকে।''

নিকটবর্তী ঝোপঝাড়, বাঁশবন কাঁপিয়ে শিয়াল ডেকে উঠল। আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল দু'জনে। শিয়ালের দল যখন থামল, ধীরেন জানার জমির কাছে পৌঁছে গেছে। বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল বলল, ''আর তো কোনও সমস্যা নেই, তোমার শান্তির জন্য ধীরেন জানাই সবচেয়ে বেশি উঠে পড়ে লেগেছে। ওর ছেলে রিন্টুকে দিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিল তোমাকে। চিরকালই কংগ্রেস পার্টি করেছে। এখন নতুন কংগ্রেস।''

চাদর মোড়া মাথা তড়িঘড়ি নেড়ে শ্রীকান্ত বললেন, ''ধীরেনের বাবা নিত্যানন্দ জানার আমাদের পরিবারের প্রতি অবদান কোনও দিন ভুলতে পারব না। কংগ্রেস আমলে বহুদিন ধরে একঘরে করে রাখা হয়েছিল আমাদের। আমি তখন মেদিনীপুর কলেজে পড়ি। যেহেতু লালপার্টি করি, আমাদের বাড়িকে টোটাল বয়কট। সেই সময় রাতেরবেলায় লুকিয়ে আমাদের জমিতে লাঙল দিত ধীরেনের বাবা, অন্য মুনিশ তো কাজ করবে না। নিত্যানন্দ জানার জন্যই সে বছর চাষ করতে পেরেছিল বাবা। খেতে পেয়েছিল আমাদের পরিবার। যে মানুষটা মাটি চষে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিল, তার জমিতে আমি কি না কঙ্কাল পুঁতব!''

''পুঁতলে ওদের ক্ষতি তো কিছু হবে না। ওরা নতুন কংগ্রেস করে, জমি থেকে কঙ্কাল বের করবে নিজেদের পার্টির লোক। কোনও ঝামেলা করবে না।''

''খানিকটা তো করবেই। পার্টি পলিটিক্স বড় সন্দেহের জায়গা। গুন্ডাগুলো বলবে, ধীরেন জানা আমার থেকে টাকা খেয়ে কঙ্কাল তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের জমিতে পুঁতেছে। ধীরেনের কাছে টাকার ভাগ চাইবে ওরই পার্টির ছেলেরা। চলো, চলো আরও খানিকটা যাওয়া যাক। পোঁতার মতো উপযুক্ত ভিটে একটা পাবই।''

পাওয়া গেল না। এক একজনের বাড়ির সামনে এসে না পোঁতার নানান কারণ মাথায় আসছে শ্রীকান্তর। কারওর মেয়ের বিয়ে হয়নি, বয়স হয়ে যাচ্ছে। বিনয় মণ্ডলকে ছেলেবউমা দেখে না। অত্যাচার করে। শ্রীকান্ত মিশ্রর ছোটবেলার অনেকটা সময় অত্যন্ত দারিদ্রে কেটেছে। বৃহস্পতিবার ঘর থেকে চাল বের করার নিয়ম নেই, মদন মাইতির মা লুকিয়ে চাল দিয়ে গেছে শ্রীকান্ত মিশ্রর মাকে। আসন্ন উপবাসের আশঙ্কা কাটিয়ে উনোনে ফুটতে থাকা সেই ভাতের গন্ধের আশ্বাস আজও ভোলেননি শ্রীকান্ত। হৃষীকেশ ঘড়াই বেশ কিছু দিন শ্রীকান্তর কলেজের খরচ দিয়েছিল। চেয়েছিল গ্রামের একজন গ্র্যাজুয়েট হোক। মাকুরদা বাসস্ট্যান্ড থেকে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন শ্রীকান্ত, তখন ডাকাত ধরে। বিনয় মণ্ডল খেতজমি পাহারা দিচ্ছিল, টাঙি, বল্লম নিয়ে এসে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচায়। বন্যার সময় শ্রীকান্তর পরিবার এসে উঠেছিল অচ্যুত বেরার বাড়ি। জল না নামা পর্যন্ত ও বাড়িতে খাওয়া, শোওয়া সব। শুনতে শুনতে বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল বলেছে, ''তুমি যেমন গ্রামের মানুষের অনেক উপকার করেছ, এখনও করে যাচ্ছ। তারাও কিন্তু তোমার পরিবারের জন্য কম কিছু করেনি।''

উত্তরে শ্রীকান্ত বলেছেন, ''সত্যিই তাই। ব্যাপারটা আগে কখনও এত স্পষ্ট করে মাথায় আসেনি। তোমাকে লুকোতে গিয়ে সঠিকভাবে উপলব্ধি করলাম। চলো, মনে হচ্ছে কারওর বসতজমিতে পোঁতা যাবে না। খেতের মাঠে যাই।''

চাষের জমিতে নেমে এসেছেন দু'জনে। চারপাশ ঘিরে ধু ধু জমি। কোনও মাঠে ফসল আছে, কোনও মাঠে নেই। আলপথ ধরে হাঁটছেন শ্রীকান্ত, পাশে বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল তাড়া দিচ্ছে, ''তাড়াতাড়ি জায়গা বাছো শ্রীকান্তদা। রাত ফুরোতে চলল।''

খেতের মাঠে এসে আরও ধাঁধায় পড়েছেন শ্রীকান্ত, কোনটা কার জমি জানেন না। এসব শ্রীবাস ভাল চেনে। না জেনে এমন কারওর জমিতে পুঁতে ফেললেন কঙ্কালটা, বেচারির হয়তো ওইটুকুই জমি। চাষের জন্য যেহেতু সব সময় খোঁড়াখুঁড়ি চলে, চট করে বেরিয়ে আসবে কঙ্কাল। বিরাট হ্যাপা পোহাতে হবে গরিব মানুষটাকে। রাত ফুরোচ্ছে বলে মাঠ পাহারার লোকরাও বোধহয় ঘুমে ঢুলছে। কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি এখনও। ক্ষয়াটে চাঁদ আপ্রাণ চেষ্টা করছে শ্রীকান্ত মিশ্রকে পথ দেখানোর। বড় জলতেষ্টা পাচ্ছে শ্রীকান্তর। বৈকুণ্ঠর কঙ্কালকে বলেছেন সে কথা। সে বলেছে, ''এখানে আর জল পাবে কোথায়। যেতে হবে সেই হাতিজোরা পুকুরে। সেটা যে কোনদিকে তাই তো ঠাহর করতে পারছি না।''

কঙ্কালের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। ক্লান্তও হবে না। শ্রীকান্ত মিশ্রর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। ধরে আসছে পা। শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল বলছে, ''আর কত দূর যাবে? চার-পাঁচটা গ্রাম পেরিয়ে এলাম মনে হচ্ছে। এবার মাটি খোঁড়ো।''

মাথার চাদর অনেক আগেই খুলে ফেলেছেন শ্রীকান্ত। গায়ে ঘাম দিচ্ছে বলে চাদরটা কোমরে বাঁধতে গেলেন, পা টলমল হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ''এই চার-পাঁচটা গ্রামের সবাই আমার চেনা। ক'মাস আগেই ভাইঝির বিয়েতে সকলকে ভোজ খাইয়েছি। ফ্রায়েড রাইস করেছিলাম। পাঁচ-দশজন বাদ দিলে বেশিরভাগ লোক কোনও দিন খায়নি। আর হয়তো কোনও দিন খাওয়ার সুযোগও পাবে না। সেই আমি কিনা তাদের জমিতে কঙ্কাল পুঁতে মার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেব! আর-একটু যাই চলো, হাইরোড এসে গেল মনে হচ্ছে। ওপারের গ্রামগুলোয় পোঁতা যায় কি না দেখা যাক।''

অবশেষে হাই রোডের ধারে পৌঁছে গেলেন দু'জনে। পুব আকাশের নীচে হালকা আলোর আঁচল। রাস্তা পার হওয়ার পর আর বেশি সময় পাওয়া যাবে না। ভোর আসন্ন। মাঠ থেকে রাস্তা অনেকটাই উঁচুতে। মাটি আঁকড়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনওক্রমে হাই রোডে উঠলেন বটে শ্রীকান্ত, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি রইল না। ছিটকে পড়লেন পিচ রাস্তায়। বৈকুণ্ঠর কঙ্কাল ডাকছে, ঠেলা দিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। বলছে, ''ও শ্রীকান্তদা, ওঠো। এখানে পড়ে থাকলে চলবে না। এক্ষুনি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যাবে। বড় বড় লরি। ওড়িশার দিকে যায়। ও শ্রীকান্তদা উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি।''

অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারছেন না শ্রীকান্ত। চোখের পাতাই খুলতে পারছেন না। এত ক্লান্তি! গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। হর্নের আওয়াজ। এগিয়ে আসছে গাড়ি। একদম কাছাকাছি। আর্তনাদ করে ওঠেন শ্রীকান্ত। মারা যাননি। ঠেলা দিচ্ছে কে যেন। বলছে, ''কী হল রে, ওরকম করছিস কেন?''

চোখ খোলেন শ্রীকান্ত। বাবা ঠেলা দিচ্ছেন। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন শ্রীকান্ত, ওষুধঘরে বসেই। রাতের স্বপ্ন নয়, বাইরে

Scanned with CamScanner

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। টেবিল থেকে মাথা তুলে ছেলেকে সোজা হতে দেখে ব্রজলাল বললেন, "স্বপন দেখছিলি? খারাপ স্বপন? গোঙাচ্ছিলি খুব। রোজ রাত জেগে পাহারা দিলে ঘুম তো আসবেই দিনে।"

"কী হয়েছে দাদু?" দরজায় এসে জানতে চাইল চন্দ্রিমা। ঠাকুরদাকে ওষুধঘরে ঢুকতে বড় একটা দেখা যায় না।

ব্রজলাল বললেন, "তোর বাবা স্বপন দেখে ভয় পেয়েছে খুব। চিৎকার দিচ্ছিল। দালানে বসে শুনতে পেলাম।"

"কিসের স্বপ্ন দেখছিলে বাবা?" জিজ্ঞেস করল চন্দ্রিমা।

শ্রীকান্ত খানিক অপ্রস্তুত। চোখ-মুখে হাত বুলিয়ে টেবিল থেকে জগ তুলে জল খাচ্ছেন। খটকা লাগল। জগ টেবিলে নামিয়ে মেয়েকে বললেন, "কোনও গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিস?"

"পাচ্ছি তো। কেন?"

"কার গাড়ি?"

"কারও একটা হবে। অনেকেই তো ভাড়ায় গাড়ি খাটাবে বলে কিনব-কিনব করছিল।"

আবার হর্নের আওয়াজ। চন্দ্রিমা কান পাতে। গাড়ির শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। মনে হচ্ছে আসছে তাদের বাড়ির দিকেই। ওষুধঘরের দরজা ছেড়ে দালানধারে গিয়ে দাঁড়ায় চন্দ্রিমা, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে। তাদের রাস্তা ধরেছে ধবধবে সাদা গাড়ি। কে আসছে? তাদের বাড়িতেই আসছে কি? এ রাস্তায় আরও চারটে বাড়ি। যদিও সে সব বাড়ির সামনে আজ পর্যন্ত কোনও চার-চাকা থামেনি।

চন্দ্রিমাদের বাড়ির সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। কোনও গেট নেই, তবু উঠোনে ঢুকল না। ড্রাইভারের গেট বাদ দিয়ে গাড়ির তিনটে দরজা খুলে গেল। নেমে এল তিনটে সুঠাম চেহারার লোক। বয়স তিরিশ-বত্রিশ। তারপর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত যিনি নামলেন, তাঁকে বিলক্ষণ চেনে চন্দ্রিমা, এলাকার বিধায়ক জয়ন্ত মান্না!

নতুন কংগ্রেসের এত বড় মাপের নেতা তাদের বাড়িতে প্রথম। কোন বিপর্যয়ের দূত হয়ে এলেন, কে জানে! ছিটকে ওষুধঘরের দরজায় ফিরে আসে চন্দ্রিমা। বলে, "বাবা এম.এল.এ।"

ব্রজলাল প্রথমে ওষুধঘর থেকে বেরলেন। ভয়ে হাঁটুটা কেমন যেন আলগা পড়ে গেছে, এম.এল.এ নিজে মারতে এল? দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না ব্রজলাল, দরজার পাশে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লেন। চৌকাঠ ডিঙিয়ে শ্রীকান্ত যখন দালানে এসে দাঁড়ালেন, জয়ন্ত মান্না চলে এসেছেন উঠোনে। এক মুখ হাসি নিয়ে হাতজোড় করে বললেন, "শ্রীকান্তদা, প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি, আপনার ভাইঝির বিয়েতে আসতে পারিনি। শ্রীবাস আমাকে বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিল। আসলে ওই সময় বিধানসভার বৈঠক চলছিল তো।"

"না, ঠিক আছে, ব্যস্ত মানুষ...।" আড়ষ্ট হাসি আর প্রতিনমস্কারসহ বললেন শ্রীকান্ত, বুঝতে পারছেন না লোকটার আগমনের হেতু। ভিতর-ভিতর নার্ভাস লাগছে।

"আপনার সঙ্গে ক'টা কথা আছে শ্রীকান্তদা।" বললেন এম এল এ।

"আসুন না। চলে আসুন।" বলে হাতের নির্দেশে ওষুধঘর দেখালেন শ্রীকান্ত। ফের বললেন, "দালানেও বসা যেতে পারে। চেয়ার দিতে বলি?"

"এখানেই বসি না, এই তো বেশ ছায়া আছে।"

পিছিয়ে গিয়ে জামগাছের ছায়ায় দাঁড়ালেন জয়ন্ত মান্না, তিন সঙ্গীর ঘেরাটোপে। চন্দ্রিমা চেয়ার দেওয়ার কথা ভাবতে না ভাবতেই দেখে, কাকা আর দুলাল প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো দালান থেকে নামিয়ে আনছে। বাবা, কাকার ঝগড়া মিটে গিয়েছে। মা গিয়ে ফিরিয়ে এনেছে কাকাদের। বলেছে, মায়ের রান্না বাবার মুখে রুচছে না। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। কাকিমার রান্না ছাড়া বাবাকে খাওয়ানো মুশকিল। কাকা, দুলাল এখনও নতুন কংগ্রেসে নাম লেখায়নি।

জয়ন্ত মান্নার তিন সঙ্গীকে চেয়ার দেওয়া সত্ত্বেও বসেনি। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে ওরা এম এল এ'র বডিগার্ড। পর্যায়ক্রমে তিনজনেই আড়চোখে মাপছে চন্দ্রিমাকে, লোভের দৃষ্টি। খানিকটা তফাত রেখে চেয়ারে মুখোমুখি বসেছে বাবা আর উদয় মান্না। পাশে কাকা, দুলাল দাঁড়িয়ে। দু'জনেরই কথার গোছ নেই। কোন কথার উত্তরে কী বলে বসবে এই আশঙ্কায় দালান থেকে নেমে চন্দ্রিমা বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জয়ন্ত মান্না বলছেন, "আমাদের ছেলেরা আপনাকে কি জরিমানা বা শাস্তির কথা সামনে এসে বলেছে?"

চুপ করে থাকেন শ্রীকান্ত। কী বলা ঠিক হবে বুঝে উঠতে পারছেন না। জয়ন্ত মান্নাই উত্তরটা দিলেন, "বলেনি। শুধু পঞ্চায়েত অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিল। তাতেই দাদাকে জানিয়ে দিলেন আপনার উপর জরিমানা, শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।"

"কোন দাদা?" জানতে চাইলেন শ্রীকান্ত। কাকা বা দুলাল নয়, চন্দ্রিমা দেখে গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলছে খোদ বাবা।

জয়ন্ত মান্না বললেন, "কোন দাদা আবার, আড়াল থেকে যিনি গোটা সংগঠনটা চালান। আপনি কার কথা ভাবলেন?"

"বিহান মুখার্জি।" বললেন শ্রীকান্ত।

জয়ন্ত মান্না বলেন, "হ্যাঁ, বিহান মুখার্জি দাদাকে আপনাদের ব্যাপারটা জানিয়েছেন, শুনেছি। দাদা-ই বলেছেন। আমাদের দলের শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিহান মুখার্জির খুব গুরুত্ব আছে। সেদিন আর্টিস্টদের মিছিলে কবি রঞ্জন বসু, অভিনেতা উদয়ন সোমের সঙ্গে হাঁটছিলেন, টিভিতে দেখেছি। বিহান মুখার্জি তো কবিতা, গান লেখেন।"

শ্রীকান্ত কোনও মন্তব্য করলেন না। এখনও লোকটার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়নি। জয়ন্ত মান্না বলে উঠলেন, "আচ্ছা, বিহান মুখার্জির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কী সূত্রে?"

বাবাকে উত্তর দিতে দিল না চন্দ্রিমা। বলে উঠল, "বিহানদা আমাদের কলেজের জি এস ছিল। আমি কলকাতায় পড়েছি।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো। তুমি কলকাতার কলেজে পড়েছ আমি জানি। তা সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল। অত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে জি এস যে তোমায় মনে রেখেছেন, এটা কিন্তু খুব বড় ব্যাপার! বড় মনের পরিচয়।"

প্রশংসার ছলে জয়ন্ত মান্না যে আসলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, ভাল মতোই টের পাচ্ছে চন্দ্রিমা। তাই সে বলে, "বিহানদা তো আমাদের বাড়িতে এসেছে দু'বার। গ্রাম খুব ভালবাসে।"

শ্রীকান্ত মিশ্র চকিতে মেয়ের দিকে তাকালেন, মিথ্যে বলাটা দিব্যি রপ্ত করেছে! জয়ন্ত মান্না বললেন, "নিশ্চয়ই আমাদের আমলে আসেননি। এবার যখন আসবেন, প্লিজ আমায় একটা খবর দিও। এসে আলাপ করে যাব।"

"অবশ্যই।' 'আলতো হেসে বলল চন্দ্রিমা।

প্রসঙ্গে ফিরলেন জয়ন্ত মান্না। শ্রীকান্ত মিশ্রর উদ্দেশে বললেন, "আপনার কমপ্লেন পেয়ে দাদা তো আমার উপর খুব চোটপাট করলেন। আমি পঞ্চায়েত অফিসে এলাম। কথা বললাম মেম্বারদের সঙ্গে। ওরা বলছে, আমরা শুধু ডেকে পাঠিয়েছিলাম। জরিমানা, শাস্তির কথা তো হয়নি। আমি বলেছি, ওঁর মতো সম্মানীয় ব্যক্তিকে তোমাদের ডেকে

Scanned with CamScanner

পাঠানো উচিত হয়নি। যদি কিছু বলার থাকে বা পরামর্শ নেওয়ার দরকার হয়, ওঁর বাড়িতে যাবে। ওদের হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি শ্রীকান্তদা। বোঝেনই তো গ্রামের ছেলে সব, শিক্ষার সুযোগ পায়নি। সহবত জানে না। জরিমানা, শাস্তি এসব নিয়ে আপনি একেবারেই চিন্তা করবেন না। আমি ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি। আপনি শুধু নিজের কাজ নিয়ে থাকুন।''

''নিজের কাজ?'' কথাটা পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন শ্রীকান্ত মিশ্র।

জয়ন্ত মান্না বললেন, ''ডাক্তারি। আপনার মতো ডাক্তার এ গ্রামের গর্ব।''

এম এল এ'র জন্য চা নিয়ে এসেছে দুলাল। প্লেটে দুটো বিস্কুটও দেওয়া হয়েছে। জয়ন্ত মান্না বললেন, ''এখন আবার চা! এক ঘণ্টাও হয়নি ভাত খেয়েছি। প্রধানের বাড়িতে খেলাম।''

''পায়ের ধুলো যখন পড়েছে, চা না খাইয়ে ছাড়ছি না। আসার খবর যদি থাকত, আরও কিছুর ব্যবস্থা করতে পারতাম।'' হাত কচলে বলল শ্রীবাস।

কাকার এত গদগদ ভাব ভাল লাগল না চন্দ্রিমার। চায়ের কাপ-ডিশ হাতে নিয়েছেন জয়ন্ত মান্না। শ্রীবাসের উদ্দেশ্যে বললেন, ''ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা বলছ! তোমাদের বাড়িতে এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। শ্রীকান্তদার মতো মানবদরদী মানুষ, পাঁচ গ্রামের লোক এক ডাকে চেনে, আমি তাঁর দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছি, এ তো আমার সৌভাগ্য!''

দালানের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মা-কাকিমার হাত থেকে চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে দুলাল এম এল এ'র তিন সঙ্গীকে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে জয়ন্ত মান্না বললেন, ''সামনের পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমাদের একটু দেখবেন। গ্রামের ভোটগুলো যেন পাই। আপনাদের সিটটাও রিজার্ভ হয়ে গেল, মহিলা ক্যান্ডিডেট খুঁজতে হবে। গ্রামের দিকে রাজনীতি সচেতন মহিলা ক্যান্ডিডেট পাওয়া যে কী কঠিন, আপনিও জানেন।''

দ্রুত চা শেষ করলেন জয়ন্ত মান্না। কাপ-ডিশ মাটিতে নামিয়ে বললেন, ''আজ তাহলে উঠি। নশিন্দার পঞ্চায়েত অফিসে একবার যেতে হবে। আপনি কিন্তু আমি এসেছিলাম জানিয়ে দাদাকে একটা ফোন করে দেবেন।''

শ্রীকান্ত মিশ্র ঘাড় হেলালেন। জয়ন্ত মান্না বললেন, ''দাদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে তো আপনার?''

মানুষটা যে কত ধূর্ত, ক্রসচেক করা দেখেই বোঝা যায়। শিওর হয়ে নিতে চাইছেন বড় নেতার সঙ্গে বাবার আদৌ কথা হয়েছে, নাকি চন্দ্রিমাদের দৌড় বিহান মুখার্জি অবধি। এবার আর বাবার হয়ে উত্তর দিতে হল না চন্দ্রিমাকে। বাবা বলল, ''হ্যাঁ, কথা হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে।''

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন জয়ন্ত মান্না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে এনে একটা কার্ড বের করলেন। চন্দ্রিমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ''আমার ফোন নাম্বার, ই-মেল আই ডি সব এতে আছে। বিহান মুখার্জি তোমাদের বাড়িতে এলে জানিও, এছাড়া ওর যদি কখনও কোনও দরকার পড়ে যোগাযোগ কোরো।''

চন্দ্রিমা কার্ডটা হাতে নেয়। জয়ন্ত মান্না ফের একবার হাসিমুখে বাবাকে নমস্কার জানিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছনে চলল তিন সঙ্গী।

গাড়ির আওয়াজ দূরে চলে যেতেই, দুলাল বলে উঠল, ''জেঠু, টাকা দাও। মাকুরদা বাজার থেকে মিষ্টি নিয়ে আসি।''

শ্রীকান্ত মিশ্রর মুখে খুশির ঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। বললেন, ''না, অ্যাতো আনন্দের কিছু নেই। আমি বেঁচে গেলাম চেনাজানার জোরে। মার খেয়ে প্রফুল্ল, গৌর এখনও বিছানায় শুয়ে আছে।''

''এক হাঁড়ি চা কিন্তু বসাতে হবে। এই যে এরা গেল, এরপর গ্রামের লোক আসতে শুরু করবে একের পর এক। জানতে চাইবে এম এল এ কী বলে গেল।'' বলার পর শ্রীবাস বউয়ের উদ্দেশে বলল, ''যাও, জল বসাও। দুলাল বরং গোটা দশেক বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে আসুক।''

বিস্কুটের টাকা আনতে ওষুধঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন শ্রীকান্ত, দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েকে বললেন, ''তুমি আগে বিহান মুখার্জিকে ফোন করে সুখবরটা জানাও। ওঁকে আগে টেনশন মুক্ত করো। পরে আমি ফোন করে কৃতজ্ঞতা জানাব। উনি আমাদের জন্য যা করলেন, জীবনে ভোলার নয়।''

শেষের দিকে বাবার গলাটা একটু বাস্পীভূত হয়ে গেল। চন্দ্রিমা কিন্তু প্রথম ফোনটা করবে কথাকলিকে। বিহানদার যাবতীয় উদ্যোগের পিছনে আছে সে।

৭

চন্দ্রিমার কলটা বেজে যাচ্ছে। কথাকলি 'দ' করা হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে আছে বিছানায়। মোবাইলের স্ক্রিনে দপদপ করে জ্বলছে চন্দ্রিমার নাম, রিং হচ্ছে, ধরছে না কথাকলি। কী হবে ধরে! আর হয়তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কারও সঙ্গেই যোগাযোগ রাখার দরকার পড়বে না। ক্রমশ সেরকম একটা সিদ্ধান্তের দিকেই এগোচ্ছে সে। এর আগে বহু মন খারাপের দিনে আত্মহত্যার ইচ্ছে কখনও মাথায় আসেনি কথাকলির। আজ প্রথমবার এল। আসার প্রধান কারণ, সুইসাইডের প্ল্যাটফর্ম রেডি করে দিয়ে গিয়েছে নির্মাল্য। এরপরও যদি বেঁচে থাকে, নির্মাল্য ওকে দেখে হাসবে। চাপা উপহাসের হাসি।

মনে-মনে বলবে, খুব তো বলো তোমার লোভ-লালসা নেই। মরার ওরকম সুযোগ করে দিয়ে গেলাম। কিসের লোভে বেঁচে আছ তুমি?

এর একটাই উত্তর হয়। ভাল ভাবে বাঁচার লোভে। সব লোভ তো খারাপ নয়। কিন্তু ভাল ভাবে বাঁচার আর কোনও পথ দেখছে না কথাকলি। আজ বরাবরের জন্য ভেসে যেতে মন চাইছে। কথাকলি না থাকলে কার কী আসে যায়। বাবা ছাড়া কেউ তাকে ফোন করে না। সেই ফোনটাও আসে রুটিন মাফিক, রাত ন'টায়। ডিনার করার আগে মেয়েকে ফোন করে বাঁধা কয়েকটা কথা বলে বাবা, টিভি দেখছিলি নাকি? নির্মাল্য অফিস থেকে ফিরেছে? আজ কোথাও ঘুরতে-টুরতে বেরিয়েছিলি? রান্নার লোক এসেছিল তো?

হ্যাঁ, না দিয়ে উত্তর সেরে ফেলে কথাকলি। কখনও কখনও বাবার শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ নেয়। বিহান তাকে ফোন করে না। দরকার পড়ে না বলেই করে না। চন্দ্রিমাও যে ফোন করেছিল একটু আগে, নিশ্চয়ই ওদের বাড়ির ঝামেলাটা নিয়ে। নির্মাল্য তো বলেই গেল ফোন করবে না, যোগাযোগ রাখবে না কোনও। মাস শেষ হলে সংসার খরচ পাঠিয়ে দেবে। যেমন সালকিয়ার বাড়িতে পাঠায়। আজ সকালে জিনিসপত্র প্যাক করে সালকিয়ার বাড়িতে চলে গেল নির্মাল্য। বলল, ''তোমার সুবিধের কথা ভেবে ফ্ল্যাটটা কিনেছিলাম, তুমি থাকো। আমি সরে যাচ্ছি। বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে ও পাড়ার লোকেদের কাছে আমাকে আর ছোট কোরো না। বিয়ে হওয়া মেয়ে বাড়িতে এসে বসে থাকলে তোমার বাবারও সম্মান বাড়বে না। এখানকার কোনও খরচা বাবার কাছে চেয়ো না। আমি দেব। ইটস মাই ডিউটি।''

নির্মাল্য জানে, বেশিদিন দিতে হবে না। এত পরিত্যক্ত অবস্থায় বাঁচতে পারে না মানুষ। কথাকলি সুইসাইড করতে বাধ্য হবে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য কেউ কথাকলির হয়ে নির্মাল্যকে কোর্টে তুলবে না। কারণ, সাদা চোখে নির্মাল্য বউয়ের কোনও অভাব রাখেনি। মারধর করেনি। কটু কথা বলেনি কোনও। এমনকী, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে বলে নিজেই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে। বউকে তাড়ায়নি। এরপর কে ওকে দায়ী করবে।

নির্মাল্যকে এরকম একটা সুবিধেজনক অবস্থানে এনে দিয়েছে সজল। কথাকলির গাড়ির ড্রাইভার। ছেলেটাকে প্রথম থেকে সন্দেহ হয়েছিল। কথাকলির সন্দেহ বেশিরভাগই অমূলক হয় না। বিহান সবচেয়ে ভাল করে জানে সেটা। অনেকবার প্রমাণ পেয়েছে। সেই যেবার, পাড়ার খবরের কাগজ কিনতে আসা লোকটাকে ক'দিন ওয়াচ করে কথাকলির সন্দেহ হয়েছিল। বিহানকে বলেছিল লোকটাকে ফলো করতে। বিহান পিছন-পিছন গিয়ে দেখে লোকটা থানায় ঢুকছে। খানিক পরে অন্য পোশাক গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল লোকটা। পুলিশের ইনফর্মার ছিল সে। গত ক'দিন ধরে কথাকলি বিভিন্ন লোকের কাছে গেছে, উদ্দেশ্য একটাই, ফ্ল্যাটের এত টাকা কোথা থেকে পেল নির্মাল্য? ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে গেছে, সেখান থেকে একজন উকিলের ঠিকানা জোগাড় করেছে। গিয়েছে তাঁর বাড়িতেও। তিনি বলেছেন, ''আপনার হাজব্যান্ডের প্যানকার্ড নাম্বার ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না।''

প্যান নাম্বার জানতে শুভদীপের কাছে গিয়েছিল কথাকলি, নির্মাল্যর ট্যাক্স ফাইল করে শুভদীপ। প্যান নাম্বার শুভদীপ কলিকে জানায়নি। বলেছে, ''এটা আমাদের কাজের এথিক্সের বাইরে।''

তবে কথা দিয়েছিল, নির্মাল্যকে জানাবে না কথাকলি এসেছিল। জানিয়ে দিল ড্রাইভার সজল। ছেলেটা নিয়োগ হওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছিল, নির্মাল্যর ইনফর্মার নয়তো? সন্দেহ সঠিক প্রমাণ হল। কাল অফিস থেকে ফিরে নির্মাল্য আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। হতাশা, বিরক্তিসহ ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, ''তুমি ঠিক কী চাও বলো তো? লোকজনের কাছে আর কত হেয় করবে আমাকে?''

কথাকলি কোথায় কোথায় গিয়েছিল গড়গড় করে বলে দিল নির্মাল্য। ইনকাম ট্যাক্স অফিসে গিয়েছিল বলতেই, কথাকলির ধরতে অসুবিধে হয়নি, কান ভাঙিয়েছে সজল। শুভদীপ কিংবা ইনকাম ট্যাক্সের ল'ইয়ারকে কথাকলি বলেনি প্রথমে ট্যাক্স অফিসে গিয়েছিল। নির্মাল্যর প্রশ্নের উত্তরে কথাকলি বলেছিল, ''আমি কী চাই, বহুবার বলেছি তোমায়। উত্তর পাইনি বলেই এদিক-ওদিক ঘুরে মরছি।''

''ধরো, টাকাটা যদি আমি অসৎ উপায়ে রোজগার করে থাকি, তুমি চাও আমার শাস্তি হোক। পুলিশ জেলে পুরুক আমাকে, তাই তো?''

নির্মাল্যর কথার পিঠে কথাকলি বলেছিল, ''অন্যায় করলে শাস্তি তো পাওয়াই উচিত। তোমার সঙ্গে থাকতে গিয়ে আমি কোনও অন্যায় করছি কিনা, জানার চেষ্টা করছি সেটাই। অসৎ রোজগারে আমিও যে ভাগ বসাচ্ছি।''

''নানান দিক থেকে খোঁজখবর করার পর যদি দ্যাখো, টাকাটা অসৎ উপায়ে আসেনি, তখন কী করবে? এত জনের কাছে যে আমার মানহানি করলে, খেসারত দিতে পারবে? কোনও প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তুমি আমাকে এভাবে অপমান করতে পারো না। কোনও রাইট নেই তোমার।''

কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু নির্মাল্য যে কেন সন্দেহটা দূর করে দিচ্ছে না, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। কথাকলি চুপ করে আছে দেখে নির্মাল্য বলেছিল, ''তোমার আসলে আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বিয়ে হওয়ার পর থেকে কোনও দিনই করেনি। তাই আমার ভুল অন্যায় খুঁজে-খুঁজে একসঙ্গে না থাকার অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করছ। কেন এমন করছ, জানি না। কারণ তো একটা আছেই। যেটা তুমি প্রকাশ্যে আনতে চাও না। এনো না। তুমি এই ফ্ল্যাটে নিজের মতো থাকো, আমি সালকিয়ার বাড়িতে চলে যাচ্ছি।'' বলেছিল, সংসার খরচ পাঠিয়ে দেবে। ঝগড়াঝাঁটি বেশিক্ষণ পোষায় না কথাকলির। চুপ করে গিয়েছিল। রাতেই ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছিল নির্মাল্য। ঘুম থেকে উঠে চা না খেয়ে বেরিয়ে গেল। কথাকলি ভেবে রেখেছিল, সকালে উঠে নিজের বাড়াবাড়ির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে নির্মাল্যর কাছে। ততক্ষণে ওর রাগ নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। আবারও বলবে, টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছ আমাকে বলতে তোমার অসুবিধে কোথায়? যদি অসৎ উপায়ে রোজগার করে থাকো, ফ্ল্যাট বিক্রি করে সারেন্ডার করবে টাকা। শাস্তি হলেও, কম হবে। যদি বিপথের টাকা না হয়, শাস্তির কোনও প্রশ্ন থাকছে না। এসব বলার কোনও সুযোগই দিল না নির্মাল্য। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর বাবাকে ফোন করেছিল কথাকলি। সব শুনে বাবা বলল, ''নির্মাল্য একেবারে ওয়াইজ় ডিসিশন নিয়েছে। তোকে বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে, নিজে বেরিয়ে গেছে। আর কত ভদ্র ব্যবহার করবে সে? সন্দেহ করাটা তোর বাতিকের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।'

তর্ক না করে ফোন কেটে দিয়েছিল কথাকলি। বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি তো তোমায় সন্দেহ করি না, পিসিকে করি না, মাকে করতাম না, কার্তিকদাকে না, বিহান, চন্দ্রিমা, জবা... এরকম আরও অনেককেই আমি চোখ বুজে বিশ্বাস করি। নির্মাল্যর বেলায় সন্দেহ হচ্ছে কেন? যথেষ্ট কারণ আছে সন্দেহ

Scanned with CamScanner

করার। বিয়ের আগে পরে নির্মাল্যর দুটো রূপ দেখেছে কথাকলি। আলাপ হওয়ার আগে দিনের পর দিন কথাকলিকে ফলো করে গেছে। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কথাকলিদের সালকিয়ার বাড়িতে। কতরকম ভাবে ওকে অপমান করেছে কথাকলি, গায়ে মাখেনি নির্মাল্য। কথাকলিকে নিয়ে অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে থাকত। ওর এই আশ্চর্য নিমগ্নতারই প্রেমে পড়েছিল কথাকলি। সে সময় কতরকম গ্রিটিংস কার্ড, চিঠি, নানান গিফ্‌ট দিয়েছে নির্মাল্য। বিয়ের পরও দিয়েছে, তবে অনেক কম। গোপনে। বলেছে, বাড়ির কেউ যেন না জানতে পারে। কেন জানাবে না কথাকলি। বরের থেকে গিফ্‌ট পাওয়া কি অপরাধ? গিফ্‌ট পেয়ে পাঁচজনকে দেখাতে পারাটাও তো আনন্দের। নির্মাল্য বলত, বাড়ির লোক বলবে বউকে নিয়ে আদিখ্যেতা করছি। ও। যে মেয়ের জন্য বাইরে নানান আহ্লাদ দেখানো যায়, বাড়িতে আনার পর সব বন্ধ। কথাকলির তখন থেকে মনে হতে শুরু করেছিল সুন্দর কিছু সংগ্রহ করার আগ্রহেই নির্মাল্য তাকে বিয়ে করেছিল। টাকা দিয়ে কেনা যাবে না বলে ভান করেছিল ভালবাসার। মাকে সব কথাই বলেছিল কথাকলি। বরের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না জেনে, মা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোদের মধ্যে আদরটাদর সব বন্ধ নাকি?"

"না, মা। তখন আমি শরীর থেকে মনটা আলাদা করে ফেলতে পারি।"

কথাকলির কথা শুনে মা বলেছিল, "সে আবার কীরকম ধাঁধার ব্যাপার রে। জন্মে শুনিনি।"

কথাকলি জানে আত্মহত্যা করার সময় তার কোনও শারীরিক কষ্ট হবে না। সুইসাইডের পন্থা নিয়ে এখন ভাবছে কথাকলি। ঘুমের ওষুধ খেলে শারীরিক কষ্টের কোনও ব্যাপার ছিল না। হঠাৎ ডিসিশন নিয়েছে, কেনার সময় পায়নি। ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কাটারও উপায় নেই, নির্মাল্য শেভ করে কমপ্যাক্ট ব্লেড দিয়ে। শেভিং-এর জিনিসপত্র নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ফ্যানের ব্লেডে ঝুলে পড়তে হবে।

মাথা তুলে সিলিং ফ্যানটাকে দেখে কথাকলি। একদম নতুন, ব্লেডে সোনালি আলপনা। ফ্ল্যাটে আসার পর বিশেষ চালানো হয়নি। শীত পড়তে শুরু করেছে। কোনও পরিবারে সুখ, স্বস্তির হাওয়া দেবে বলে ফ্যানটা তৈরি হয়েছিল। কথাকলি ঝুলে পড়লে ব্লেড দুমড়ে মুচড়ে ফ্যানটাও মরে যাবে।

কয়েকটা আক্ষেপ শুধু রয়ে যাচ্ছে কথাকলির, জবার কাছে ক্ষমা চাওয়া হল না। দেখা হল না বাসরলতা গাছটা। গাছটাকে একবার দেখার খুব সাধ ছিল।

কয়েকটা আক্ষেপ শুধু রয়ে যাচ্ছে কথাকলির, জবার কাছে ক্ষমা চাওয়া হল না। দেখা হল না বাসরলতা গাছটা। গাছটাকে একবার দেখার খুব সাধ ছিল। পনেরোই মার্চ স্কুলের বড়দিভাইয়ের জন্মদিন। বৃদ্ধাবাসে বসে পথ চেয়ে থাকবেন কথাকলির জন্য। কথাটা যেদিন কানে এসেছিল, বড়দিভাই এখন বৃদ্ধাবাসে আছেন, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বড়দিভাইয়ের দুই সন্তানই প্রতিষ্ঠিত। ছেলে এবং মেয়ে। তাদের কাছে ঠাঁই হল না। সন্তানসম কত ছাত্রী তাঁর, কেউ হয়তো খোঁজই নেয় না। বড়দিভাইয়ের জন্মদিনটা মনে ছিল কথাকলির। স্কুলে পড়াকালীন ওইদিনটা প্রত্যেক ছাত্রী ফুল দিত বড়দিভাইকে। যে কোনও ফুল, পলাশ, গোলাপ, টগর, করবী... ভীষণ গম্ভীর বড়দিভাই সেদিন একেবারেই বদলে যেতেন, নরম সরম, মুখে লজ্জা আর অপ্রতিভতার হাসি। কথাকলি তখন কলেজে পড়ছে। রাস্তায় একদিন সন্ধ্যাদির সঙ্গে দেখা। স্কুলের ঘণ্টা বাজানো, টিচারদের চা-জল দেওয়ার কাজ করত সন্ধ্যাদি। কথাকলি স্কুলের খবর নিতে গিয়ে জানল বড়দিভাই বৃদ্ধাবাসে। বড়দিভাইয়ের জন্মদিন ক'দিন পরেই। সন্ধ্যাদির থেকে বৃদ্ধাবাসের ঠিকানা নিয়েছিল কথাকলি। জন্মদিনের দিন বিহানকে নিয়ে বৃদ্ধাবাসে গিয়েছিল, সঙ্গে ফুল-মিষ্টি। স্মৃতি উদ্ধারে সময় লাগছিল। মনে পড়ার পর কথাকলিকে জড়িয়ে সে কী কান্না! তিন বছর হয়ে গেল মনে করে বড়দিভাইয়ের জন্মদিনের দিন বৃদ্ধাবাসে যাচ্ছে কথাকলি। শেষ দু'বছর একাই গেছে, বিহানের সময় নষ্ট করতে চায়নি। এবার যাওয়া হবে না। গোটাদিন অপেক্ষা করার পর বড়দিভাই ভাববেন, আর পাঁচজনের মতো কথাকলিও তাঁকে ভুলে গেছে। গত তিন বছর মনে করে এসেছিল, তাই অনেক! বড়দিভাইয়ের কানে পৌঁছবে না, তাঁর ছাত্রীটি আর নেই। বিহান নিশ্চয়ই এত বড় অবিবেচনার কাজটা করবে না, কথাকলি না থাকার খবরটা দেবে না বড়দিভাইকে। বিহানই বা কত দিন মনে রাখবে কথাকলিকে? যদিও কথাকলির শরীরী উষ্ণতা না পেয়ে বিহান লিখেছিল—

শীতের দেশের মেয়ে তুমি
বাতাস তোমাকে ভয় পায়
পাছে হিমেল হয়ে থমকে যায়
অহর্নিশ কাঁপছি আমি
দাঁড়াচ্ছি না রোদ্দুরে তবু
একদিন আসবেই বরফ যুগ
আমাদের প্রেম টিকে থাক শুধু

পত্রিকাটা হাতে এনে দিয়েছিল। ভেবেছিল কবিতাটা পড়ে কথাকলি কিছু একটা বলবে। কিছুই বলেনি কথাকলি। চেয়েছিল বিহানই খুঁজে মরুক কথাকলি তাকে মনের কোনখানে লুকিয়ে রেখেছে।

মোবাইলে রিং হচ্ছে আবার। নাম নেই, শুধুই নাম্বার। অচেনা কেউ বলেই কলটা রিসিভ করে। ভাঙা নিস্তেজ কণ্ঠে হ্যালো বলতেই ওপ্রান্ত নার্ভাস গলায় বলে ওঠে, "দিদিভাই, আমি কার্তিকদা বলছি, বাবুর খুব শরীর খারাপ। বাড়ির জন্য রওনা দাও এক্ষুনি। আমি বাবুর কাছেই আছি।"

৮

ছোটবেলায় ট্রেনে করে যখন দেশের বাড়ি যাওয়া হত, বাবা ছেলেমেয়েদের বলত, বাইরের দিকে তাকা। সবুজ দেখলে চোখ ভাল হয়। আদৌ হয় কি না, জানে না বিহান। তবে মনের চোখের জন্য সবুজ যে খুবই উপকারী, এটা বুঝেছে বড় হতে হতে। আজ অনেক দিন পর অপার সবুজের মধ্যে এসে পড়েছে বিহান। ট্রেনেই আছে বিহান। সিট পেয়েছে জানলার ধারে। বাইরে সকালের নরম আলোয় দিগন্তলীন ধানজমি। এক্সপ্রেস ট্রেন। বিহান নামবে বেলদায়। স্টেশনে তাকে নিতে আসবে চন্দ্রিমাদের বাড়ির লোক। বেলদা থেকে ধুমুরিয়া দেড়ঘণ্টার পথ। এক সপ্তাহ হল চন্দ্রিমাদের বিপদ কেটে গেছে। ধুমুরিয়া গ্রামটাকে একবার দেখার ইচ্ছে ছিল বিহানের, তবে এত তাড়াতাড়ি নয়। এখন যাওয়া মানে নিজেকে জাহির করা,

দ্যাখো, তোমাদের কেমন বাঁচিয়ে দিলাম।
সদ্য বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে ওরা। বিহানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল। খাতিরযত্নে বাড়াবাড়ি করে ফেলবে। যা কোনও ভাবেই প্রাপ্য নয় বিহানের। অকারণ গুরুত্ব পেতে ভাল লাগবে না তার। ওদের মনের এখন যা অবস্থা, বিহান প্রকৃত ঘটনা বোঝাতে চাইলেও বুঝবে না। মাস কয়েক অতিবাহিত হলে চন্দ্রিমাদের আবেগ অনেকটাই থিতিয়ে আসবে, তখন এলেই ভাল হত।
চন্দ্রিমার জোরাজুরিতে ধুমুরিয়ায় যেতে হচ্ছে বিহানকে। বিপদমুক্তির খবর দিয়ে চন্দ্রিমা বলেছিল, "একটা গন্ডগোল করে ফেলেছি বিহানদা। এম.এল.এ বুঝতে চাইছিলেন আপনি আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে কতটা কানেক্টেড। জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন কিনা? আমি বলে দিয়েছি দু'বার এসেছেন। ওয়েল কানেক্টেড বোঝানোর জন্য বলেছি। যাতে আমাদের ফ্যামিলিকে উনি এবং ওঁর দলের ছেলেরা বরাবরের জন্য সমঝে চলে। এবার যদি কোনও ভাবে ফাঁস হয়ে যায় আপনি কোনও দিনই আসেননি এখানে, আমরা ফলস পজিশনে পড়ে যাব।"
চন্দ্রিমাদের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করেছিল বিহান। তার সঙ্গে এটাও মনে হয়েছিল যেখানকার সমস্যা নিয়ে বড় নেতার হস্তক্ষেপ চেয়েছিল সে, সেই এলাকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা থাকাটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বড় নেতা যদি মনে করেন, যে কোনও দিন ফোন করে ধুমুরিয়া নিয়ে বিহানের সঙ্গে আলোচনা করতেই পারেন। উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে ধুমুরিয়ার ভালমন্দের শরিক হয়ে গেছে বিহান। গ্রামটা দেখা থাকলে বড় নেতার সঙ্গে কথা চালাতে সুবিধে হবে। সবদিক বিবেচনা করে ধুমুরিয়ায় যাওয়া স্থির করে বিহান। চন্দ্রিমাদের গ্রামে যাচ্ছে জানাতে ফোন করেছিল কলিকে। বেজে গেল ফোন।
দ্বিতীয়বার ট্রাই করেও একই রেজাল্ট। কখন যে কী মুডে থাকে, কোনও ঠিক নেই।
গত কিছু দিনের ভিতর বিহানের জীবনে বড় দুটো ঘটনা ঘটে গেছে। একটা সিনেমা পত্রিকা প্রত্যেক বছর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুরস্কার দেয়। সেই বছর যে যে সিনেমা রিলিজ করেছে তার নিরিখে। এ বছর শ্রেষ্ঠ গীতিকারের পুরস্কারটা পেয়েছে বিহান। পুরস্কারের খবরে এতটাই সারপ্রাইজড হয়েছিল, প্রথমেই সন্দেহ হয়, বিহান মুখার্জি নামে অন্য কোনও গীতিকার নেই তো? সবচেয়ে আগে পত্রিকা অফিস থেকে এসেছিল খবরটা। বিহান পুরস্কারটা নিতে সম্মত কিনা, এই মর্মে ফোন করেছিলেন ওঁরা। তারপরই রূপাঞ্জনা সেনের ফোন আসে। কনগ্র্যাচুলেশন্স জানান। ভীষণ খুশি হয়েছেন। এতটা খুশির কারণ, ওঁর গানটার কথাই পুরস্কার পেয়েছে। পরের দিন কাগজে খবরটা বেরিয়ে গেল। অভিনন্দন জানিয়ে একের পর এক ফোন আসতে লাগল। একজনের জন্য অভিমান পুষে রেখেছে বিহান, পুরস্কার প্রাপ্তির পর কলি এখনও পর্যন্ত একটাও ফোন করেনি। বিহান ডিসিশন নিয়েছে যেচে খবরটা জানাতে যাবে না। যাইহোক, এক ধাক্কায় অনেকটাই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে বিহান।
দ্বিতীয় বড় ঘটনা হল, বিহানের একটা স্মার্ট ফোন হয়েছে। পুরস্কার পাওয়ার আগেই ফোনটা কিনেছিল, রূপাঞ্জনা সেনের তাগাদায়। বারবার বলছিলেন, ইন্টারনেট কানেক্টেড না থাকলে আজকের দিনে তুমি অচল। ফেসবুক করতে পারবে, বন্ধু হবে কত! কাজের ইন্সপিরেশন পাবে তাদের থেকে।
ফোন কেনার পর বাড়িতে পড়তে আসা বউদির এক ছাত্রর সাহায্য নিয়ে সোশাল নেটওয়র্কিং সাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে ছিল বিহান। চারদিনে বন্ধুর সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে গেল। হিট গীতিকার বলে কথা! পুরস্কার প্রাপ্তির পর বন্ধুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় হাজারের ওপর। চ্যাট করেছে এমন অনেক মেয়ের সঙ্গে, কোনও দিন সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ মনে হবে কালই বুঝি ভিক্টোরিয়ায় বসেছিল দু'জনে।
বউদি ব্যাপারটা নোটিশ করে ধ্যাতানি দিল। বলেছিল, "গান লেখার জন্য এত বন্ধু হয়েছে, এবার বন্ধুদের কারণে গান-কবিতা সব শিকেয় উঠবে। দিনরাত যদি ফোন নিয়ে খুটুর খুটুর করতে থাকো, লেখা নিয়ে ভাববে কখন?"
বিহানও বুঝেছে বন্ধুর সংখ্যা একটা আত্মপ্রসাদ দেয় বটে, সেই বন্ধুত্বর কোনও সারবত্তা থাকে না। ঠিকঠাক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে খুব কম জনের সঙ্গেই। ফোনের সুইচ টিপে গান-কবিতা লেখা প্র্যাকটিস করছে বিহান।
ট্রেনের জানলার বাইরে দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে, পাকা ঘর-বাড়ি, দোকান-বাজার। পাশের প্যাসেঞ্জার বলল, "বেলদায় ঢুকছে গাড়ি।"
"থ্যাঙ্ক ইউ।" বলে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সিট ছেড়ে উঠে পড়ল বিহান। পাশের লোকটিকে নিয়মিত যাত্রী মনে হওয়াতে বলে রেখেছিল বেলদা এলে একটু বলবেন। ট্রেনের দরজা লক্ষ করে এগিয়ে যায় বিহান।
চন্দ্রিমার নির্দেশ মতো বেলদা স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে বিহান দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি সৌম্যদর্শন ফিটফাট যুবক এগিয়ে এসে বলল, "আপনিই বিহান মুখার্জি তো?"
"হ্যাঁ।"
"আমি চন্দ্রিমার ভাই, দুলাল। আসুন।"
কথা প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা তার খুড়তুতো ভাইয়ের নাম তুলেছে। বিহান দুলালের সঙ্গে পা মিলিয়ে স্টেশন চত্বরের বাইরের দিকে এগোয়। জিজ্ঞেস করে, "আমরা কীসে যাব?"
"আপনি গাড়িতে যাবেন। স্ট্যান্ডে বলে রেখেছি। আমি বাইকে। আপনার গাড়ির সামনে সামনে যাব।"
"আমি তো তোমার বাইকের পিছনে চেপেই যেতে পারতাম। গাড়ি বলতে গেলে কেন?"
"বাইকে আপনার কষ্ট হবে। রাস্তার অনেকটা খারাপ।" সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন মডেলের বেশ কিছু গাড়ি। নতুন মডেলের একটা গাড়ি একটু এগিয়ে রাখা আছে, পাশে মোটর বাইক। নির্ঘাত দুলালের। এগিয়ে রাখা গাড়িটার ড্রাইভার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বিহানদের দিকে। গাড়ির কাছে গিয়ে বিহান পাশে থাকা দুলালকে বলে, "এই গাড়িটা তো?"
মাথা নেড়ে সায় দেয় দুলাল। বিহান এবার ড্রাইভারকে বলল, "কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি এর বাইকে যাব।"
"তা বললে হয়! আমি এক্ষুনি একটা প্যাসেঞ্জার ছাড়লাম, আমাকে বুক করে গেল বলে।"
পার্স বের করে ফেলেছে বিহান, একশো টাকার নোট ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "এটা নাও।"
টাকাটা নিতে যাচ্ছিল ড্রাইভার। দুলাল ধমকে ওঠে, "তোমার সাহস তো বড় কম নয়! জানো, নতুন কংগ্রেসের উনি কত বড় নেতা! কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামে আসছেন।"
হাত নামিয়ে পিছিয়ে গেল ড্রাইভার। দুলালের উপর একটু বিরক্তই হয় বিহান। বলে, "নেতাটেতার কথা আসছে কেন? প্যাসেঞ্জার ছেড়ে দেওয়াতে ওর ক্ষতি হয়েছে, কমপেনসেট করা উচিত।" টাকা হাতে নিয়ে ড্রাইভারের দিকে এক পা এগোল বিহান।
"না, স্যার। লাগবে না স্যার।" বলে গাড়িতে ঢুকে পড়ল সে। বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়েছে দুলাল। বিহানকে ডাকে, "চলে

আসুন।"

এতক্ষণে রাস্তা বেশ খারাপ হল। গত একঘণ্টায় দুলাল পাকা রাস্তায় বাইক চালিয়েছে। বেলদা থেকে মাকুরদা হাইওয়ে ধরে আসা হল, তারপর পঞ্চায়েতের রাস্তায় নেমেছিল দুলাল। সেই রাস্তাও পিচঢালা। দু'পাশে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, আরও সব নাম না জানা গাছের সারি। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ফসলের জমি, জলাশয়। একটা বড় দিঘির দিকে আঙুল তুলে দুলাল বলেছিল, "ওই হচ্ছে হাতিডোবা পুকুর। জরিমানার মধ্যে ধরেছিল ওরা। পুকুরটা আমাদের নামে হলেও, গ্রামের মানুষই ব্যবহার করে বেশি। ওরা আসলে গ্রাম থেকে আমাদের নামটাই মুছে দিতে চেয়েছিল।"

"পুকুরটার ওরকম নাম কেন? সত্যিই হাতি ডুবে গিয়েছিল?" জিজ্ঞেস করেছিল বিহান।

দুলাল বলল, "না, ওই পুকুরে পুরনো যুগের পাথরের হাতির মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকেই নাম, হাতিডোবা পুকুর। সরকারের লোক নিয়ে গেছে মূর্তিটা।"

"তোমাদের পুকুর যখন চলে এল, বাড়ি নিশ্চয়ই কাছেই।" সাধারণ অনুমানে বলেছিল বিহান।

আন্দাজ মেলেনি। দুলাল বলেছিল, "বাড়ি এখনও অনেকটাই রাস্তা। এত দূরে পুকুরটা কেনার পিছনে অন্য কারণ আছে। আগের মালিক পুকুরটা বিক্রি করে দিচ্ছিল এক মাছ ব্যবসায়ীকে। তখন শ্যালো পাম্পের চল হয়নি। ওই পুকুরের জল দিয়েই আশপাশের জমিতে সেচ দেওয়া হয়। পুকুরটা কেনার টাকা ওই জমির চাষিদের ছিল না। জেঠুকে এসে ধরল তারা। চাষিদের মুখ চেয়ে অনেক কষ্টেসৃষ্টে টাকা জোগাড় করে পুকুরটা কিনে নিয়েছিল জেঠু। শ্যালো এসে যাওয়াতে সেচের জন্য ওই পুকুরের জল আর প্রয়োজন হয় না। মাছ চাষ করে আশপাশের জমির মালিক, খেয়ালখুশি মতো আমাদের খানিকটা দিয়ে যায়।"

আরও মিনিট পনেরো ড্রাইভ করে বিশাল বটগাছের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তা ধরেছে দুলাল। বাইক লাফাচ্ছে। দুলাল বলল, "আমাকে ভাল করে ধরে রাখুন। এসে গেলাম প্রায়। আর পাঁচ মিনিট।"

"স্টেশনে যে তুমি বললে রাস্তা অনেকটাই খারাপ, বেশির ভাগটাই তো ভাল।" বলল বিহান।

দুলাল বলল, "আপনার মতো একজন মানী লোককে বাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসা ভাল দেখায় না। তাই গড়ির ব্যবস্থা করেছিলাম। জেঠু ভীষণ রাগ করবে আমার উপর। আপনি কিন্তু একটু বলবেন, নিজেই জোর করে এসেছেন।"

"চিন্তা কোরো না, বলব।" বলে দু'পাশ দেখতে থাকে বিহান। গভীর গ্রামে ঢুকে পড়েছে। আখক্ষেত, পানবরজ, ধানখেতের পাশ দিয়ে সাপের চলনে চলেছে রাস্তা। মাঝে-মাঝে পথের ধারে বিশাল গাছ, গ্রামের শতপ্রাচীন অভিভাবক। একটা মোড় ঘুরতেই রাস্তা একটু ভাল হল, মোরাম বিছানো। দুলাল বলল, "ওই যে, শেষ বাড়িটা আমাদের।"

বাইকের আওয়াজ পেয়ে রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রিমাদের ফ্যামিলি, পাড়াপ্রতিবেশীরাও আছে মনে হচ্ছে, লোকজন হিসেবের বেশি। ভিড় দু'ভাগ করে দিয়ে দুলাল উঠোনে এসে থামাল বাইক। বাড়ির সকলের মুখে চাপা আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আন্তরিক অভ্যর্থনা। অনেকেই বিহানের উদ্দেশে হাতজোড় করে আছে। অশীতিপর এক বৃদ্ধকে ওই ভঙ্গিতে দেখে ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে বিহানের। সম্ভবত চন্দ্রিমার ঠাকুরদা। পরনে ধবধবে ধুতি-পিরান, বিহান আসবে বলেই সাজানো হয়েছে। চন্দ্রিমাকে এগিয়ে আসতে দেখে স্বস্তি ফিরল বিহানের। সামনে এসে চন্দ্রিমা বলল, "কত দিন পর, বিহানদা। আপনি কিন্তু একই রকম দেখতে আছেন।"

বিহান শুধু হাসল। সবার সামনে বলতে পারল না, "তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। পরিপূর্ণ ভাব এসেছে শরীরে। সাদা সালোয়ার কামিজে রাজহাঁসের মতো লাগছে।"

"বাইকে আসতে হল কেন? গাড়ি পাওয়া যায়নি?" কথাটা দুলালের উদ্দেশে যিনি বললেন, অবধারিত শ্রীকান্ত মিশ্র। আগে দেখা না হলেও চন্দ্রিমার ফ্যামিলি মেম্বারদের মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে বিহান। দুলাল তার জেঠুকে বোঝাচ্ছে কেন গাড়িতে আসা হয়নি।

চন্দ্রিমা ভাইকে বলে, "ব্যাগটা বিহানদার ঘরে রেখে আয় আগে।"

বিহান বাইকে ওঠার সময় ব্যাগটা নিয়ে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে ছিল দুলাল। বিহান আপত্তি করেছিল, শোনেনি। 'বিহানদার ঘর' কথাটা এমন সাবলীল ভাবে উচ্চারণ করল চন্দ্রিমা, সত্যিই যেন এ বাড়িতে বিহানের একটা ঘর আছে। চন্দ্রিমা বলে, "চলুন, ওখানে বসে একটু রেস্ট নিন। কতটা জার্নি করে এলেন! শেষটুকু আবার বাইকে।"

কথার মাঝেই মাটির দালানের দিকে পা বাড়িয়েছে চন্দ্রিমা, ওখানে তিনটে ফাঁকা চেয়ার। পাশে হাঁটতে থাকা বিহানের উদ্দেশে চন্দ্রিমা বলে, "আপনার সঙ্গে যদি কথাকলিও আসত, কত ভাল হত। ওরও তো আসা হয়নি আমাদের বাড়িতে।"

"আমার সঙ্গে ওকে ছাড়বে কেন ওর বর?" মজার সুরে বলল বিহান।

চন্দ্রিমা চুপ করে রইল। দালানে এসে চন্দ্রিমা বলল, "আপনি মাঝখানের চেয়ারটায় বসুন।"

ওটাতে বসতে বলা হবে আগেই আন্দাজ করেছিল বিহান, মাঝেরটা কাঠের এবং সামান্য কারুকাজ করা। পাশের দুটো প্লাস্টিকের। চেয়ারে বসে চন্দ্রিমার উদ্দেশে বিহান বলে, "তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখছি।"

"কী?"

"আমরা যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম, সবসময় শাড়িতে ছিলে তুমি..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে চন্দ্রিমা বলে, "জানি, তাই আপনারা আমার নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গবালা'। এখন এত দিন পর কেন সালোয়ার-কামিজ, তাই তো? গ্রামের মেয়েরা আজকাল অনেক বয়স অবধি সালোয়ার-কামিজ পরে। বিয়ের পর অবশ্য পরতে দেখা যায় না। আপনি কী ভাবেন, শহরেই শুধু পরিবর্তন হচ্ছে, গ্রামে হচ্ছে না?"

শ্রীকান্ত মিশ্র এগিয়ে এলেন। হাতজোড় করেই বললেন, "হাত-মুখটা এবার ধুয়ে নিন। জলখাবার দিতে বলি। সেই কখন খেয়েছেন..."

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বিহান। বলে, "এবার তো আমায় চোখে দেখলেন, বয়স আপনার চেয়ে অনেকটাই কম। আপনি বলাটা ছাড়ুন।"

"বয়সে যতই কম হন, আপনি আমার কাছে পরম শ্রদ্ধার মানুষ। ভয়ে আতঙ্কে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি। নিজেকে বাঁচানোর মতো লোক পাইনি। আমার দলের নেতারও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আপনি এগিয়ে না এলে..."

কথা শেষ করতে পারলেন না শ্রীকান্ত মিশ্র। অভিজাত চেহারার মানুষটার উজ্জ্বল মুখ বড় করুণ হয়ে এল। চোখ সরিয়ে নেয় বিহান। সামনে নিকনো উঠোন, গাছের নরম ছায়া, পুকুরপাড়ে ফুলগাছ...এসব দেখে বিশ্বাস হয় না, এখানে কোনও সন্ত্রাসের আয়োজন হয়েছিল!

Scanned with CamScanner

বিকেলে চন্দ্রিমার সঙ্গে গ্রাম ঘুরতে বেরিয়েছে বিহান। দুপুরে ভাতটাত খেয়ে সাজানো ঘরে দারুণ একটা ঘুম লাগিয়েছিল। চন্দ্রিমা এসে ঠেলে তুলল, "কী সেই তখন থেকে ঘুমোচ্ছেন। কাল সকালেই চলে যাওয়ার প্ল্যান করে রেখেছেন, গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবেন না?"

চা খেয়ে চন্দ্রিমার সঙ্গে বেরোল বিহান। এখন শাড়ি পরে আছে চন্দ্রিমা। ওর পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে অসচেতন ভাবেই দূরত্ব তৈরি করে ফেলছে বিহান। ইতিমধ্যে বারদুয়েক চন্দ্রিমা বলেছে, 'কী হল, অত দূরে-দূরে হাঁটছেন কেন? গ্রামের লোক কী ভাববে মনে করে? এখন আর সেদিন নেই, গ্রাম অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছে।"

এই দূরত্ব রচনায় নিহিত আছে নিকটত্বের সম্ভাবনা, জানে না চন্দ্রিমা। অবচেতন বিহানকে নির্দেশ পাঠাচ্ছে চন্দ্রিমাকে পরখ করতে। বুঝে নিতে বলছে। কাউকে বুঝতে হলে একটু দূরত্ব রাখা দরকার, নয়তো দেখাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। পরখ করার ইচ্ছেটা মাথায় ঢোকালেন ব্রজলাল মিশ্র, চন্দ্রিমার ঠাকুরদা।

বিহান দুপুরের খাবার খেয়ে টানটান হয়েছে বিছানায়, জানলা, দরজার পর্দা টেনে অন্ধকার করে চন্দ্রিমা চলে গেছে, সবে চোখ বুজতে যাবে বিহান, একেবারে নিঃশব্দে ঘরে উদয় হলেন ব্রজলাল। বিহান উঠে বসতে যাচ্ছিল, উনি বলে উঠলেন, "না না, আপনি শুয়ে থাকুন। দুটো কথা সেরে আমি চলে যাব।"

এই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটার সঙ্গে শুয়ে কথা বলা যায় নাকি, উঠে বসেছিল বিহান। উনি বসলেন সামনের চেয়ারটায়। ভূমিকা হিসেবে বললেন, "রান্নাবান্না সব ভাল হয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর।"

"আমার ছোট বউমা সব রেঁধেছে। রান্নার হাতটি তার ভারি ভাল। তো যা বলতে এসেছিলাম, আমার নাতনিকে আপনার পছন্দ হয়?"

বিস্ময়ে থতমত খেয়ে বিহান বলেছিল, "মানে!"

"মানে, পাত্রী হিসেবে পছন্দ হয় কি না জানতে চাইছি? যত দূর জেনেছি, আপনি অবিবাহিত, আমরা দুই পক্ষই ব্রাহ্মণ। আশা করা যায় আপনার পরিবার থেকে কোনও আপত্তি আসবে না।"

বৃদ্ধের বলার ধরনটা এমন, যেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে বিয়ের প্রস্তাব পাচ্ছে বিহান। বিস্ময় কেটে গিয়ে তখন বেশ মজাই লাগছিল। সেটা প্রকাশ না করে সিরিয়াস ভঙ্গিতে চন্দ্রিমার ঠাকুরদাকে বলেছিল, "আপনি যে প্রসঙ্গটা তুললেন, সেটা কি পরিবারের সকলের সম্মতিক্রমে?"

"না, আমি তাদের সঙ্গে আলোচনায় যাইনি। বয়স হয়েছে বলে তারা আমার কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু আমি জানি চন্দ্রিমাকে আপনি বিয়ে করলে, এই পরিবারের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি তো আমাদের জন্য অনেকটা করলেন, অবশিষ্টটুকু করলে আপনার কাজ সম্পূর্ণ হয়।"

বৃদ্ধের বক্তব্য ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি বিহান। বলেছিল, "চন্দ্রিমাকে নিয়ে কী সমস্যা হল?"

"হয়নি, পরে হবে। এ বাড়ির লোকেরা ভাবছে নতুন কংগ্রেস বুঝি বরাবরের জন্য রেহাই দিয়েছে। আবার ফিরবে ওরা, অন্য দাবি নিয়ে। আমি সেদিন মন দিয়ে এম এলএ সাহেবের কথা শুনেছি। উনি শ্রীকান্তকে বলেছেন, এখানকার ভোটটা যাতে আমরা পাই, একটু দেখবেন। তার সঙ্গে আর একটা কথার সূত্রপাত করে গেছেন, সামনের পঞ্চায়েত ভোটে এখানে মহিলা ক্যান্ডিডেট চাই। সিট রিজার্ভ হয়ে গেছে। ওদের দলে কইয়ে বলিইয়ে, পড়াশোনা জানা মহিলা নেই, সেই নিয়ে চিন্তায় আছেন। আমার ধারণা ওরা নাতনিকেই ক্যান্ডিডেট করতে চাইবে। এখন জরিমানা-শাস্তি মকুব করেছে, তার প্রতিদান দিতে হবে না। আপনি যদি চন্দ্রিমাকে বিয়ে করে নেন, ওরা আর কিছুই করতে পারবে না।"

একটানা কথা বলে থেমেছিলেন বৃদ্ধ। বিহান বলেছিল, "আপনার নাতনি যদি ওদের হয়ে ভোটে দাঁড়াতে রাজি হয়, তা হলে তো আর কোনও অসুবিধে নেই।"

"নাতনি রাজি হবে কি না, জানি না। পারমিশন দেবে না ওর বাবা। এই তো কিছু দিন আগে শ্রীবাস বাঁচার জন্য নতুন কংগ্রেসে নাম লেখাবে ঠিক করেছিল, শ্রীকান্ত ওকে বউ-ছেলেসুদ্ধু বার করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। নেহাত ছোট বউমার রান্নার হাত ভাল, ওর বানানো খাবার ছাড়া আমাদের মুখে রোচে না, তাই ফিরিয়ে আনা গিয়েছে।'

বিহানকে চুপ করে থাকতে দেখে চন্দ্রিমার ঠাকুরদা বলেছিলেন, "আপনি কী ভাবছেন, আমি জানি। নাতনি এই বিয়েতে মত দেবে কি না? খুব দেবে। আপনার বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি সেটা বুঝেছি। আপনাকে পাত্র হিসেবে পেলে এ বাড়ির লোকও বর্তে যাবে। স্পর্ধা করে প্রস্তাবটা দিতে পারবে না। আমার বয়স হয়েছে, সাহস আর ভয়ের ভেদাভেদ মুছে গিয়েছে। মরার আগে পরিবারের জন্য যদি একটা কাজের কাজ করতে পারি, সেই ভেবে প্রস্তাবটা দিতে এলাম।"

এত বয়সেও বৃদ্ধের এরকম পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল বিহান। গ্রামের খাঁটি জল-হাওয়ার কারণেই বোধহয় মাথা এখনও এত সজীব। বিহান বলেছিল, "আমি তো এইমাত্র সব শুনলাম, এসব ব্যাপারে ডিসিশন নিতে সময় লাগে। আমাকে ভাবতে দিন।"

"আপনি ভাল করে ভাবুন। গুরুজনদের মতামত নিন। তারপর জানাবেন। আমি তা হলে আসি।" বলে নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রিমার ঠাকুরদা।

বিহান ভেবেছিল ঘুমের বারোটা বোধহয় বাজল। তা হয়নি, দিব্যি ঘুম হল। চন্দ্রিমা ডেকে দেওয়ার পর থেকেই মাথায় ঘুরছে, বিয়ে তো করতেই হবে, চেনাজানার মধ্যে করতে অসুবিধে কোথায়?

লাইফ পার্টনার হিসেবে চন্দ্রিমাকে না ভাবার তো কারণ নেই। ভাবনাটা মাথায় চেপে বসার পর থেকেই চন্দ্রিমাকে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

এক গৃহস্থের বেড়ার কাছে চলে গেছে চন্দ্রিমা। ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকে, "বিহানদা, এদিকে একবার আসুন। একটা দারুণ জিনিস দেখাই।"

বিহান চন্দ্রিমার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে গৃহস্থের উঠোনে রাখা নোঙর দেখিয়ে চন্দ্রিমা বলল, "কী বিরাট, না?"

"হ্যাঁ, জাহাজের মনে হচ্ছে।" বলল বিহান।

চন্দ্রিমা বলে, "আমাদের গ্রামে কিন্তু কোনও নদী নেই। এ বাড়ির পূর্বপুরুষরা চাষ করতে গিয়ে এটা পেয়েছে। তার মানে এক কালে এ গ্রামে নদী ছিল, সমুদ্র খাঁড়িও থাকতে পারে। দিঘা তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। পিছিয়ে গেছে সমুদ্র। সেকালে জাহাজ চলাচল আমাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে, ভাবতে কেমন লাগে না!"

বেড়ার ধার থেকে সরে এল চন্দ্রিমা। বলল, "চলুন, এবার দেখাই নোঙরটা কোথা থেকে পাওয়া গিয়েছে। নোঙরের মাঠ বলি আমরা। নদীর একটা আভাস দেখতে পাবেন।"

ফের মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল দু'জনে। বিহান বলল, "এখানে যখন আসছিলাম, দুলাল তোমাদের পুকুরটা দেখাল। হাতিডোবা পুকুর। পাথরের হাতির মূর্তি পাওয়া গেছে পুকুর থেকে। নোঙরটা দেখে বোঝা গেল নদী বা মোহনা ছিল এ

Scanned with CamScanner

গ্রামে। এসব ইতিহাসের সাক্ষী। কত যুগ ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বাস করেছে এখানে। বর্তমানের মানুষরা ভাবি, পৃথিবীটা শুধু আমাদের। আমরা যে পৃথিবীর, কদিন বাদে হারিয়ে যাব, ভাবি না।"

"আপনি ভারি সুন্দর করে কথা বলেন! আমরা যেবার একসঙ্গে বেড়াতে গেলাম, চুপচাপ ছিলেন কেন অত? আপনি কি কথাকলিকে ভয় পান?"

বিহান শুধু হাসে। উদাসীন ধরনের হাসি, যা থেকে হাঁ না কোনওটাই বোঝা যাবে না।

নোঙরের মাঠের ধারে একটা গাছতলায় বাঁশের মাচা। চায়ওয়ালার বোধহয় বানিয়েছে। সেখানেই বসেছে চন্দ্রিমা, বিহান। বিকেল পুরনো হয়ে হলুদ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও আড়ালে বসে কুরো পাখি ডাকছে কুরকুর। আরও যেন নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। নোঙরের মাঠটা ঠিক মাঠের মতো নয়, বেশ নীচের দিকে, একটা খাত মতো। চলে গিয়েছে অনেক দূরে। এক সময় নদী ছিল দিব্যি বোঝা যায়। এখন চাষ হয়েছে। চন্দ্রিমা একদম কাছে বসে থাকার কারণে ওর দিকে ভাল করে তাকাতে পারছে না বিহান। মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে চন্দ্রিমা। হঠাৎ বলে ওঠে, "সমুদ্রে বৃষ্টি নামুক, হাতের মুঠো আকড়ে ধরুক, বিন্দু বিন্দু আশা, দু'চোখ ভরে বপনের স্বপ্ন জেগে থাক, আগামী মরসুমে ফুটবে ভালবাসা।"

বিহান চমকে ওঠে। বলে, "এই কবিতাটা তুমি জানলে কী ভাবে?"

মিটিমিটি হেসে চন্দ্রিমা বলল, "আমি আধুনিক কবিতা খুব একটা বুঝি না। আপনার এই কবিতাটাও পুরোপুরি বুঝিনি। কিন্তু কেন জানি ভীষণ ভাল লেগেছে। 'সংবাদ প্রবাহ'-এর রিপোর্টার পথিক ওদের একটা পত্রিকা দিয়ে গিয়েছে বাবাকে, সেখান থেকেই কবিতাটা পেলাম।"

স্বাভাবিক ভাবেই বিহানের খুব ভাল লাগছে, কোথায় কোন লিটল ম্যাগাজিনে বেরোনো তার কবিতাটা একটা মেয়ে আবৃত্তি করছে, কবিজীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!

চন্দ্রিমা বলল, "পথিককে ফোন করে জানিয়েছি, আপনি আসছেন। সন্ধেবেলা দেখা করতে আসবে বলেছে। ওর একটা অ্যাসাইনমেন্টে বেরিয়েছে। খুব আফসোস করছিল। বলছিল, আপনার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে পারলে ভাল হত। তখন আবার আমি আপনাকে বিকেলে পেতাম না। আমার আফসোস হত!"

কথা শেষে ফিক করে হেসে ফেলল চন্দ্রিমা। এই মেয়েটাও চার বছর আগে কলির সামনে নিরীহ ভাব করে থাকত। ফের চন্দ্রিমা বলে, "আপনি আসছেন জানিয়ে এম এল এ জয়ন্ত মান্নাকেও ফোন করেছিলাম, উনি বলেছিলেন জানাতে। কলকাতায় গেছেন জয়ন্ত মান্না। দেখা না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করলেন। বললেন, পরের বার আপনি যখন আসবেন, আগে থেকে জানাতে।"

"ভালই হয়েছে দেখা না হয়ে। রাজনীতির ঝানু লোকদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা চালানোর ক্ষমতা আমার নেই। কী বলতে, কী বলে বসব..."

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। আলো কমছে দ্রুত। কুরো পাখিটা এখনও ডেকে যাচ্ছে। মিষ্টি হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়ায় জলের গন্ধ। মনে করাচ্ছে এখানে নদী ছিল একসময়। বিহান বলে ওঠে, "তোমার ঠাকুরদা আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন দুপুরে।"

"আন্দাজ করতে পারছি, কী প্রস্তাব। আপনি কিন্তু সেটা আমায় বলবেন না।" বলল চন্দ্রিমা।

"কেন?"

"যদি লোভে পড়ে 'হাঁ' বলে ফেলি! আমি জানি আপনি কথাকলির চিরজীবনের জন্য। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম রাজাডাঙায়। আমি যে ব্যাপারটা জেনে গিয়েছি, সেটা কথাকলিও জানে না। লুকিয়ে বিষয়টা জেনেছিলাম বলে আপনাদের দু'জনের সামনে কথাটা তুলতে পারিনি, এখন মনে হয় খুব ভুল করেছিলাম।" একটু থেমে রাজডাঙার সেই ঘটনা বলতে শুরু করল চন্দ্রিমা। কুরো পাখিটা আর ডাকছে না। ও-ও বোধহয় শুনছে চুপ করে।

সন্ধে নেমে গিয়েছে। বিহান এখন চন্দ্রিমাদের দালানে, সকালে এসে যে চেয়ারে বসেছিল, সেটাতেই বসেছে। পাশের একটা চেয়ার খালি, অন্যটাতে পথিক, হাতে প্যাড-পেন। নিজের মোবাইল রেকর্ডিং মোডে রেখে বিহানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। নিজেদের লিটল ম্যাগের জন্য ইন্টারভিউ নিচ্ছে বিহানের। সাংবাদিক তো, স্বভাব যাবে কোথায়! পথিক এখন বলছে, "ওই যে, রূপাঞ্জনা সেনের গাওয়া গানটা, আমার মাটির দাওয়ায় চাঁদের আলো... আলো আমার মাচানে মাচানে এমন রইতে সখা আমার... কোন ঠাকুরে কে জানে...এমন অনায়াসে এই গান আপনি লিখলেন কী করে? থাকেন শহরে, গ্রামবাংলার এত সুন্দর চিত্রকল্প কী করে এল মাথায়? গ্রামের সঙ্গে কি নিয়মিত যোগাযোগ আছে আপনার?"

দু'কলম লিখে ইন্টারভিউ দিতে বেশ কষ্টই লাগছে বিহানের। পথিক নাছোড়। প্রশ্ন যেমন পথিক করছে, আর একজন গ্রাম্য মহিলা দালানধারে বসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বিহানের দিকে। চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায় এ বাড়ির ফরমাশ খাটে।

Scanned with CamScanner

চন্দ্রিমার সঙ্গে বেরিয়ে আসার পর থেকে মহিলাকে দেখছে বিহান, দেখতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ, মহিলা বিহানকে চোখ ছাড়া করছে না। কী বলতে বা শুনতে চাইছে, বোঝা যাচ্ছে না সেটাও। ওর দৃষ্টির সামনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে বিহান। চন্দ্রিমার কাছে ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিল। চন্দ্রিমা বলেছিল, ওর নাম কাবিলকু। রাতে অন্য কোথাও ঘুম হয় না, আমাদের বাড়িতে শুতে আসে। আপনাকে দেখতে আজ আগেভাগে চলে এসেছে।...এ কথার কোনও মানে খুঁজে পায়নি বিহান। নামটাও অদ্ভুত, 'কাবিলকু'!

"আমি কি প্রশ্নটা আবার করব?" বলল পথিক।

বিহান বলল, "না না, বলছি।" শুরু করল বিহান, "আমাদের

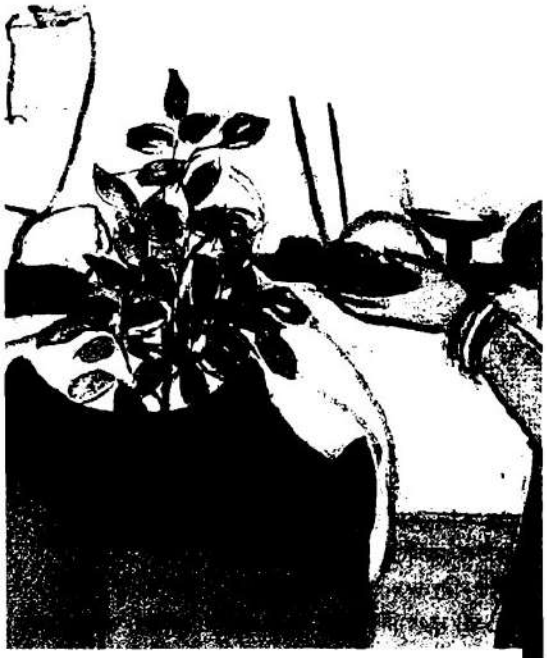

গোটা বিষয়টা অবিশ্বাস্য লাগছে বিহানের। উদয়ন সোমের মতো প্রবীণ মানুষ, শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল, তিনি এরকম নোংরা কাজ করতে যাবেন কেন?

আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে, নবাবগঞ্জ। দেশভাগের সময় ঠাকুরদা চলে আসেন এপারে, লালগোলায়। ওটাকেই দেশের বাড়ি মনে করতাম আমরা, মানে ভাইবোনেরা। বাবা কর্মসূত্রে হাওড়ায় চলে আসেন। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে দেশের বাড়ি গিয়েছি। গ্রামীণ পরিবেশ। বড় হয়ে আর যাওয়া হয়নি, তাই স্মৃতি অস্পষ্ট। দেশের বাড়ির নিজের অংশ বিক্রি করে হাওড়ায় বাড়ি করেন বাবা। আগে থাকতাম ভাড়াবাড়িতে। আমার হাওড়াতেই জন্ম। নিজের অংশ বিক্রি করে এলেও, বাবা দেশ থেকে গানটা নিয়ে এসেছিল। কাজের মাঝেই গুনগুন করে। গান লেখার প্রেরণা বাবার থেকেই।"

"তাই হয়তো আপনার গান আর কবিতার ভাষা আলাদা।"

পথিকের কথার কোনও উত্তর দেয় না বিহান, কিছুক্ষণ ধরে তার সামনে একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। বাইরের অন্ধকার থেকে উঠোন ধরে হেঁটে আসছে গরিবগুর্বো চেহারার লোক, সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, বিহানকে ভাল করে দেখছে, কেউ-কেউ নমস্কারের ভঙ্গি করছে, চলে যাচ্ছে উঠোন পার করে। এই নিয়ে বোধহয় ছ'জন হল। পথিক কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, বিহান হাতের ইশারায় থামায়। জিজ্ঞেস করে, "এরা কারা? আমাকে এভাবে লাইন দিয়ে দেখে যাচ্ছে কেন?"

হেসে ওঠে পথিক। বলে, "ওঃ, হো। বুঝতে পারেননি? আপনি গ্রামে এসেছেন, রটে গেছে। শ্রীকান্তবাবু যে বিপদে পড়েছিলেন, তার থেকে কোনও দিন রক্ষা পাবেন, এই গ্রামের লোক ভাবতেই পারেনি। কলকাতার কোনও একজন বাঁচিয়েছেন, এখানকার লোক জেনেছে আগেই। সেই মানুষটা গ্রামে পা রেখেছে, ওরা দেখতে আসবে না! ওদের চোখে আপনি এখন ভগবানের মতো।"

ভগবানের তুলনাটা এখানে আসার পর থেকে জ্বালাচ্ছে বিহানকে। এ বাড়ির লোকদের আচরণে বারবার প্রকাশ পাচ্ছে বিহানের প্রতি ভক্তি। চন্দ্রিমা বেড়াতে নিয়ে গেল, দোল মন্দির দেখাল, পোড়ো বৈষ্ণব আশ্রম, গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে মাদুর বোনাও দেখিয়েছিল। একটা জিনিস প্রায় সব বাড়িতে লক্ষ্য করেছে বিহান, দোরে-দোরে আলপনা দেওয়া। চন্দ্রিমাকে বলেছিল, বাড়িতে আলপনা দেওয়া কি এ গ্রামের বৈশিষ্ট্য? তোমাদের বাড়িতেও দেখলাম। হাসতে হাসতে চন্দ্রিমা বলছিল, না, এ হচ্ছে পৌষলক্ষ্মীর আলপনা। ধান গোলায় তোলার পর অঘ্রাণ আর পৌষ মাস জুড়ে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই পুজো হয়। আমি ছোট থেকে দেখছি, অথচ আজ যেন মনে হচ্ছে আপনি আসবেন বলেই সারা গ্রাম জুড়ে আলপনা দেওয়া হয়েছে।...এর পরও নানা প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা শুধু 'মহান' বানিয়ে গিয়েছে বিহানকে। এবার ব্যাপারটা বিরক্তিকর লাগছে।

আবার একটা লোক এসে দাঁড়াল উঠোনে। মাথা নিচু করে নমস্কারের ভঙ্গি করল। আর এখানে বসা যাবে না। ওঠার উদ্যোগ নিতে যাবে বিহান, চন্দ্রিমা এসে বলল, "বিহানদা, একবার আসুন। টিভিতে একটা খারাপ খবর দেখাচ্ছে।"

বাড়ির পিছনের দিকে টিভির ঘর। মাদুরে বসে রয়েছে জনা বিশেক দর্শক, যাদের মধ্যে চন্দ্রিমার কাকা আর দুলালকে চিনতে পারল বিহান। বাকিরা নিশ্চয়ই পাড়ার লোক। বিহানও মাদুরে বসবে ভেবেছিল, কিন্তু খবর যা দেখাচ্ছে, ভুলে গিয়েছে বসার কথা, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা উদয়ন সোমের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। দুর্গাপুরে এক চলচ্চিত্র অভিনয় শিক্ষাকেন্দ্রে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন উদয়ন সোম। শিক্ষাকেন্দ্রটি টিভিতে দেখাচ্ছে। স্টুডেন্ট, অভিভাবকরা ঘেরাও করে রেখেছে প্রিন্সিপাল, অন্যান্য শিক্ষাকর্মী ও উদয়ন সোমকে। বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ঘেরাওকারীরা। টিভির ক্যামেরায় বাইট দিচ্ছে। বলছে, উদয়ন সোম নাকি আগেও এরকম করেছেন। অনেক ছাত্রী তার শিকার। আজ ফের নির্যাতিতা সাহস করে সকলের সামনে এনেছে বিষয়টা। টিভির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, উদয়ন সোম ওই প্রতিষ্ঠানের অতিথি শিক্ষক। চার বছর ধরে ওখানে ক্লাস নিচ্ছেন। সপ্তাহে দু'দিন।

গোটা বিষয়টা অবিশ্বাস্য লাগছে বিহানের, কী করে সম্ভব? উদয়ন সোমের মতো প্রবীণ মানুষ, শিল্পক্ষেত্রে যাঁর ভাবমূর্তি অত উজ্জ্বল, তিনি এরকম নোংরা কাজ করতে যাবেন কেন? ওঁর সংবেদনশীল মন, সুন্দর ব্যবহারের প্রমাণ বিহান হাতেনাতে পেয়েছে। মিছিলে উনিই তো সরে গিয়ে রঞ্জন বসুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

"নতুন কংগ্রেসের জন্য এটা কিন্তু বেশ বড় ধাক্কা। বিদ্বজ্জন হিসেবে ওরা কিন্তু ব্র্যান্ড করেছিল উদয়ন সোমকে।" পাশ থেকে বলল পথিক। ওর হাতে এখন রিমোট, সুইচ টিপে অন্য

চ্যানেলে যাচ্ছে। সব জায়গায় এক খবর। ব্রেকিং নিউজ। কোনও চ্যানেল কড়া করে খবরটা পরিবেশন করছে, কোনওটা নরম।

মুড পুরো অফ হয়ে গেছে বিহানের, ঘটনা সত্য, মিথ্যা যাই হোক, এরকম একটা জঘন্য বিষয় নিয়ে হইচই, আলোচনা অসহ্য লাগছে তার। শ্রীকান্ত মিশ্র ঢুকে এসেছেন টিভির ঘরে। বিহানকে শুনিয়ে বলছেন, এর পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কাজ করছে। ফাঁসানো হয়েছে ভদ্রলোককে। যেমন আমার ক্ষেত্রে প্ল্যান করা হয়েছিল।

টিভির ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে চলে এসেছে বিহান। অস্থির পায়চারি করছে উঠোনে। ঘটনাটা কিছুতেই হজম করতে পারছে না। এরকম খবর আগে দেখেনি, তা নয়। এই ঘটনায় যিনি জড়িয়ে পড়ছেন, অল্প হলেও তাঁর সঙ্গে একটা সৌজন্যের সম্পর্ক হয়েছিল। কত বিখ্যাত মানুষ, তবু বিহানের মতো একজন অজ্ঞাত কুলশীলকে নোটিস করেছিলেন।

ফোন বাজছে। পকেট থেকে সেটটা বার করে বিহান, স্ক্রিনে রূপাঞ্জনা। সুইচ টিপে কানে নেয় ফোন। বিহান হ্যালো বলতেই, ওপ্রান্ত থেকে রূপাঞ্জনা বললেন, "তুমি আছ কোথায়? তখন থেকে ট্রাই করছি, পাচ্ছি না।"

"ধুমুরিয়ায় এসেছি। মাঝে মাঝেই সিগনাল চলে যাচ্ছে।"

"উদয়নবাবুর খবরটা জেনেছ?"

"জেনেছি।"

"বিরোধী পার্টির চক্রান্ত। যেসব আর্টিস্ট নতুন কংগ্রেসকে সমর্থন করে, তাদের হেয় করার চেষ্টা। পার্টিটারও বদনাম হবে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে আমাদের। তুমি ওখানকার শিডিউল ক্যানসেল করে কালই ফিরে এসো। কী করা যায়, তাই নিয়ে মিটিং হবে।"

"আগামী কালই ফেরার কথা আমার। কিন্তু দুপুরের আগে তো সম্ভব হবে না।"

'দুপুরে ফিরলেই হবে। ফিরেই আমাকে ফোন কোরো। বলে দেবো মিটিংটা কখন কোথায় হবে। রাখছি।'

৯

মিটিংয়ে প্রতিবাদ মিছিল করা হবে ঠিক হয়েছিল। এবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা। আধঘণ্টা হল মিছিল থেকে বাড়ি ফিরেছে বিহান। গত দু'দিন খুব দৌড়োদৌড়ির মধ্যে কেটেছে। ধুমুরিয়া থেকে ফিরেছে কাল। দুপুরে বাড়িতে নাওয়া-খাওয়া সেরে মিটিংয়ে গিয়েছিল। টালিগঞ্জে নতুন কংগ্রেসের আর্টিস্ট সংগঠনের অফিসে। শিল্পের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই এমন চারজন নেতাও ছিলেন। ওঁদের কণ্ঠস্বর শুনে বিহান মেলানোর চেষ্টা করছিল ফোনে শোনা বড় নেতার গলা। একজনের সঙ্গে মিলেও যেন মিলছিল না। কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে রূপাঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এই চারজনের মধ্যে সেই নেতা কি আছেন, যাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল আমার?"

"জেনে তোমার কী লাভ?" ঈষৎ বিরক্তিসহ প্রশ্নটা করেছিলেন রূপাঞ্জনা।

বিহান বলেছিল, "উনি আমার অনুরোধে এত বড় একটা কাজ করে দিলেন, ওঁকে স্বচক্ষে দেখাটাই লাভ বা সৌভাগ্য। প্রসঙ্গ টেনে আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে যাব না।"

"তুমি ব্যক্তিপুজোয় উৎসাহিত হয়ে পড়ছ কেন? উনি যেটা করেছেন, ওটাই পার্টির স্ট্যান্ড। পার্টির প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

রূপাঞ্জনার সঙ্গে তর্কে যায়নি বিহান। চুপ করে গিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার কিছু দিনের মধ্যে পার্টির বেশ কিছু নেতা যা সব অপকর্মে মেতেছেন, পার্টির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হলে তাদেরও সমর্থন করতে হয়। ওসবে নেই বিহান। মিছিলে গিয়েছিল সেই বড় নেতা এবং উদয়ন সোমের প্রতি শ্রদ্ধায়। ধুমুরিয়া থেকে বাড়ি ফিরে শুনেছিল কলির বাবা অসুস্থ হয়ে কলকাতার হাসপাতালে। এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিহান, খোঁজ নেওয়ার সময় পায়নি। কলিকে ফোন করেনি হিসেব কষেই, যদি ডেকে নেয়, এদিককার কাজ পণ্ড হবে। মিটিং, মিছিলে না গেলে কথা শোনাবেন রূপাঞ্জনা। এমনকী সেই বড় নেতা ফোন করে অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন। এক ঘণ্টা রেস্ট নিয়ে কলিদের বাড়ি যাবে বিহান।

বাড়িতে খেতে-খেতে টিভি দেখছিল। ওদের মিছিলটা দেখিয়েছে, বিহানকেও দেখা গেছে। সামনের দিকেই ছিল। আগের বারের মিছিলের ছবি পরের দিন টিভিতে দেখেছিল বিহান, নিজেকে কেমন যেন ফেকলু পার্টি মনে হচ্ছিল। একে তো প্রথমবার হাঁটছে মিছিলে, বিষয়টাও জানত না। আজ সে সমস্যা ছিল না। কেন হাঁটছে জানত, দ্বিতীয়বার বলে বেশ কনফিডেন্টও লাগছিল।

মা চা নিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে। সোফায় বসে কোলে প্লেট নিয়ে খাচ্ছিল বিহান। মাকে ফাঁকা প্লেট ফেরত দিয়ে চায়ের কাপ নিল। চুমুক দিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মা বলল, "কথাকলির বাবা মারা গেল।"

সেকেন্ড খানেকের জন্য যেন কালা হয়ে গেল বিহান। মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কখন? তুমি কার থেকে জানলে?"

"জেনেছি বিকেলে। হাসপাতাল থেকে পাড়ায় বডি নিয়ে এল যখন।"

"আমাকে বলোনি কেন এতক্ষণ? বাড়ি ফিরেছি এক ঘণ্টা হতে চলল।"

"বললেই তো না খেয়ে দৌড়তিস। সারাদিন তো প্রায় না খেয়ে কেটেছে তোর।"

মায়েরা এরকমই। রাগ করে লাভ নেই। বড়-বড় দুটো চুমুক মেরে কাপটা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোয় বিহান। মা পিছন থেকে বলে, ওরা কিন্তু এদিককার ঘাটে যায়নি। ওদের পুরনো এলাকার ঘাটে গিয়েছে। সালকিয়া বাঁধাঘাট।

ট্যাক্সি পাওয়া যায়নি। দু'বার অটো, একবার বাসে চড়ে বাঁধাঘাটের শ্মশানে পৌঁছল বিহান। ইলেকট্রিক চুল্লির আশপাশে কলিদের কাউকে দেখা গেল না। অন্য লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। কাঠের চুল্লি জ্বলছে না। বিহান কি দেরি করে ফেলল? অন্ত্যেষ্টি সেরে ফিরে গেল ওরা? ঘাটটা একবার দেখে নিতে এগোল বিহান। সিঁড়ির মাথায় এসে থমকে গেল পা। কলি উঠে আসছে। পাশের দুই মহিলা আলতো করে ধরে রয়েছে ওকে। অস্থি ভাসিয়ে এল জলে। পরনে কোরা শাড়ি। কলির মায়ের বেলায় একই দৃশ্য দেখেছিল বিহান। আজ কলি বড্ড শান্ত, খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙছে।

বিহানের সামনে এসে দাঁড়াল কলি। একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলল, "এত দেরি হল?"

উত্তর না দিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় বিহান। কলি পাশের দু'জনকে বলল, "তোমরা যাও, আসছি।"

সরে গেলেন দুই মহিলা। ফিসফিস ভঙ্গিতে কলি বলল, "আমার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র করে চলে গেল বাবা। নিজের মেয়ের সঙ্গে কেউ এমন করে!"

Scanned with CamScanner

সবিস্ময়ে কলির মুখের দিকে তাকাল বিহান, কী বলতে চাইছে? ফের বলতে থাকে কলি, "শরীর খারাপ শুনে বাবাকে দেখতে এলাম বাড়িতে, হসপিটালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বলল, ক্যানসার। অনেক দিন আগেই হয়েছে। উনি চিকিৎসাও করিয়েছেন। রিপোর্টগুলো পেলে ভাল হয়। রোগ চেপে গিয়েছে বলে বাবার উপর রাগ হল, নিজের সন্তানকেও বলবে না, অমন মারণ রোগের সঙ্গে লড়ছে! রিপোর্ট খুঁজতে গিয়ে বাবার আরও একটা অন্যায় চোখে পড়ল। ব্যাঙ্কের কাগজ, গিফট ডিড হাতে এসে গেল। দেখি, কসবার ফ্ল্যাটের টাকা বাবা দিয়েছে মেয়েকে সুখে রাখার জন্য পণ। নির্মাল্য এমন লোভী, পণের জন্য নিজের মা-বাবাকে ত্যাগ করে আমার সঙ্গে আলাদা থাকতে শুরু করেছিল।"

থামল কলি। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দ্রুত বাড়ছে কান্নার বেগ। মাটিতে বসে পড়ছে, ধরতে গেল বিহান, হাতের ঝটকায় সরিয়ে দিল কলি। কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, "আমি কার উপর বিশ্বাস করব? কার উপর? আমার যে তোমাকেও বিশ্বাস হচ্ছে না বিহান। কেন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না? আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!"

মাটিতে বারবার মুঠোর আঘাত করে কাঁদছে কলি। ওকে সামলাতে এগিয়ে এল আত্মীয়স্বজন। বিহান পিছোতে থাকে।

হতবুদ্ধির মতো বাসে বসে আছে বিহান। বাড়ি ফিরছে। ফোন বাজছে। একটু সময় নিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বার করে। নাম না দেখে কল রিসিভ করল। ওপ্রান্ত বলে, "বিহানদা, আমি পথিক বলছি। আপনি এখন কোথায়?"

"বাসে।"

"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে টিভি খুলুন। উদয়ন সোমের ঘটনাটা সত্যি ছিল। স্টুডেন্টস গার্জেনরা প্রথম দিন শুধু অ্যাজিটেশন দিয়েছে। ট্রাম্প কার্ড রেখেছিল হাতে। একটা ভিডিও ক্লিপিংস আজ মিডিয়াতে দিয়েছে। তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উদয়ন সোম এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করছেন। আপনি খামোকা মিছিলে হাঁটতে গেলেন বিহানদা। একটু ভাবনাচিন্তা করে যাওয়া উচিত ছিল। আমি জানি, ওই পার্টিটা আপনি করেন না। আপনার প্রিয়জনদের কী জবাব দেবেন এখন?..." আরও কী সব বলে যাচ্ছে পথিক। গলা শুকিয়ে গেছে বিহানের। পথিকের কল কেটে ফোন পকেটে ঢোকায় বিহান। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। টিভি দেখার জন্য নয়, লুকিয়ে পড়তে হবে। বাড়ির লোককে বলতে হবে, কেউ ডাকতে এলে বলবে, আমি বাড়ি নেই। টিভিতে এখন কী দেখাচ্ছে? স্ক্রিনের আধখানা জুড়ে দেখাচ্ছে শ্লীলতাহানির ছবি, বাকি আধখানায় বিহানদের প্রতিবাদ মিছিল। আবারও ফোন বেজে উঠল। মোবাইল বার করে বিহান, শুধুই নাম্বার। অপরিচিত কেউ, টিভি বা কাগজের রিপোর্টার হতে পারে। প্রশ্ন করবে, এখন তো জলের মতো পরিষ্কার, উদয়ন সোম শ্লীলতাহানি করেছেন। এবার কী বলবেন? কী বলবে বিহান? কল কেটে দেয়। এখন পাড়ায় ঢোকার সময় কেউ যদি কিছু বলে? হয়তো বলল, খুব কবিতা-টবিতা লিখছিস, বড় বড় লোকের পাশে ঘুরছিস, পুরস্কার নিচ্ছিস স্টেজে উঠে, তোদের আসল চরিত্র তো বেরিয়ে পড়ল! আরও একটা ফোন এসেছে। ভয় লাগছে ধরতে। ফোন ধরছে না দেখে বিহানের দিকে তাকাচ্ছে প্যাসেঞ্জাররা। এক্ষুনি হয়তো কোনও প্রশ্ন করবে। রিং হয়ে থেমে গেল ফোন। এখন অনেকেই অনেক প্রশ্ন করবে। যা ঘটনা ঘটল, কেউ তার হয়ে কথা বলবে না। বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার পড়তে পারে। রাস্তাঘাট, বাজারে বাবা-দাদাকে কথা শোনাবে লোকে। মুখ চুন করে বাড়ি ঢুকবে ওরা। বউদির টিউশন কমে যেতে পারে। ছাত্রীদের পাঠাতে ভয় পাবে অভিভাবকরা। বিহান তো শ্লীলতাহানির পক্ষে। মেসেজের রিংটোন বেজে উঠল। নিশ্চয়ই গালাগাল পাঠাল কেউ। হয়তো বিহানের কবিতার ভক্ত। বাসটা বড্ড আস্তে চালাচ্ছে। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার চোখ সরাচ্ছে না, ঠায় দেখছে বিহানকে। আজ না হোক কাল কলি কাগজ, টিভি থেকে জানতে পারবে বিহান কোন ঘটনার সমর্থনে মিছিলে হেঁটেছিল। মেয়েটা এমনিতেই এত কষ্টের মধ্যে আছে, তার উপর বিহানের এই ঘটনা! বাসে ভিড় তেমন নেই, তবু যেন দমবন্ধ লাগছে। ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মাথায়। ফের বেজে উঠল ফোন। বাস থেকে নেমে পড়ে বিহান। এবার স্ক্রিন দেখে, বউদির কল। বউদি কী খবর দেবে বিহান জানে। ফোনসেট পুরোপুরি অফ করে রাস্তার অন্ধকার দিকটা বেছে নিয়ে হাঁটতে থাকে বিহান।

১০

দু'মাস কেটে গিয়েছে। বিহান রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছিল। বিহান কিশোরীলালজিকে বলেছিল, আমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে কোথাও একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়েছিল মালিককে। কতটা কী বুঝেছিলেন, কে জানে! যে গার্মেন্ট কোম্পানির ডিলার ছিলেন, পাঠিয়ে দিলেন তাদের হেড অফিসে। নভি মুম্বইয়ের ভাসিতে অফিস। অ্যাকাউন্টসের কাজ করত বিহান। অফিসের একটা স্টোররুম ফাঁকা করে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। মুম্বইয়ে ঘরভাড়া খুব এক্সপেনসিভ। স্যালারির অর্ধেক বেরিয়ে যাবে।

কিশোরীলালজির সুপারিশে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। মুম্বই যাওয়ার আগেই ফোন নাম্বার বদলে ফেলেছিল বিহান। নতুন নাম্বার বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিল। বারণ করেছিল অন্য কাউকে দিতে। বাড়ির লোকই ফোন করত শুধু। বেশ কাটছিল মুম্বইয়ের নতুন জীবন। নিজের কবি পরিচয় কাউকে দিতে যায়নি, দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কবিতাও আসছিল না মাথায়। অফিসে অন্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে দিব্যি বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বাঙালি স্টাফও ছিল, এড়িয়ে থাকত বিহান, পাছে পূর্ব পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি, পাড়া বা কলকাতার জন্য মন টানত না। ঠিকই করে নিয়েছিল খুব এমারজেন্সি ছাড়া বাড়ি ফিরবে না। সেরকম একটা জরুরি দরকারে বিহানকে ফিরতে হচ্ছে। সে এখন হাওড়াগামী ট্রেনে। এখানকার কাজটা সারা হলে সে আবার ফিরে যাবে মুম্বই।

ফোনটা এল পরশুর আগের দিন। বউদির ফোন। বলল, "খুব বাজে একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে। ভেবেছিলাম তোমাকে জানাব না। এখন দেখছি না জানিয়ে উপায় নেই।"

"কী ব্যাপার বউদি?" জানতে চেয়েছিল বিহান।

বউদি বলতে লাগল, "বাবা মারা যাওয়ার পর কথাকলি সেই যে এখানকার বাড়িতে ঢুকেছে, নিজেকে প্রায় গৃহবন্দি করে ফেলেছে। বাড়িতে যে পিসি ছিল, তাড়িয়েছে তাকে। বাড়ির দু'জনই মহিলা বলে পিসির এক আত্মীয়, বয়স্ক মানুষ, থাকতে এসেছিল ওই বাড়িতে। কথাকলির ধারণা, ওই দু'জন তার সম্পত্তি হাতানোর প্ল্যান করছে। বাড়িতে এখন কথাকলি একা। কাজের লোক রাখেনি। ওদের পুরনো ড্রাইভারকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। গ্যারেজে পড়ে নষ্ট হচ্ছে গাড়ি। রোজ সকালে খবরের কাগজ জমা হচ্ছিল দোরগোড়ায়। সন্ধে নামলে কাগজ মাড়িয়ে নিজের খাওয়ার জন্য টুকটাক জিনিস কিনে আনে সবচেয়ে সামনের দোকান থেকে। টাকা না পেয়ে কাগজ

Scanned with CamScanner

দেওয়া বন্ধ করেছে হকার। রান্নার গ্যাস ফুরিয়েছে বোধহয়। তাই আজকাল রেডি ফুড কেনে। কেক, চিপস, কোল্ড ড্রিংক...। নির্মাল্যকে তো নয়ই, কোনও আত্মীয়কে বাড়ি ঢুকতে দেয় না। গালাগালি করে। ডাক্তার নিয়ে এসে ফেরত গিয়েছে তারা। পাড়ার লোককেও ওর ব্যাপারে নাক গলাতে দিচ্ছে না। ব্যাঙ্কে যায় না। সামান্য যে খরচটুকু হয়, সেটাই বা আর ক'দিন পর কী করে চালাবে? ইলেকট্রিক বিল নিশ্চয়ই দেয় না। এবার একদিন লাইন কেটে দিয়ে যাবে। সারাদিন ঘরে বসে কার উদ্দেশ্যে যেন গাল পাড়ে। অসংলগ্ন কথাবার্তা। তুমি একবার এসো বিহান। তুমিই পারবে ওকে বাড়ি থেকে বের করতে। এভাবে চললে, দরজা ভেঙে ওর ডেডবডি বের করবে পাড়ার লোক।''

তৎকালে হাওড়া ফেরার টিকিট কেটে ফেলল বিহান। কথাকলি তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে কি না, জানে না। ওর মনের অবস্থা যা শুনল, বিহানকে চিনতে পারলে হয়! বিহানের শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, সে যদি না পালাত, কথাকলির এই হাল হত না। যখনই কোনও সমস্যায় পড়েছে, বিহানকে ডেকে পাঠিয়েছে। শেষ দু'মাস সাড়া পায়নি ডেকে।

হাওড়া স্টেশনে ঢুকেছে গাড়ি। বিহানের কোপ্যাসেঞ্জার বাঙালি। গোটা জার্নি খুব হইচই করেছে। গোয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল। স্টেশন এসে পড়েছে দেখে সিরিয়াস মুখে ব্যাগপত্তর নামাচ্ছে, সিটের তলা থেকে বার করছে। এরা বিহানকে চিনতে পারেনি। কবিতা তো পড়েই না, রাজনীতির ব্যাপারেও ইন্টারেস্ট নেই। এদের জগৎটাই আলাদা!

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আর একটা পশ্চিমবঙ্গে থাকে। প্ল্যাটফর্মে নামলে অপরিচিত হয়ে থাকার সুযোগটা পাবে না বিহান। সেখানে অনেক লোক, দু' মাসটা এমন কিছু বেশি সময় নয়। কেউ একজন পিঠে হাত রেখে বলতে পারে, কী ব্যাপার!, অনেকদিন মিছিলে-টিছিলে দেখছি না!

ভিড়ের আড়ালে ফিরতে হবে। এখনই বিকেল পাঁচটা। পাড়ায় পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে। বিহানের বাড়ি ঢোকা সহজে লোকের চোখে পড়বে না।

বাড়িতে ঢুকে ফ্রেশ হতে না হতেই দাদা বলল, ''চল, মেয়েটাকে ঘর থেকে বের করি। তারপর সোজা অ্যাসাইলামে। আমার সঙ্গে পাড়ার আরও দু'জন থাকবে।''

''তোমাদের মাথা খারাপ নাকি! এত লোকজন দেখলে কলি ঢুকতেই দেবে না বাড়িতে। আরও একটু অন্ধকার নামুক, আমি একা যাব ওর বাড়ি।'' বলে বিহান গল্প জুড়ল মা-বউদির সঙ্গে। মুম্বই শহরটা কেমন, সে কী ভাবে দিন কাটায়...

রাত আটটা নাগাদ কলিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বিহান। সেই ঝাঁ চকচকে দোতলা বাড়িটা আজ বড় নিষ্প্রভ, মলিন। বউদির কথামতো বাড়ির সব দরজা-জানলা বন্ধ। স্ট্রিট লাইটের আলোয় বাড়ির সামনেটা অল্প আলোকিত হয়ে আছে। পাঁচিলের গেটে ধুলো জমেছে। গেট খুলে দরজার সামনে দাঁড়ায় বিহান। ডোরবেল টেপে, কোনও আওয়াজ নেই ভিতরে। কলিই হয়তো কেটে দিয়েছে কানেকশন। দরজায় টোকা দেয় বিহান। বারকয়েক দেওয়ার পর ভিতর থেকে ভেসে আসে ঝাঁঝাল স্বর, ''কে?''

কলির গলা। বিহান বলে, ''কলি, আমি। বিহান।''

খানিক অপেক্ষার পর খুলে গেল দরজা। সামনে কলি। যতটা খারাপ চেহারা দেখবে আশা করেছিল বিহান, তেমনটা হয়নি। পরিচ্ছন্ন হাউসকোট, তবে রোগা হয়ে গিয়েছে খুব। বিহান বলে, ''ভিতরে আসতে বলবে না?''

চিলতে হাসি হেসে কলি বলল, ''তুমি বুঝি পারমিশন নিয়ে ঢুকতে আগে?''

বুক থেকে পাথর নেমে গেল বিহানের। কলি তো একেবারে স্বাভাবিক ব্যবহার করছে। ওর পিছন-পিছন সোফায় গিয়ে বসে বিহান। অনেকদিন ঝাড়া হয়নি, প্রচুর ধুলো। কলি বসেছে সাইডের সিঙ্গল সোফাটায়। কম ওয়াটের আলো জ্বলছে ড্রয়িংয়ে। অন্য ঘরগুলো অন্ধকার। বিহান বলতে যাবে, এ ঘরের টিউব লাইটগুলো জ্বালাও। আগে কত জ্বলজ্বল করত ড্রয়িং প্লেসটা। বলা হল না। কলি বিহানের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, ''তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, মুম্বই। আমি খবর পেয়েছি। ফোনটাও নিয়ে যাওনি।''

শেষ কথাটা সামান্য বেতালা লাগল। অগ্রাহ্য করে বিহান বলল, ''শুনলাম, তুমি বাইরের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছ না।''

''ঠিক শুনেছ। আমি একা বেশ আছি। ঠকার ভয় নেই, ভালবাসারও নেই কাউকে।''

বুক থেকে পাথর নেমে গেল বিহানের। কলি তো একেবারে স্বাভাবিক ব্যবহার করছে। ওর পিছন-পিছন সোফায় গিয়ে বসে বিহান।

''ব্যাঙ্কে যাচ্ছ না। তোমার চলবে কী করে? কারেন্টের লাইন কেটে দিয়ে যাবে।''

''আলোর আমার দরকার পড়ছে না। দিনে জানলার খড়খড়ি গলে একটু আলো আসে, ওতেই চুলটুল আঁচড়ে নিই। আর ব্যাঙ্কে যাওয়ার কী দরকার, বাড়িতে গয়না ছিল, একদিন সন্ধেবেলা বেরিয়ে বিক্রি করে দিয়ে এলাম। ওই টাকায় খাওয়াদাওয়া চালাচ্ছি।''

বিহান বুঝতে পারছে কলি মোটেই সুস্থ নয়, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারটা করে যাচ্ছে। ফের বিহান বলে, ''তুমি নাকি ঘরে বসে একা একা চেঁচামেচি করো, গালমন্দ দাও। কাকে দাও?''

''কাউকে নয়। এমনি-এমনি চেঁচাই, ঝগড়া করি। বেশ ভাল লাগে, জানো!''

''কী-কী বলো একটু শুনি?''

বিহানের কথায় উৎসাহিত হয় কথাকলি। নড়েচড়ে বসে বলে, ''শুনবে! দাঁড়াও।''

মুহূর্তে চোখমুখ পাল্টে যায় কলির, একক অভিনয়ের মতো বলতে থাকে, ''নার্সিংহোম যাব না আমি। চলে যাও এখান থেকে। ইয়ার্কি পেয়েছ! চোখ গেলে দেব ওভাবে তাকালে। নীচ, ইতর। তোমাদের চালাকি আমি বুঝি না ভেবেছ? টিকটিকি লেলিয়েছ! নতুন ফ্যান কিনেছ বাসর সাজাবে বলে? আমি গলায় দড়ি দিইনি, খুব আফসোস! সব ক'টাকে হাজতে পুরব। শালা পা চাটা...''

থেমে গিয়ে হাসতে লাগল কলি। নুয়ে পড়ে হাসছে। বলছে, ''তুমিও বলো, দারুণ লাগবে!''

''কী বলব?''

''যা মন চায় বলো। যত রাগ আছে উগরে দাও। দেখবে খুব আরাম হচ্ছে।''

''কার উপর ওগরাবো?''

''শূন্যের উপর। বলো না, বলে দেখোই না একবার।''

কী মনে হয়, বলতে থাকে বিহান, ''শালা ভণ্ডামি! দেশের উপকার করতে চাও? দেশ কি তোর একার? যেখানে ইচ্ছে

টয়লেট করে দিবি? পিছনে পাগলা কুকুর ছেড়ে দেব। কালচার মারাচ্ছ শালা। নদে পুনো করে দেব। আমার সঙ্গে হারামিগিরি। তোর বাবার চাকর আমি? ডেকে নিয়ে আয়...''

খুব হাসছে কলি। হাততালি দিচ্ছে। বলছে, ''দারুণ হচ্ছে, আরও বলো। বলে যাও।''

বিহানের ভালই লাগছে, মজা পেয়ে গিয়েছে। এবার চার অক্ষর, দু' অক্ষরের গালাগাল দিতে থাকে হাত ছুড়ে, পায়চারি করতে করতে। কলি চলে গিয়েছে পাশের ঘরে। ওটাই ওর ঘর। বলে গেছে, কী রকম ইকো হয় শোনো। বিহানের গালাগালির মাঝে ভেসে আসছে কলির গলা, ''পণের টাকায় চিতা সাজাবে? বাসরলতা গাছটা বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছ তুমি? সামনে থেকে এক শালিখ সরাও। সব ওষুধ ভেজাল, খাব না আমি। সম্পত্তি হাতানোর ধান্দা, বুঝি না আমি। শ্মশানের ডোম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।''

১১

এভাবে তো চলতে পারে না। আলো ফোটার আগেই কলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বিহান। ট্রেনে, বাসে, ট্রেকারে করে রাজডাঙায় চলে এসেছে। সেই রাজডাঙা, শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে এসে ভিড়ে কষ্ট হচ্ছিল কলির। তারপর যেখানে আসা হয়েছিল। রিসর্টটা আরও ভেঙেচুড়ে গিয়েছে। সেই একই কেয়ারটেকার। চিনতেও পেরেছে বিহানদের। কলি এখানে এসে খুব একটা উচ্ছ্বাস না দেখালেও, শান্তি পেয়েছে মনে হচ্ছে। কলিকে নিয়ে সামনের টিলাটায় উঠছে বিহান। ওই টিলার মাথায় চন্দ্রিমা এমন একটা জিনিস দেখেছিল, যা থেকে বুঝে যায় কলি চিরকালই বিহানের।

টিলার একেবারে টপে চলে এসেছে দু'জনে। খানিক দূরে গোল পাথর। হাইট বেশি নয়, ফুট চারেক। কলি পাথরটার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কী দেখছে বিহান জানে। চন্দ্রিমা বলেছে। আগেরবার যখন এসেছিল, টিলা দেখেই চন্দ্রিমা, কলি প্রবল উৎসাহে উঠে এসেছিল উপরে। মিতুল, বিহান তখন খাওয়াদাওয়ার তদারকিতে নীচে ব্যস্ত। টিলায় এসে আজকের মতোই পাথরটার কাছে চলে গিয়েছিল কলি। চন্দ্রিমাকে বলেছিল, এই পাথরটা রোজ সূর্যের প্রথম আলো পায়। দিনের প্রথম আলোর মতো পবিত্র, নির্মল, সুন্দর জিনিস আর হয় না। দিন যত বাড়ে, আলোটাকে নোংরা করতে উঠেপড়ে লাগে প্রায় সকলেই। কত কুটিলতা, জটিলতা, অন্যকে ছোট করা...পাথরটা এখানে পড়ে থাকে একা। প্রভাত কিরণ পেয়ে শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

পাথরটার গন্ধও শোঁকে কলি। চন্দ্রিমা খেপামি ভেবে দূরে অন্য কিছু দেখতে চলে গিয়েছিল। ওখান থেকে লক্ষ্য করে কলি পাথরের গায়ে কী যেন লিখছে!

তখনকার মতো কলিকে নিয়ে নেমে এলেও, চন্দ্রিমা আবার উঠেছিল টিলায়। দেখে, পাথরের গায়ে লেখা আছে, বিহান। বিহান মানেও সকালের প্রথম আলো। কলি এখন লেখাটা খুঁজে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বিহানকে কিছু বলতেও পারছে না। মুখেচোখে অসম্ভব বিরক্তি। খুঁজে পাবে কী করে! এবার এখানে এসে কলিকে রিসর্টের ঘরে বসিয়ে বিহান বলেছিল, ''এক্ষুনি আসছি।''

দৌড়ে টিলার কাছে এসে উপরে উঠে গিয়েছিল বিহান। পাথরটার কাছে গিয়ে নিজের নামটা মুছে দেয়। রিসর্টে ফিরে কিছুই জানি না ভাব করে কলিকে নিয়ে আবার উঠেছে এখানে।

টিলার উপরে আর ভাল লাগছে না কলির। নামতে শুরু করেছে একা একা। ঠিকমতো নামতে পারছে না। পড়ে যাবে মনে হচ্ছে। সত্যিই গেল। উপরের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবছে বিহান এসে বুঝি তুলবে। তুলবে না বিহান। একটু নিষ্ঠুর ভাবতে শিখুক বিহানকে। আর পাঁচজনের মতোই বিহান, ভালমন্দ মিশিয়ে একজন মানুষ। ভালবাসার কাঙাল। ভালবাসা মানুষকে শুদ্ধ করে। শুদ্ধতাকে ভালবাসা বোকামি। ওটা পাথরের মতোই নিথর।

আরও বেশ কয়েকবার ওলটপালট খেয়ে কলি নীচে নেমেছে। বিহানও নামতে থাকে। রিসর্টের বাগানে এসে আবার কী যেন খুঁজতে লাগল কলি। বিহান পাশে গিয়ে জানতে চায়, ''কী খুঁজছ?''

''এখানে একটা বাসরলতা গাছ ছিল, গেল কোথায়?''

''কী গাছ?''

''বাসরলতা! বাসরলতা! বলো, কোথায় গেল গাছটা? টিলায় ওঠার আগে আমি নিজের চোখে দেখে গিয়েছি গাছটা।''

চটকা ভাঙে বিহানের। এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। যেমন দেখে, একদম সিনেমার মতো। অ্যাসাইলামের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিহান। ডাক্তারের টেবিল। লেডি ডাক্তার এখন চেয়ারে নেই। পাশের ঘরে কলিকে দেখছেন। কলি এখন আচ্ছন্ন, পাশের ঘরে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে বাসরলতা, বাসরলতা বলে উঠছে। ওই ডাকে ঘুম ভাঙল বিহানের। ডাক্তারের চেম্বারে বিহানের এক পাশে বসে আছে দাদা, অন্য পাশে দাদার বন্ধু, দেবুদা। ওষুধের দোকান আছে। কাল রাতে কলিদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দাদা তিন বন্ধু নিয়ে ঢুকেছিল ঘরে। দরজা ভেঙেছিল সম্ভবত। বিহান তখন ড্রয়িংয়ের সোফায় ঘুমে অচৈতন্য। কলি ঘুমোচ্ছিল নিজের ঘরে। দাদা ঠেলে তুলেছিল বিহানকে। অবাক হয়ে বিহান জিজ্ঞেস করেছিল, ''তুমি কী ভাবে ঢুকলে?''

'অনেক কষ্টে ঢুকেছি। ওই মেয়েটাকে দেখার কেউ না থাকুক, তোর তো আছে। দু'জনকে তো আর একসঙ্গে পাগল হতে দিতে পারি না। তাড়াতাড়ি চ, অ্যাসাইলামে যেতে হবে। সব বলা আছে। গাড়িও নিয়ে এসেছি।''

''কলিকে নেবে তো?'' জানতে চেয়েছিল বিহান।

''হ্যাঁ, নেব রে। তোকে অত ভাবতে হবে না।'' বলে দাদারা ঢুকে গিয়েছিল কলির ঘরে। দেবুদা বোধহয় কলিকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছে। জাগ্রত অবস্থায় আনা যেত না। বিহানকে কোনও ওষুধই দেওয়া হয়নি। তবু ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

লেডি ডাক্তার ফিরে এলেন চেয়ারে। বিহানকে বললেন, ''উনি বারবার 'বাসরলতা' কথাটা বলছেন। মাথায় বসে গেছে। আপনি কি জানেন 'বাসরলতা' কী? শুনে তো কোনও গাছ বা গুল্ম জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে। বিষয়টা ঠিক কী জানা গেলে চিকিৎসায় সুবিধে হত।''

বিহান মাথা নেড়ে বলে, ''আমি জানি না। আমারও গাছ বলেই মনে হচ্ছে।' বাকিটুকু মনে-মনে বলে বিহান, 'বাসরলতা' অনেকটা পটাশিয়াম সায়ানাইডের মতো। কত মানুষ হাতে পেন ধরে শেষ অবধি স্বাদ কেমন ঠিকঠাক লিখে যেতে পারেনি। 'বাসরলতা' যদি গাছ হয়, তাকে না খোঁজাই ভাল। নয়তো কলির দশা হবে।

চরিত্র, ঘটনা সমস্তটাই কাল্পনিক।

গান দুটির জন্য বন্ধু সুদীপ বসুরায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

অলংকরণ: বৈশালী সরকার

Scanned with CamScanner

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com